A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

এপার বাংলা
ওপার বাংলা

শংকর

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :

শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩ কলেজ রো

কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :

শ্রীমতী মহামায়া রায়

সনেট প্রিন্টিং হাউস

১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

শ্রীহরি প্রেস

১৩৫এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

শ্রীকানাই পাল

ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রথম প্রকাশ :
—বৈশাখ, ১৩৭৭
—এপ্রিল, ১৯৭০

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
—বৈশাখ, ১৩৭৭
—মে, ১৯৭০

তৃতীয় মুদ্রণ :
—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭
—জুন, ১৯৭০

চতুর্থ মুদ্রণ :
—আষাঢ়, ১৩৭৭
—জুলাই, ১৯৭০

পঞ্চম মুদ্রণ :
—শ্রাবণ, ১৩৭৭
—আগষ্ট, ১৯৭০

ষষ্ঠ মুদ্রণ :
—আশ্বিন, ১৩৭৭
—সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

সপ্তম মুদ্রণ :
—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
—নভেম্বর, ১৯৭০

অষ্টম মুদ্রণ :
—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
—ডিসেম্বর; ১৯৭০

নবম মুদ্রণ :
—পৌষ, ১৩৭৭
—জানুয়ারী, ১৯৭১

দশম মুদ্রণ :
—মাঘ, ১৩৭৭
—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

একাদশ মুদ্রণ :
—ফাল্গুন, ১৩৭৭
—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

দ্বাদশ মুদ্রণ :
—ফাল্গুন, ১৩৭৭
—মার্চ ১৯৭১

ত্রয়োদশ মুদ্রণ :
—চৈত্র, ১৩৭৭
—এপ্রিল, ১৯৭১

চতুর্দশ মুদ্রণ :
—বৈশাখ, ১৩৭৮
—এপ্রিল, ১৯৭১

পঞ্চদশ মুদ্রণ :
—বৈশাখ, ১৩৭৮
—এপ্রিল, ১৯৭১

ষোড়শ মুদ্রণ :
—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮
—মে, ১৯৭১

সপ্তদশ মুদ্রণ :
—আষাঢ়, ১৩৭৮
—জুন, ১৯৭১

অষ্টাদশ মুদ্রণ :
—শ্রাবণ, ১৩৭৮
—আগষ্ট, ১৯৭১

উনবিংশ মুদ্রণ :
—আশ্বিন, ১৩৭৮
—অক্টোবর, ১৯৭১

বিংশ মুদ্রণ :
—পৌষ, ১৩৭৮
—ডিসেম্বর, ১৯৭১

একবিংশ মুদ্রণ :
—মাঘ, ১৩৭৮
—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

দ্বাবিংশ মুদ্রণ :
—ফাল্গুন, ১৩৭৮
—মার্চ, ১৯৭২

ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ :
—চৈত্র, ১৩৭৮
—এপ্রিল, ১৯৭২

চতুর্বিংশ মুদ্রণ :
—আষাঢ়, ১৩৭৯
—জুন, ১৯৭২

রজত জয়ন্তী মুদ্রণ :
—ভাদ্র, ১৩৭৯
—আগষ্ট, ১৯৭২

ষড়বিংশ মুদ্রণ :
—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯
—ডিসেম্বর, ১৯৭২

সপ্তবিংশ মুদ্রণ :
—মাঘ, ১৩৭৯
—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

অষ্টবিংশ মুদ্রণ :
—চৈত্র, ১৩৭৯
—মার্চ, ১৯৭৩

উনবিংশ মুদ্রণ :
—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০
—মে, ১৯৭৩

ত্রিংশ মুদ্রণ :
—অগ্রহায়ণ, ১৩৮০
—ডিসেম্বর, ১৯৭৩

একত্রিংশ মুদ্রণ :
—ফাল্গুন, ১৩৮০
—মার্চ, ১৯৭৪

দ্বাত্রিংশ মুদ্রণ :
—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১
—জুন, ১৯৭৪

ত্রয়স্ত্রিংশ মুদ্রণ :
—ফাল্গুন, ১৩৮১
—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

চতুস্ত্রিংশ মুদ্রণ :
—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২
—মে, ১৯৭৫

পঞ্চবিংশ মুদ্রণ :
—ফাল্গুন, ১৩৮২
—মার্চ, ১৯৭৬

ষট্‌ত্রিংশ মুদ্রণ :
—অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
—ডিসেম্বর, ১৯৭৬

সপ্তত্রিংশ মুদ্রণ :
—চৈত্র, ১৩৮৪
—মার্চ, ১৯৭৮

অষ্টাত্রিংশ মুদ্রণ :
—ফাল্গুন, ১৩৮৫
—মার্চ, ১৯৭৯

উনচত্বারিংশ মুদ্রণ :
—মাঘ, ১৩৮৭
—জানুয়ারী, ১৯৮০

চত্বারিংশ মুদ্রণ :
—ভাদ্র, ১৩৮৮
—আগষ্ট, ১৯৮১

একচত্বারিংশ মুদ্রণ :
—শ্রাবণ, ১৩৮৯
—জুলাই, ১৯৮২

দ্বিচত্বারিংশ মুদ্রণ :
—পৌষ, ১৩৯০
—জানুয়ারী, ১৯৮৪

লাইব্রেরী
খুলনা

ওপার বাংলায় বুড়ীগঙ্গা নদীতীরের
সেই অকুতোভয় যুবকবৃন্দকে—
যাঁদের প্রেম, নিষ্ঠা ও ত্যাগে
বঙ্গভাষা একটি স্বাধীন দেশে
রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে।

যেদিন সরিয়া যাবো তোমাদের কাছ থেকে—দূরে কুয়াশায়
চলে যাবো, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা করে লয়ে যাবে ;—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি ভাবিব, হায় ;—
সেদিন রবে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—

... ...

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ।

... ...

আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ।

জীবনানন্দ দাশ
—রূপসী বাংলা

এই গ্রন্থের রচনাকাল
ডিসেম্বর ১৯৬৭—ডিসেম্বর ১৯৬৯।
প্রথম অংশটি ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সালে
দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

লেখকের নিবেদন

নানা কারণে এই বইটিকে আমার লেখকজীবনের এক নতুন পদক্ষেপ বলে মনে করি। পৃথিবী দেখবার লোভে একদিন দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ভূ-প্রদক্ষিণ শেষ করে বুঝেছি দূর থেকে স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই দেখা হলো না।

আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনে সম্প্রতি যেসব জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বা হতে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'র কোনো কোনো অভিজ্ঞতা পাঠক-পাঠিকাদের কাজে লাগলে আনন্দিত হবো।

আর একটি কথা। এপার বাংলা ওপার বাংলা বলতে আমার চোখের সামনে দুটি বাংলা ছাড়াও মহাসাগরের অপর পারে তৃতীয় এক বাংলার ছবি ভেসে ওঠে। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার নানা প্রান্তে যেখানেই বাঙালী আছেন সেখানেই ছোট্ট এক একটি বাংলা সৃষ্টি হয়েছে—এঁদেরই কয়েকজনের সাক্ষাৎ-সান্নিধ্যে এসে আমি মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষাকে ভালবাসবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম এপার ওপার বলতে তাঁদের কথাও যে আমার মনে ছিল তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করতে চাই। তৃতীয় এই বাংলার স্নেহ-প্রশ্রয় ছাড়া আমার পক্ষে বাঙালীকে আবিষ্কার করা এবং 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লেখা সম্ভব হতো না।

১লা বৈশাখ, ১৩৭৭ — শংকর

শংকর এর কয়েকটি বই

ছোট বড় সবার জন্য

এক ব্যাগ শংকর ১০.০০
চিরকালের উপকথা ১০.০০

উপন্যাস

সোনার সংসার ১০.০০
স্বর্ণ সুযোগ ১২.০০
মরুভূমি ১২.০০
সম্রাট ও সুন্দরী ১২.০০
জন-অরণ্য ১০.০০
আশা আকাঙ্ক্ষা ৮.০০
বিত্তবাসনা ১০.০০
একদিন হঠাৎ ১০.০০
নবীনা ৮.০০
মানসম্মান ১২.০০
রূপতাপস ৭.০০
চৌরঙ্গী ১৬.০০

ত্রয়ী উপন্যাস

জন্মভূমি ১৫.০০
স্বর্গ মর্ত পাতাল ১৬.০০

যুগল উপন্যাস

তনয়া ১৫.০০

বিশ্ব ভ্রমণ

যেখানে যেমন ১২.০০

আরও কয়েকটি বই

এক দুই তিন ১০.০০
পাত্রপাত্রী ৮.০০
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ১০.০০
এক যে ছিল ১০.০০
সার্থক জনম ৯.০০
মানচিত্র ১২.০০
স্থানীয় সংবাদ ১২.০০
বোধোদয় ১২.০০
সীমাবদ্ধ ১২.০০
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ১২.০০
পদ্মপাতায় জল ৭.০০
যা বলো তাই বলো ৮.০০
কত অজানারে ১২.০০

এপার বাংলা ওপার বাংলা-র
পরবর্তী পরিপূরক গ্রন্থ ঃ
যেখানে যেমন ১২ টাকা

কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। লণ্ডনে বি-বি-সির বাংলা বিভাগের সুরসিক বন্ধু মনে করিয়ে দিলেন—"বিদেশে বাঙালী মাত্রই সজ্জন, তাই না ?"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বনগ্রামের বন থেকে একদা রেলে চড়ে শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছিলাম এবং সেখান থেকে সেকেণ্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সেই যে হাওড়ার নতুন বাসায় হাজির হয়েছিলাম তারপর আর নড়াচড়া করিনি। কাসুন্দিয়ার আধা-মফঃস্বল পরিবেশে জীবনের দশ আনা ব্যয় করে হঠাৎ বিদেশে পাড়ি দিয়েছি। স্বদেশের বাইরে প্রথম একশ ঘন্টার ভ্যাবাচাকা খাওয়া অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিলাম বি বি-সির কমলবাবুকে।

কমলবাবু প্রশ্ন করলেন, "এই ক'দিনের সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা কী হলো বলুন ?"

বললুম, 'বিলেতের ইতিহাস-ভূগোল-অর্থনীতির বড় বড় ব্যাপারগুলো এখন ও মনে ধরছে না। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন, আমি 'প্রভিন্সিয়াল' বঙ্গসন্তান—বার্মিংহামের ঘটনাটাই বুকের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।"

যে-শহরে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছি, যেখানকার লবণে শ্রীঅঙ্গ তেত্রিশ বছর ধরে পুষ্ট হয়েছে, সেই হাওড়াকে বাংলার বার্মিংহাম বলা হয়। আসল বিলিতী বার্মিংহাম দেখার লোভটা ছোটবেলা থেকেই প্রবল ছিল। তাই প্যান আমেরিকান বোয়িং ৭০৭ থেকে লণ্ডনের মাটিতে পা দিয়েই বার্মিংহামের কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। সুযোগ এসে গেলো এবং দু-একদিনের মধ্যে 'ভারতীয় বার্মিংহামের' রেজিস্টার্ড নাগরিক আমি বিলিতী বার্মিংহামের উদ্দেশে রেল গাড়িতে চড়ে বসলাম। বার্মিংহাম স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে মালপত্তর একটা হোটেলের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে তখন সন্ধ্যার ধোঁয়াশা নেমেছে—সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ধার-করা ভারি ওভারকোট ফুঁড়ে শিল্পনগরীর শীত সমগ্র দেহে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। সে-যন্ত্রণা যদিও বা সহ্য হয়, অসহ্য লাগছিল নিঃসঙ্গতা। এই তো দুদিন আগেও কেমন কলকাতায় পরিচিত প্রিয়জন পরিবেষ্টিত

হয়ে মনের সুখে নরকগুলজার করছিলাম। নিজেকে বার্মিংগাঁওয়ের এই স্বেচ্ছানির্বাসনে পাঠাবার দুর্মতি কেন যে আমার মাথায় এলো ভেবে নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলাম।

রাস্তায় পথচারীর অভাব নেই। রেস্তোরাঁয়, পাব-এ, নৃত্যকেন্দ্রে রসিক নাগরিকরা সামনে পানপাত্র রেখে আসর জমিয়ে বসেছেন। রানী এলিজাবেথের তরুণ প্রজাবৃন্দ রুলেটশপে জুয়ার ভিড় জমিয়েছেন। বার্মিংহাম পৌরসভার হিসেব অনুযায়ী সামান্য কয়েক বর্গমাইলের মধ্যে বেশ কয়েক লক্ষ লোক গিজ গিজ করছেন—তবু আমি একা বোধ করছি। বাংলার বার্মিংহামের এক বাদামী রঙের সন্তান সম্পর্কে বিলেতের বার্মিংহামে কারও কোনো আগ্রহ নেই। ভাবটা এই রকম: টিকিট কেটে এসেছো, ভাল কথা। ওয়েলকাম টু আওয়ার সিটি। পয়সা ফেলে হোটেলে থাকো, কলকারখানায় নিজের কাজকর্ম থাকলে সেরে ফেলো, ফিরে এসে হোটেলের লাউঞ্জে কিংবা নিজের ঘরে বসে টিভি দেখো, তাতে মন না ভরলে অদূরে মক্কা লিমিটেডের নাইট ক্লাব রয়েছে। এরাই তো ক'দিন আগে তোমাদের ইণ্ডিয়ার একটা অর্ডিনারি মেয়েকে বিশ্বসুন্দরী বানিয়ে দিয়েছে। কয়েক শিলিং প্রবেশমূল্য দিয়ে নাইট ক্লাবে ঢুকে নাচ দেখো, গান শোনো, কপাল ঠুকে কোনো বার্মিংললনাকে নৃত্যে নিমন্ত্রণ জানাও, দেবী সম্মতি দিলে 'বার্নিং' হৃদয়ে অবশ্যই শান্তিবারি সিঞ্চিত হবে।

কোথায় যেন একটা দূরত্ব থেকে যাচ্ছে, আন্তরিকতার স্পর্শ যে অনুপস্থিত তা বুঝতে দু'দিন-দেশ ছাড়া মনটার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। ভ্রমণ-বিজ্ঞানীরা হয়তো একেই হোম-সিকনেস বা 'গৃহ-ব্যাধি' বলে থাকেন, মৃদু ভর্ৎসনা জানিয়ে উপদেশ দেন—"সময়ই এই ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা। দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে; তখন যাতে দেশে না ফিরতে হয় তার জন্যে নিজেই কত চেষ্টা করবে এবং সেইসব চেষ্টা আশানুরূপ ফলবতী না হলে শরীর খারাপ করবে।"

অতশত বুঝেও মন ছটফট করছে, একটা অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণা নিজেকে মোচড় দিচ্ছে, আর ভর্ৎসনা করছে: 'তাঁতি, বেশ তো হাওড়ায় তাঁত বুনে খাচ্ছিলে, এঁড়ে গোরু কিনে নিজের এই হাল করবার কী দরকার ছিল? না হয়, মার্কিন সরকারের রাষ্ট্রদূত তোমাকে তাঁর দেশ

দেখবার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তুমি যে সেই শিবুদা'র মতো হলে, যাঁর সম্পর্কে রেল আপিসের সহকর্মীরা বলতো—বিনা পয়সায় বিষ পেলেও শিবু ছাড়বে না।'

ফুটপাথের একধারে দাঁড়িয়ে যখন এই সব কথা ভাবছিলাম, ঠিক সেই সময় নির্ভেজাল পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে বাংলা কথা কানে এলো। কয়েক গজ দূরে ফুটপাথের উপরেই বিলিতী টুইডের কম্বিনেশন স্যুটপরা বাদামী রঙের দুই আলোচনারত পুরুষ: "যা কইতেসি শুন্যান! আরও বিশ পাউণ্ড স্টক কর্যান, আবার কবে আইব জানি না!"

ইদানীং কালে সরকারি উদ্যোগে কথাটার মানে খারাপ হয়ে গিয়েছে, না হলে বলতাম—আমার মনে হলো আকাশবাণী শুনছি। ভক্তের বিপদে স্থির থাকতে না পেরে ভগবান স্বয়ং এই ম্লেচ্ছদেশে আমার জন্যে বঙ্গভাষী পাঠিয়ে দিয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা অনেক পড়েছি, গানও শুনেছি বহু, কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা নিজেও করেছি, কিন্তু মোদের গরব মোদের আশা এই বাংলা ভাষায় যে কী জাদু আছে তা জীবনে এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম।

সৌজন্যের ব্যাকরণে অমার্জনীয় ত্রুটি হলেও এই দুই অপরিচিত পথচারীর প্রায় নাকের ডগায় এসে দাঁড়ালুম। বিনা অনুমতিতে তাঁদের প্রাইভেসি ভঙ্গ করে বললাম, "আমার অপরাধ মার্জনা করবেন, আপনারা বাংলায় কথা বলছেন শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি কলকাতা থেকে সবে বিদেশে এসেছি, বাংলায় কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি, আর পারছি না।"

ভদ্রলোক দুজন পরম আদরে আমাকে আশ্রয় দিলেন। বললেন, 'আপনিও বাঙালী, আমরাও বাঙালী। এতো কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন? এটা তো আমাদের প্রত্যেক বাঙালীর হক।"

অন্য ভদ্রলোকটি বললেন, "খুব খুশী হলাম পরিচয় করে। যদি আপত্তি না থাকে, গরীবের সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন?" তারপর একটু কিন্তু-কিন্তু করে বললেন, "একটা কথা অবশ্য আপনাকে বলে রাখা ভাল; হয়তো আপনি ভেবেছেন আমরা ইণ্ডিয়ান—কিন্তু আমরা পাকিস্তানী।"

তাতে যে আমার কিছুই এসে যায় না একথা জানিয়ে দিতে আমার

এক মুহূর্তও লাগলো না। ভদ্রলোক দুজন পরম আদরে আমাকে কয়েক গজ দূরের এক রেস্তোরাঁয় এনে ঢোকালেন। এঁদের একজনই যে রেস্তোরাঁর মালিক তা এবার প্রকাশ হলো। চট্টগ্রামের বাসিন্দা, সংসারস্রোতে ভাসতে-ভাসতে এই বার্মিংহামে নোঙর ফেলেছেন।

আর একজনের নাম আজিজ। আজিজ সাহেব বললেন, "আমি মশাই মাছের ব্যবসা করি। ইংলণ্ডে যত ইণ্ডিয়ান আর পাকিস্তানী রেস্তোরাঁ আছে সেখানে চিংড়িমাছ সাপ্লাই করি।"

"এইটুকু দেশে আর ক'টা দেশী রেস্তোরাঁ আছে।" আমি উত্তর দিই।

আজিজ আমার ভুল ভাঙলেন। "বলেন কী! লণ্ডনেই তো আমরা প্রায় দেড়শো রেস্তোরাঁয় মাল সাপ্লাই করি। এই বার্মিংহাম শহরেই তিরিশ-চল্লিশটা ইন্দো পাকিস্তানী দোকান আছে। লণ্ডনে ভ্যানের মধ্যে মাছ বোঝাই করে আমি সমস্ত বিলেত দেশটা চষে বেড়াই। আমাদেরই হয়েছে মুশকিল—কোনটা যে ইণ্ডিয়ান দোকান আর কোনটা যে পাকিস্তানী তা বোঝা যায় না। তাই আমার পার্টনার নিয়েছি কলকাতার এক ভদ্রলোককে—জেনুইন ইণ্ডিয়ান-পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠান, কেউ কোনো খুঁত বার করতে পারবে না।"

আজিজ সায়েব এবার আমার পরিচয় চাইলেন—কী করি, কিসের ধান্দায় কালাপানি পার হয়েছি, তিনি কোনো উপকার করতে পারেন কিনা, ইত্যাদি প্রশ্ন।

অগত্যা নিজের পরিচয় দিতে হলো এবং শোনামাত্রই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। "এতক্ষণ বলবেন তো স্যার, আপনি বাঙালী রাইটার। আপনার বই তো আমি ঢাকা থেকে কিনে এনেছি, আমার বাড়িতে রয়েছে। আহা, আগে জানলে বইখানা সঙ্গে রেখে দিতাম, আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া যেতো।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর আজিজ-এর অসীম-শ্রদ্ধা। "আমাদের বাংলা সাহিত্য যে কী দ্রব্য, সে তো এ দেশের লোকগুলো বুঝলো না," আজিজ দুঃখ করতে লাগলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "আপনাদের বলতে বাধা নেই, ব্যবসা থেকে টু-পাইস কামাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাছ আনাচ্ছি। আপনাকে একটা কিন্তু উপকার করতে হবে। কোম্পানিটা আমার নিজের মেয়ের মতো। একটা ভাল নাম

করে দিতে হবে। সায়েবী নাম-টাম না মশাই—এমন নাম যাতে বোঝা যায়, এতে ইণ্ডিয়ান আছে এবং পাকিস্তানীও আছে।"

"নাম দিন গঙ্গা-পদ্মা লিমিটেড!" এই বলে হাসতে লাগলাম।

"আপনি হাসছেন বটে, কিন্তু নামটা চমৎকার।" আজিজ অকপটে তাঁর আনন্দ প্রকাশ করলেন। রেস্তোরাঁর মালিক ইতিমধ্যে কিছু খাবার নিয়ে এসেছেন। কাজকর্মের তোয়াক্কা না-করে, আমাদের টেবিলে বসে তিনি প্রাণভরে গল্প করতে লাগলেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আজিজ প্রশ্ন করলেন, "আপনার তো এখন কোনও কাজ নেই। চলুন আমাদের গাড়িতে, আরও দু'-একটা রেস্তোরাঁয় পায়ের ধুলো দিন।"

গাড়ি চালিয়ে মাইল খানেক দূরে আর এক দোকানে আমাকে হাজির করলেন আজিজ। ওঁর কথাবার্তা শুনে কে বলবে আমাদের আলাপ মাত্র আধ ঘন্টার! দোকানে ঢুকেই আজিজ চিৎকার করে উঠলেন, "ও মিঞা, আজকে শুধু মাছ বিক্রি করতে আসিনি; বড় এক বাংলা রাইটার ধরে এনেছি। বই পড়ে মানে বোঝবার কপাল করে তো আসনি, খোদ রাইটারদের দেখে চোখ সার্থক করো।"

আমি আপত্তি করতে গেলাম, কিন্তু কোনো ফলই হলো না—দোকানের সাহেব খদ্দেরদের ফেলে রেখে পূর্ব পাকিস্তানী মালিক আমাদের আদর-যত্ন শুরু করলেন। নিজের হাতে চা নিয়ে এলেন এবং "গরীবের এখানে রাত্রের ডিনার করলে" যে কৃতার্থ হবেন, তা জানালেন।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক লাগিয়ে আজিজ সাহেব আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "কেবল পাকিস্তানী দেখে-দেখে আপনার মন খারাপ হচ্ছে। চলুন, আপনাকে এক কলকাতার পোলার কাছে নিয়ে যাই।"

প্রায় জোর করেই আজিজ আমাকে আবার গাড়িতে তুললেন। মাইল কয়েক ড্রাইভ করে এবার যে রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামালেন সেটি আকারে বৃহৎ। দোকানে তখনই নৈশভোজীদের ভিড় শুরু হয়েছে। সায়েব-মেমসায়েব জোড়ে-জোড়ে টেবিল দখল করছেন। আজিজ ফিস ফিস করে বললেন, "এ আর কি দেখছেন। এখন যারা খেতে এসেছে তাদের ডিনারের পরে অন্য কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আসল

খদ্দেররা আসবে এক ঘণ্টা পরে. তখন এখানে লোক ধরবে না। অর্ধেক টেবিল আগে থেকে রিজার্ভ করা আছে। আমাদের চৌধুরীদা বছর কয়েক আগে নিঃসম্বল অবস্থায় বিলেতে এসেছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে শুরু করেছিলেন—এখন খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন। কোন দোকান কেমন চলছে তা আমি মাছের অর্ডার থেকে বুঝতে পারি। চৌধুরীদা আমার কাছ থেকে সপ্তাহে আড়াই শ' পাউণ্ড চিংড়িমাছ নিচ্ছেন, আমি ছাড়া আরও সাপ্লায়ার আছে।"

আমাকে একটা টেবিলে বসিয়ে আজিজ সাহেব এবার চৌধুরীর সন্ধানে কিচেনে ঢুকে গেলেন। দেখলাম কাঁচের তলায় লেখা--'ইলোরা রেস্তোরাঁ—বেস্ট অফ ইণ্ডিয়ান, পাকিস্তানী অ্যাণ্ড চাইনিজ হসপিটালিটি'। এযুগের ইংরেজ যুবক-যুবতীরা এশীয় খাদ্যে আগ্রহী—কিন্তু রন্ধনকলায় ভারতবর্ষ পাকিস্তান চীন ইত্যাদির পার্থক্য অত দূর থেকে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আমরা এতে বিরক্ত বোধ করতে পারি, কিন্তু ম্লেচ্ছদেশে যাঁরা একটা ছোট্ট দোকান খুলে বসেছেন তাঁদের সমস্যা সমাধান করতেই হবে। তাই লিখতে হয়েছে—ভারতীয়, পাকিস্তানী ও চীনা আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা যদি একত্রে একই খরচে একই সন্ধ্যায় উপভোগ করতে চান তা হলে ইলোরা রেস্তোরাঁয় পদধূলি দিন এবং বন্ধুদের বলুন। বান্ধবীকে যদি হতাশ না করতে চান, তা হলে আগে থেকে টেবিল রিজার্ভ করুন। আমাদের একটি জুয়ার দোকানও আছে—সেখানে ভাগ্যপরীক্ষার আধুনিক সর্বপ্রকার যন্ত্র রয়েছে। আপনার অর্থ দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত, চতুর্গুণিত করুন। ইলোরা কফি-বারে কফি এবং সান্নিধ্য (কফি অ্যাণ্ড কম্পানি) দুই-ই মধুর।"

চৌধুরী দ্রুত বেরিয়ে এসে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলেন, যেন কোনো নিকট আত্মীয় বহুদিন পরে বিদেশে তাঁর সঙ্গে দেখাকরতে এসেছে। বললেন, "আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য, একজন দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।"

আজিজ বললেন. "কত পাউণ্ড চিংড়ি দেবো? তিন শ' পাউণ্ডের অর্ডার লিখি?"

চৌধুরী বললেন, "ইউনিভার্সিটি বন্ধ, ছেলেমেয়েদের ভিড় কম, দু'শ পাউণ্ড করুন।"

আমার দিকে তাকিয়ে চৌধুরী বললেন, "আপনাদের আশীর্বাদে সায়েবরা ইন্দো-পাকিস্তান কারির মূল্য বুঝতে আরম্ভ করেছে। আমি যখন প্রথম লণ্ডনে এলাম, তখন ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁর প্রধান ভরসা ছিলেন ইণ্ডিয়া-ফেরত বুড়ো সায়েবগুলো। তাঁদের ওপর নির্ভর করে থাকলে আমাদের ব্যবসাকেও ওঁদের সঙ্গে গোরস্থানে পাঠাতে হতো। কিন্তু ভগবানের দয়ায় ছেলে-ছোকরারা এখন ঝালের মর্ম বুঝেছে। 'ডেট'দের সঙ্গে করে ইণ্ডিয়ান হোটেলে আসাটা এখন ফ্যাশন। এমনভাবে চললে, আর কিছুদিনের মধ্যে চীনাদের হারিয়ে দেবো আমরা। ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ বহু রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে খাবার ভাল, দাম ন্যায্য মহারাজা-মহারানীর খাতির"।

আজিজের কাছে শুনলাম, ইলোরা রেস্তোরাঁর এই টেবিল-চেয়ারে বসে বছরে অন্তত শতখানেক যুবক তাদের বালিকা-বান্ধবীর কাছে 'প্রস্তাব' করেন। এখানকার এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে বধূ হবার 'প্রপোজাল' সুন্দরীরা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না।

চৌধুরী বললেন, "আজকে দুটি খেয়ে যেতেই হবে।" কোনো ওজর-আপত্তি না-শুনে চৌধুরী রান্নাঘরে খাবার সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দিতে গেলেন। মালিকের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাদা শার্ক-স্কিনের স্যুট ও কালো বো-টাই-পরা দুই ওয়েটার যুবক একসঙ্গে এগিয়ে এলো আমার দিকে এবং অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কলকাতা থেকে আসছেন?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার নাম বরুণ সাহা। আমরাও যাদবপুরে বাসা নিসি।"

সঙ্গের সহকর্মীকে দেখিয়ে সাহা বললে, "এর নাম জিয়াযুল হক। এদের জন্যেই তো আমাদের যত দুর্গতি। ছিলাম বরিশাল; চাল-চুলা ছাইড়্যা অ্যাজ এ রিফুজি কলকাতা আইলাম। তারপর ভাই-বোন-বাবা মা সমেত ন'জন ফেমিলি মেম্বারকে 'সেভ' করার জন্য কালাপানি পার হইলাম।"

হক এতক্ষণ ফিক ফিক করে হাসছিল। শুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণে সে বললে, "আমাদের বাড়ি ছিল হাওড়ার বাঁকড়া গ্রামে। রিফ্যুজি হয়ে

বাবা পাকিস্তানে গেলেন। তারপর পেটের দায়ে দেশ থেকে পালিয়ে বার্মিংগাঁওয়ে এসে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ সাহাদার সঙ্গে একদিন রাস্তায় আলাপ হয়ে গেলো। দাদা আমার চাকরি করে দিলেন ; এখন দু'জনে একখানা ঘর ভাড়া করে একসঙ্গে আছি।"

বরুণ সাহা বললো, "ল্যাখাপড়া শিখি নাই, তাই আমাদের ওয়েটার হওয়া ছাড়া গতি কী? কিন্তু আমার কাকা ডবল গ্র্যাজুয়েট, দিল্লীতে হাই-অফিসার। কাকা লিখেছেন মাসে দশ টাকা সঞ্চয় করতে পারেন না। আপনাদের আশীর্বাদে আমি মান্থলি বারশ' টাকা 'সেভ' করত্যাসি।"

সুদূর বিদেশে ওয়েটারের কাজে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ঘরের সন্তান বরুণ সাহা তেমন মনোবল পাচ্ছিল না। তাই আমার কাছে ভরসা চাইলো, "বিদেশে আইস্যা ভুল করিনি, কী বলেন?"

"মোটেই না।" আমি উত্তর দিই।

"তবে চিরকাল থাকছি না। কয়েক হাজার টাকা কামাই করে কলকাতায় ফিরে একটা চপ-কাটলেটের দোকান দেবো।"

বরুণ সাহার আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মালিক ফিরে আসায় আর কথা হলো না।

পাছে আমি বিব্রত হই, তাই চৌধুরী নিজেই আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। পরম আদরে নানারকম মধুর অত্যাচারে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে অতিথিসেবাপর্ব শেষ করলেন। দেশ ছাড়বার আগে অনেকের কাছে শুনেছি, বিদেশে 'কারি' পাওয়া যায় না, 'কারি'র নামে সায়েবদের কাছে যা বিক্রি করা হয়, তা কারির 'অ্যাপলজি'! কারির বিরুদ্ধে যাঁরা এই সব গুজব ছড়িয়ে বেড়ান, তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, একবার বার্মিংহামে চৌধুরীর রেস্তোরাঁয় পদধূলি দেবেন। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বহু পরিবারে এবং বহু দোকানে কারি খেয়েছি, কিন্তু আমার কারি-অভিজ্ঞতায় প্রথম স্থান দিতে হবে চৌধুরীর দোকানকে।

চৌধুরী সেদিন শুধু আপ্যায়নই করেননি, নিজের জীবনসংগ্রামের কথা, বিধবা মায়ের এবং তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর বিবরণও দিতে দ্বিধা বোধ

করেননি। রেস্তোরাঁর কাজকর্মে সাময়িক বিরতি দিয়ে, নিজের গাড়ি চার করে আমাকে বার্মিংহাম স্টেশনের ধারে অ্যালবানি হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং বিদায় নেবার আগে বলেছিলেন, "বার্মিংহামে এই আপনার শেষ হোটেলে থাকা—ফের যখন এখানে আসবেন তখন গরীবের বাড়িতে উঠতেই হবে।"

সেদিন হোটেলে ফিরে টেলিভিশনে ছবি দেখতে দেখতে মনে মনে পূর্বপাকিস্তানী আজিজকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। সাতচল্লিশ সালে দেশ যখন দু'ভাগ হলো তখন আমি ইস্কুলের ছাত্র, নিজের চোখে পূর্ব বাংলা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। পাকিস্তানীদের সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আমার ছিল না। সংবাদ ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে-ছবিটা মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে সেটা তেমন উৎসাহজনক নয়। এই প্রথম বিদেশের মাটিতে একদা-স্বদেশের এক ভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এবং প্রথম সাক্ষাতেই যে তাঁকে হৃদয় দিয়ে ফেলেছি তা বুঝতে পারলাম।

লণ্ডনে বি-বি-সি বিচিত্রার কর্মকর্তা কমলবাবু এই কাহিনী শুনেই মনে করিয়ে দিলেন—বিদেশে বাঙালীমাত্রই সজ্জন।

লণ্ডনে ফিরে এসে আর এক ভদ্রলোককে মনের কথা বলছিলাম। বিদেশী বাঙালীমাত্রই যে সজ্জন তার আর একটি পরিচয় আমাদের এই এস আর চৌধুরী। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ওপর অফিস নিয়ে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের ব্যবসা করেন, আর দেশের লোক পেলেই পাকড়াও করে বাড়িতে নিয়ে যান মাছের ঝোলভাত খাওয়াতে। লণ্ডনে ওয়াকিবহাল মহলে এঁর স্ত্রীর রন্ধন-খ্যাতি আলোচনার বিষয়। শুধু রন্ধন-প্রতিভা থাকলেই বড় রাঁধুনি হওয়া যায় না—স্বগৃহে চৌধুরীমশায়ের মতো একজন সমঝদার স্বামী প্রয়োজন! চৌধুরীমশাই বললেন, "বিলেতে বাংলা সংস্কৃতির প্রধান সাপোর্টার পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ-তরুণীরা। বাংলা সিনেমার খবর পেলেই তাঁরা দল বেঁধে আসবেন।" এঁদের বক্তব্য, "আমরা উৎসাহ না দেখালে বাংলার জিনিস আর বিদেশে আসবে না।"

এই প্রসঙ্গে আমার হিন্দীর খ্যাতনামা কবি শ্রীরামধারি সিং দিনকরের কথা মনে পড়ে গেলো। পাটনা থেকে কলকাতা আসবার পথে ট্রেনে

দিনকরজীর সঙ্গে আলাপ। হিন্দী প্রচারে তাঁর 'মিশনারী উৎসাহ'। দুঃখ করে বললেন, "ব্যাপারটা কি জানেন, উত্তর ভারতের লোকেরা হিন্দীর জন্যে রক্তপাত করতে রাজী আছেন, কিন্তু অর্থব্যয় নৈব নৈব চ। কোটি-কোটি লোকের ভাষা, কিন্তু হিন্দীতে বই বিক্রী হয় ক'খানা? ক'জন হিন্দীভাষী তাঁদের শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম জানে? ক'জন তাঁদের লেখার সঙ্গে পরিচিত?"

চৌধুরী উত্তর দিলেন, "ঠিক বলেছেন। পূর্বপাকিস্তানীদের প্রীতি ও উৎসাহ না পেলে আমার পক্ষে বাংলা ছবি দেখানো বোধ হয় অসম্ভব হয়ে পড়তো।"

যাবার আগে চৌধুরী সাহেব একটা দরকারী উপদেশ দিয়েছিলেন। "বিদেশে যখন একবার বেরিয়েছেন, পূর্ববাংলার ছেলেদের সঙ্গে একটু ভাবসাব করবেন। আপনারা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করেন, ওদের সব থেকে ভাল করে আপনারাই বুঝতে পারবেন।"

ট্রান্স-ওয়ার্লড-এয়ারলাইনস্-এর জেট বিমানে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করার সময়ে, কেন জানি না চৌধুরীর কথাগুলো মনে পড়ে গেলো। ভাবলাম, হয়তো বিদেশে বহুদিন বাস করে বাংলা কালচার সম্বন্ধে চৌধুরী অতিরিক্ত রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন, তাই-চিন্তা না করে ভাবালু একটা উপদেশ দিয়ে দিলেন।

কিন্তু সংসারের যুদ্ধে অনেক ধাক্কা-খাওয়া চৌধুরী যে সত্যি কথা বলেছিলেন, তার বহু নিদর্শন মার্কিন মুলুকে অচিরেই পাওয়া গেলো।

মার্কিন দেশ ভ্রমণরত বিদেশীদের অভ্যর্থনার জন্যে ওয়াশিংটনে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। সরকারের কাছে সামান্য অর্থসাহায্য নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক এবং সেবিকারা একটি সেন্টার গড়ে তুলেছেন, সেখানে বিদেশীরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করেন এবং মার্কিনীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। বিদেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী অনেক মার্কিন যুবক-যুবতীও নতুন বন্ধুর সন্ধানে এখানে আসেন। প্রজাপতির ষড়যন্ত্রে অনেক আন্তর্জাতিক বিবাহের ভিত্তিপ্রস্তরও এখানে স্থাপিত হয়েছে।

জলস্রোতের মতো বিদেশের প্রায় সবদেশ থেকে অতিথি প্রতিদিন ওয়াশিংটনে আসেন। পৃথিবীর আর কোনো শহরে সরকারী খাতে এতো যাত্রীর আগমন হয় না। বিমানবন্দরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অতিথিসৎকার বিভাগের কোনো কর্মীর সঙ্গে জানা-শোনা থাকলে শুনবেন, একই দিনে তিনি যাঁদের স্বাগতম্ জানালেন তাঁদের মধ্যে হয়তো রয়েছেন মাদাগাস্কারের মেয়র, সিয়েরা-লিয়নের আইন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, সাইপ্রাসের জেলাশাসক, কোরিয়ার জন্মনিয়ন্ত্রণ সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট, থাইল্যাণ্ডের নাট্য-উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী উপদেষ্টা, ইরানের স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্যসচিব, ঘানার সেচ বিভাগের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়র, নাইজেরিয়ার গ্রামোন্নয়ন পরিষদের ম্যানেজার। ভারত ও পাকিস্তান থেকেও নিশ্চয় আধডজন অতিথি থাকবেন। যথা (নামগুলি কাল্পনিক): আয়কর বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কে জনার্দনম্, সার নির্মাণ কর্পোরেশনের সরকারী বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এস নাগরাজন, ভারতীয় রেলপথের অটোমেশন সংক্রান্ত বিভাগের অফিসার-অন-স্পেশাল-ডিউটি সর্দার মোহন সিং, সমাজসেবা বোর্ডের সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরাধা খান (প্রাক্‌বিবাহিতা জীবনে যিনি অনুরাধা মিত্র নামে সুপরিচিতা ছিলেন), পাকিস্তান উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য আকসার আলি সি-এস-পি (আমাদের আই-এ-এস-এর পাকিস্তান সংস্করণ—সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান) এবং কৃষি বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ রহমান।

এই অতিথিদের জন্য সেন্টার প্রায়ই বাসভাড়া করে ওয়াশিংটন দর্শনের ব্যবস্থা করেন। রবিবার সকালে একদিন বাস-এর জন্যে অপেক্ষা করছি। একজন মার্কিন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞেস করলাম, "আজকের দলে কোনো ইণ্ডিয়ান আছেন?" ইণ্ডিয়ান নেই, বরং একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, তিনজন পাকিস্তানী আছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক তা জানতে দুনিয়ার কারুর বাকি নেই। স্বেচ্ছাসেবক তাই বেশ ঘাবড়ে গেলেন; তাঁর মুখ দেখে মনে হলো আশঙ্কা করছেন গাড়ির মধ্যেই আমরা না আর এক ইন্দো-পাকিস্তানী যুদ্ধ বাধিয়ে বসি।

পাকিস্তানী ভদ্রলোকরা একটু পরেই হাজির হলেন। বুদ্ধিমান মার্কিন

স্বেচ্ছাসেবকটি ইচ্ছে করেই ওঁদের আমার থেকে একটু দূরে বসালেন, যদিও আমার পাশে তিনজনের বসবার মতো খালি জায়গা ছিল।

বাস চলতে শুরু করলো। শুভ্রা স্বেচ্ছাসেবিকা তাঁর সোনালী কণ্ঠস্বরে ওয়াশিংটন মহানগরীর ইতিহাস ও অবস্থান বর্ণনা শুরু করলেন। "ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যাণ্ড রাজ্যের মাঝামাঝি কলাম্বিয়া ডিস্ট্রিকটে পটোম্যাক নদীর ধারের এই জায়গাটি জর্জ ওয়াশিংটন স্বয়ং পছন্দ করেছিলেন। এই শহরের ছশো কুড়ি মাইল পূর্বে নিউইয়র্ক, ১১১৫ মাইল দক্ষিণে মিয়ামি, আর পশ্চিমপ্রান্তের লস্ অ্যানজেলস ২৭২৫ মাইল। রাজধানীর জমি কেনা হয় ১৭৯১ সালে এবং নগর পরিকল্পনা করেন একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়র মেজর পিয়েল ল' এফ্যাণ্ট। অত্যন্ত আধুনিক সব পরিকল্পনা দেওয়ার জন্য এঁর চাকরি যায়।"

"বুঝুন দাদা, সাম চাচার কাণ্ডটা! এমন শহর বানাবার পুরস্কার হলো চাকরিটি খাওয়া।" হঠাৎ খাঁটি বাংলায় কানের গোড়ায় মার্কিন ইতিহাসের বিশ্লেষণ শুনে বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে দেখি পাকিস্তানী ভদ্রলোকদের একজন আমার পাশে বসে পড়েছেন।

"তা দাদার আসা হচ্ছে কোথা থেকে?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"কলকাতা থেকে," উত্তর দিলাম।

"দূর থেকে দেখে ঠিক ধরেছি। নিরীহ গোবেচারা বাঙালী ছাড়া এই বিদেশে বাসের মধ্যে অমন মুখ কাঁচুমাচু করে বসে থাকবে কে?"

এমন আমুদে লোকের সঙ্গে ভাব হয়ে যেতে এক সেকেণ্ড লাগে। নাম মকবুল আমেদ। কোটের বুকপকেট দেখিয়ে বললেন, "কর্তারা নাম ঠিকানা বংশ পরিচয় সব এখানে কার্ডে লিখে দিয়েছেন। ওই পরে বুক ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর আমার বন্ধু মহম্মদ আলী ওইখানে বসে রয়েছে পাঠান শের আলীর সঙ্গে।"

এঁরা দু'জনে পাকিস্তান অর্থদপ্তরের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। মকবুল বললেন, "আমরা তিনজনেই এ-আই-ডির মাল। এক বছর এখানে থেকে কাজকর্ম শিখে ফিরে গিয়ে দেশোদ্ধার করবো। আমাদের গ্রুপে খান পাঁচেক লম্বা-চওড়া ইণ্ডিয়ান আছে, কিন্তু একটাও বঙ্গভাষী নয়।"

আমি গম্ভীরভাবে কোনো উত্তর না দিয়ে ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। মকবুল বললেন, "কী দাদা? একটা কিছু মতামত ছাড়ুন। না, আপনিও সেই বাসু সায়েবের দলে? নিউ ইয়র্কে আলাপ হলো ওঁর সঙ্গে। উনিও আমার মতো এ-আই-ডির মাল। বাংলায় কথা বলাটাকে ভদ্রলোক প্রাদেশিকতা মনে করেন। দিল্লিতে হাইপোস্টে চাকরি করে-করে এমন খাঁটি ইণ্ডিয়ান হয়েছেন যে, প্রথমে হিন্দী বলবেন, আর দরকার হলে সঙ্গে ইংরেজী তর্জমা দিয়ে দেবেন। তা দাদা, আমিও ইসলামাবাদে পোস্টেড, শ্বশুরবাড়ির লোকদের ধারণা চাকরিটা নেহাত ছোট করি না, কিন্তু বাংলায় কথা না বললে প্রাণটা আই-ঢাই করে।"

আমি হাসছিলাম। মকবুল বললেন, "আমরা যাকে জাতীয়তা মনে করি, এই বিদেশে ইণ্ডিয়ার বেঙ্গলীদের কাছে শুনছি সেটা প্রাদেশিকতা।"

মকবুল বেশ চড়া গলায় কথা বলে যাচ্ছেন। আমি সামান্য বিব্রত বোধ করছিলাম। মকবুল বললেন, "প্রাণের সুখে গলা ফাটিয়ে বাংলায় গল্প করে যান দাদা—এখানে কোনো ব্যাটা বুঝবে না।"

মকবুল এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন। "সীতাকে ইসলামাবাদে ফেলে রাম বনবাসে এসেছে। এখানে ছ'মাস কেটেছে, আরও ছ'টা মাস। ইতিমধ্যে বিবি তো ওখানে একখানা বিরহের পত্তর বই ছাপিয়ে ফেলেছেন। বাংলায় এম-এ পাশ করে প্রফেসরী করেন। তা আপনি এদেশে কোন দুঃখে। গভরমেণ্টের কোন্ ডিপার্ট আপনার?"

নিজের পরিচয় দিতে হলো এবার। গত বছর মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলজ হঠাৎ এক চিঠি পাঠিয়ে বসলেন। এতো লোকজন থাকতে বিহারী চক্রবর্তী লেনের আমাকে কেমন করে তিনি খুঁজে বার করলেন জানি না। চিঠিতে বিদেশ ভ্রমণের জন্তে নিমন্ত্রণ—নিজের চোখে মার্কিন দেশ দেখুন, যাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান বলুন এবং সেই সুযোগে আপনি নিশ্চয় মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আপনার দেশ সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা গড়ে তুলবার চেষ্টা করবেন। বিমানের টিকিট ও ভ্রমণের খরচ পররাষ্ট্র বিভাগের এক গ্রাণ্ট থেকে যোগানো হবে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত কতকগুলো বাধার ফলে প্রথম বছর যাওয়া হলো না। হস্তরেখাবিদ এক বন্ধু বললেন, হাতে রাজসম্মান ও বিদেশ ভ্রমণের যোগাযোগ রয়েছে, কিন্তু

এখনও পেকে ওঠেনি। পরের বছরে বোধ হয় সমুদ্রযাত্রার ফুল ফুটলো, তাই বিদেশে হাজির হয়েছি।

মুহূর্তের মধ্যে একেবারে পাল্টে গেলেন মকবুল। আলীকে চিৎকার করে এদিকে আসতে বললেন। আলী আসতেই বললেন, "কি সৌভাগ্য আমাদের। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! আপনার যতগুলো বই পাকিস্তানে পাওয়া যায় আমার স্ত্রী সব কিনেছেন। আপনার 'কত অজানারে' বই-এর পাকিস্তান সংস্করণে আপনি যা ভূমিকা লিখেছিলেন তা আমার মনে আছে। "সাহিত্যের নীল আকাশের নিচে কোনো ভৌগোলিক রাজনৈতিক সীমানা নেই—আমরা সবাই সেখানে রাজা, সেখানে আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা মানুষ।"

মহম্মদ আলীকে মকবুল বললেন, "কি লজ্জা, একজন লেখককে আমি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতোক্ষণ লেকচার দিচ্ছিলাম।"

বললাম, "লেকচার আপনি দেননি, তবে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী হিসেবে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি লোককে লেকচার দেবার অধিকার আপনাদের আছে। মাতৃভাষার জন্য আপনারা রক্ত দিয়েছেন—আমরা তো লোভী ব্রাহ্মণের মতো মায়ের সেবার নাম করে শুধু নিয়েই চলেছি।"

আমি নিজেকে ইমোশনাল মনে করতাম, কিন্তু দেখলাম পূর্ববাংলার মাটিতে আমার থেকে অনেক বেশী ইমোশনাল জন্ম নেয়। মকবুল আমেদ ও মহম্মদ আলী শুধু যে আমার সঙ্গী হলেন তা নয়, আমার হাতের ব্যাগ ও ক্যামেরা পর্যন্ত বইতে লাগলেন।

পাঠান শের আলী এদিকে একলা পড়ে গিয়ে বার বার সঙ্গীদের কাণ্ডকারখানা দেখছেন। কিন্তু এঁদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। মকবুল তখন বলছেন, "কি জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে—কেমন করে দুনিয়াকে বোঝান যায় বলুন। এরা কি মেঘনার বুকে বাঙালী মাঝিদের গান শুনেছে?"

আমি অবাক হয়ে এঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। মকবুল শুরু করলেন, "বলুন কলকাতার অবস্থা। শুনছি নাকি মানুষের বড় কষ্ট ওখানে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, চাকরি নেই, শান্তি নেই। সত্যি কথা নাকি?"

"মোটেই মিথ্যে নয়। মানুষের এতো দুর্গতি আগে কখনো দেখিনি।

পশ্চিম বাংলা বলতে এখন প্রায় কলকাতা। একটা ক্ষয়িষ্ণু শহর কেমন করে ভারতবর্ষের পঞ্চাশ কোটি লোকের অবহেলাভরা চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে তা ভাবলে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।"

আমার কথা শুনে মকবুল গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "আমিও তো কলকাতার ছেলে। ছোটবেলাটা মিরজাপুর স্ট্রীটে কাটিয়ে এসেছি। দিলখুসা রেস্তোরাঁর কবিরাজী কাটলেট, পুঁটিরামের দোকানের রাজভোগ, দ্বারিকের দোকানের লুচি আর ছোলার ডাল এখনও মুখে লেগে রয়েছে। স্টার, রঙমহল আর শ্রীরঙ্গমে থিয়েটার এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। যখন শুনি সেই কলকাতা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে পেরে উঠছে না তখন বড় কষ্ট হয়।"

"দূর থেকেও বেচারা কলকাতাকে ভালবাসার লোক আছে ভাবতে খুব ভাল লাগছে, মকবুল সায়েব।"

মকবুল বললেন, "এক এক সময় ভাবি কলকাতা যদি মরে যায়, তার জন্যে আমাদের অপরাধ কম হবে না। আমরা যদি ভুল বোঝাবুঝি করে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি না করতাম তাহলে কলকাতা শুকিয়ে যেতো না।"

মকবুলের মুখের দিকে তাকালাম, ওঁর মধ্যে যেন এক পরম বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। বাইরে তখন ওয়াশিংটনে নয়নাভিরাম দ্রষ্টব্যগুলি একের পর এক এগিয়ে আসছে। কিন্তু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নেই— আমাদের মন তখন পড়ে রয়েছে দুঃখিনী কলকাতায়।

বললুম, "খাঁটি বাংলা সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা একদিন হয়তো কেবল পূর্ব-পাকিস্তানেই বেঁচে থাকবে।"

মকবুল শিউরে উঠলেন। "কী যে বলেন! কলকাতাকে বাদ দিয়ে বাংলা কালচারের কথা ভাবা যায় না।"

আমি বললাম, "নীরোদ চৌধুরীর নাম শুনেছেন? ময়মনসিংহের ছেলে। 'একজন অখ্যাত ভারতীয়ের আত্মজীবনী' নামক গ্রন্থের দুর্মুখ লেখক হিসেবে এখন দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। মহাপণ্ডিত লোক, বাঙালীদের মতো গোঁয়ার এবং কোনোরকম রেখে-ঢেকে কথা বলেন না। ওঁর ধারণা, আপনারাই নির্ভেজাল বাঙালী সংস্কৃতির শেষ দুর্গ।"

মকবুল বললেন, 'আমাদের একটা সুবিধে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ বাঙালী। আমাদের পছন্দ না হলেও লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। গোড়ার দিকে আমরা মার খাচ্ছিলাম – কিন্তু এখন একটা হিসেব দিতে হচ্ছে। ইসলামাবাদেও বাংলা সাইন বোর্ড দেখবেন, বাংলা আমাদের বড় প্রিয়, আমাদের আদরের ধন।"

মাঝে মাঝে বাস থামছে। লিংকন্ মেমোরিয়াল, জেফারসন মেমোরিয়াল। আমরা তিনজন একসঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দেখছি, আর মকবুল প্রাণভরে বাংলা বলে যাচ্ছেন। "আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? অনেকদিন পরে যেন হারানো ভাইকে খুঁজে পেয়েছি।"

মহম্মদ আলী বললেন, "আমি দাদা কোনোদিন কলকাতায় যাইনি। তবে গল্প শুনেছি অনেক। আমার খুব ইচ্ছে ওখানে গিয়ে থিয়েটার দেখি আর সন্দেশ খাই।"

আমি বললাম, "পূর্ববাংলাও আমার চোখে দেখা নয়। তবে আমারও একটা স্বপ্ন আছে। যদি কেউ আমাকে বলে বিলেত ভ্রমণ আর পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণের মধ্যে একটা বেছে নাও, তাহলে আমি পাকিস্তানে বেড়াতে যাবো। পদ্মার বুকে ষ্টিমারে চড়ার আশাটা আমার বুকের মধ্যে অনেকদিন লালিত হচ্ছে। আর ষ্টিমারে ইলিশ মাছ আর ভাত – তার কাছে প্যারির ম্যাক্সিমও লাগে না।"

মকবুল বেশ দুঃখ পেলেন। ক্ষমতা থাকলে তখনই আমাকে ঢাকায় নেমন্তন্ন করে বসতেন। বললেন, "এই ষ্টিমারে পদ্মা পেরিয়ে কতবার তো ঢাকা গিয়েছি, কিন্তু কই কখনও তো তার মূল্য বুঝিনি।"

"হাতের মধ্যে থাকলে তার মূল্য বোঝা যায় না, ভাই। কলকাতার লোক আমরা মিনার্ভা, রঙমহল, স্টার-এর দাম বুঝি না। শিয়ালদার ব্যারনস হোটেল, কলেজ স্ট্রীটের জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান, হাতিবাগানের রামলাল, সিমলার চাচা, আর মানিকতলার গাঙ্গুরাম আমাদের মনে আনন্দের শিহরণ জাগায় না। আমরা ধরে নিয়েছি, এরা আমাদের হাতের পাঁচ। যদি কখনও এসব হারাই তখন আবার ভাল লাগবে, হয়তো চোখের জলও পড়বে." আমি বলি।

ইতিমধ্যে যাত্রীদল পটোম্যাক নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। মকবুল

বললেন, "ঠিক বলেছেন দাদা। ছোটবেলায় যখন কলকাতায় ছিলাম তার কোনো মূল্য বুঝিনি। কে হিঁদু, কে মুসলমান, কে খ্রেষ্টান এইসব বিষ কিন্তু তখনই মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। এখন ভাবি, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ওয়াশিংটনে চলে এলাম, অথচ ইসলামাবাদ থেকে ঢাকা ফেরার পথে কলকাতায় থেমে ছোটবেলার স্মৃতিগুলো দেখবার উপায় নেই।"

মহম্মদ আলী বয়সে তরুণ। যে পাঁকের মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে আমরা নিজের মাকে ভাগ করেছি তার প্রত্যক্ষ স্মৃতি নেই তার। সে জিজ্ঞেস করলো, "কেন এমন হলো বলুন তো?"

মকবুল বললেন, "সে আর ভেবে লাভ নেই। হাঁড়ি আলাদা হয়েছে, ঠিক হ্যায়, এখন অন্তত দু'ভাই-এর মধ্যে সদ্ভাব হোক। এই খাওয়া-খাওয়িতে কে মরছে বুঝছো না? মরছে বাঙালীর গান, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর আশা।" এবার একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন মকবুল। "না, লেখকের সামনে বড় বড় কোটেশন চালিয়ে ফেললাম। আসলে কি জানেন, এসব ভাবলেই বুকটা মুচড়ে ওঠে—কত ভাব মনে আসে, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাই না, তেমন করে তো বাংলা শিখিনি।"

পটোম্যাক নদীর ধার থেকে বাসে চড়ে আমরা চললাম বেশ কয়েক মাইল দূরে মাউন্ট ভারননে। এইখানেই জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ি। বিরাট এক পার্ক, আর তারই মধ্যে ওয়াশিংটনের স্মৃতিবিজড়িত ছোট্ট দোতলা বাড়ি। ওয়াশিংটনের ব্যবহৃত জিনিসপত্র পরম যত্নে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন বহু জনসমাগম হয়।

মহম্মদ আলী বললো, "দিনটা ভালই কাটছে। গোটা কয়েক মানুষের মতো মানুষের পীঠস্থান দেখা গেলো। ওয়াশিংটন, লিংকন, জেফারসন, কেনেডি দর্শন হলো চার ঘন্টার মধ্যে, আর কি চাই!"

পশ্চিমী সভ্যতার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হলো *Tips*—বকশিস বললে ঠিক সবটা বোঝায় না। কারণ বকশিসের মধ্যে দাতার একটা খুশী হওয়ার ভাব আছে, কিন্তু টিপ্‌স জিনিসটা শুধু আবশ্যিক নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার থেকেও বেশী। বিদেশীদের পরামর্শ দেবার জন্যে যেসব পুস্তিকা ছাপানো হয় তাতেও টিপ্‌সের শতকরা হার লেখা থাকে। ট্যাক্সির ড্রাইভার, হোটেলের বেলবয়, রেস্তোরাঁর ওয়েটার—এরা সকলেই নির্দিষ্ট

হারের কমে টিপ্‌স পেলে সোজাসুজি বিরক্তি প্রকাশ করবার স্বাধীনতা উপভোগ করে। টিপ্‌স ফিরিয়ে দেওয়ার তিনটি পদ্ধতি আছে: "মহাশয়, আপনি ভ্রমক্রমে আপনার ভাঙানি ফেলে যাচ্ছেন।" কিংবা, "মহাশয়, এই অর্থব্যয় বোধ হয় আপনার সাধ্যের অতিরিক্ত, এটি ফেরত নিন।" অথবা সোজাসুজি, "ট্যাক্সিতে তোমায় যে দশ ডলার সেবা করলাম তার জন্যে মাত্র এক ডলার স্বীকৃতি?"

মকবুল বললেন, "দাদা, এ-দেশে পা-ফেলার আগে এই টিপ্‌স সম্বন্ধে যেসব গল্প শুনেছি তাতে গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দু' একজন আমেরিকান ছোকরা টিপ্‌স না দিয়েই ট্যাক্সিতে ম্যানেজ করে। কিন্তু গরীব দেশের লোক আমরা, যা ন্যায্য পাওনা তার থেকেও দু'একটা পয়সা বেশী দেবেন, না হলে মান-ইজ্জত থাকবে না।"

বাসের জনৈক যুবতী ইতিমধ্যে সহযাত্রীদের কাছ থেকে টিপ্‌স সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে, বিদায়ের আগে ড্রাইভারকে সামান্য নগদ প্রীতি উপহার দিয়ে যাওয়া নাকি রেওয়াজ। আমরা ব্যাগ বার করছিলাম, মকবুল নিজেই একটা ডলারের নোট বার করে দিয়ে বললেন, "আমাদের এই তিনজনের গ্রুপের জন্যে।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, মকবুল বললেন, "দু'একটা ডলার বাঁচাতে পারলে দেশে নিয়ে যান—ফরেন এক্সচেঞ্জের জন্যে দেখবেন রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে না, ছেলেদের পড়া হচ্ছে না, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ায় এত খাবার হচ্ছে, অথচ এই ডলার নেই বলে আপনার আমার মা-ভাই-বোন শুকিয়ে রয়েছেন।"

পাকিস্তানী অতিথিদের খোঁজ করতে মার্কিন স্বেচ্ছাসেবক এদিকে এসে আমাদের আড্ডার বহর দেখে অবাক। ছোকরা রসিকতা করে বললো, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি যে, খবরের কাগজ থেকে যা জানা যায় তাতে আপনাদের দুই দেশের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য।"

আমরা তিনজনেই হেসে ফেললাম। মকবুল বললেন, "তাহলেই বুঝতে পারছেন আপনাদের খবরের কাগজে কী রকম সত্যনিষ্ঠ খবর ছাপা হয়!"

বাস থেকে নেমে মকবুল তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীর কাছে

গেলেন। আমি হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু ওঁরা এসে পাকড়াও করলেন। "মিঞার সঙ্গে লাঞ্চের কথা ছিল, কৌশল করে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। এখন চলুন গরীবের বাসায়।"

আমি একটু দ্বিধা করছিলাম, কিন্তু দুজনেই নাছোড়বান্দা। "আমরা দাদা, একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে আছি। আমার তো প্রথমে এখানে এসে না খেয়ে মরার অবস্থা। লোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে, কিন্তু চারদিকে হারামের মাংস। সব গায়ে গায়ে রেখে দিয়েছে। আপনি হিঁদু বাউন, আপনার নিশ্চয় আরও শোচনীয় অবস্থা।"

আমাকে অ্যাপার্টমেন্টে এনে দুজনে যে আতিথেয়তা শুরু করলেন তাতে লজ্জায় মরে যাই। মহম্মদ আলী তাড়াতাড়ি রান্নার যোগাড় আরম্ভ করলে, আর মকবুল ফ্রিজ খুলে তিন গেলাশ ফলের রস বার করলেন। ফলের রস খেয়ে গেলাশ ধুতে যাচ্ছিলাম, মকবুল হাত চেপে ধরে বললেন, "এর থেকে গলায় ছুরি দিন। নিশ্চয় বইতে পড়েছেন, আমেরিকায় অতিথিকে নিজের কাপ-ডিস ধুয়ে দেবার প্রস্তাব করতে হয়। তা দাদা, এই গরীব পাকিস্তানীর ওপর আপনার মার্কিনী কায়দা ফলাচ্ছেন কেন? না হয় কাশ্মীর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের প্রবল ঝগড়াঝাঁটি চলছে।"

মকবুল বললেন, "গরীব দেশের লোক হলে কি হয়, চিরকাল লর্ডের মত মানুষ হয়েছি। আগে মায়ের রান্না খেয়েছি, পরে বিবির রান্না। প্রফেসার হলেও বিবি রান্না ভালই জানে। আমার একটা মেয়ের নাম দিয়েছি অরুন্ধতী। ভাবছেন, মুসলমানের এমন হিঁদু নাম হলো কী করে? হিঁদুরা ইণ্ডিয়াতে আসবার অনেক আগে থেকে অরুন্ধতী নক্ষত্র আকাশে শোভা পাচ্ছে। আমাদের ছেলে হলে নাম দেবো ভাস্কর। আজকাল অনেকে হাফ ইংরিজী নাম রাখছে, শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়।"

মহম্মদ আলীর কাছ থেকে রান্নার দায়িত্ব নিয়ে মকবুল শুরু করলেন, "আমার মা যদি শোনেন তাঁর ছেলে হাত পুড়িয়ে রান্না করে, তাহলে কেঁদে সারা হবেন। কিন্তু কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।"

বললাম, "আমার জন্যে শুধু শুধু কষ্ট করছেন।"

"কি যে বলেন! আমার বিবি থাকলে আপনার জন্যে এতক্ষণ হৈ চৈ লাগিয়ে দিতো। বাংলা বই ওর প্রাণ। হেমন্ত মুখার্জি, দেবব্রত বিশ্বাসের

রবীন্দ্রসঙ্গীত, আর বিমল মিত্তিরের উপন্যাস। খানকয়েক বই ভদ্রলোক যা লিখেছেন, অন্য দেশ হলে মাথায় করে রাখতো।"

রান্নার মধ্যে মধ্যে মকবুল সাহিত্য আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। "পাকিস্তানের ছেলেরা চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও সায়েব-বিবি-গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম লেখবার মতো কব্জির জোর হয়নি। আমার ওয়াইফ বলে, বিমলবাবুর কিছু লেখার মধ্যে বাঙালী জাতের ইতিহাসটা রয়ে গেলো। যদি কোনোদিন দেখা হয় আমার ওয়াইফ ওঁকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে: সেই পলাশীর যুদ্ধ থেকে এই ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলার সব সম্পর্ক ও সংঘাতের কথা লিখলেন তিনি; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটা এড়িয়ে গেলেন কেন?"

আমি বললাম, "ওঁর সঙ্গে দেখা হলে প্রশ্ন করবো। তবে ওই বিষয়ে লেখা পড়বার যোগ্যতা আমরা বোধ হয় এখনও অর্জন করিনি। হয়তো আরও সময় লাগবে; হয়তো মহাকাল যখন ঝাঁট দিয়ে আমাদের যুগের সবাইকে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে ফেলে দেবে, তখনই আমাদের কোনো সহৃদয় প্রপৌত্র প্রপিতামহদের সেই লজ্জাজনক কাহিনীকে কেন্দ্র করে বৃহৎ কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করবে।"

মহম্মদ আলী আমার দিকে একবার ফিরে তাকালো। মকবুল বললেন, "আলী লাজুক মানুষ, ও বেশী কথা বলে না, কিন্তু আপনাদের খুব ভক্ত লোক।"

খাবার সাজিয়ে নিয়ে মকবুল বললেন, "যদি কখনও হঠাৎ কলকাতায় যাই, থিয়েটারের টিকিট কিনিয়ে দেবেন, খুব ভিড় হয় নিশ্চয়!"

"কোথায় ভিড়? বাংলার নিজস্ব সব জিনিষগুলোর ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। মিষ্টির দোকানে মিষ্টি নেই, চিঁড়ে মুড়ির দোকানে মাছিরাও সময় নষ্ট করে না, কলেজ স্ট্রীটে বাংলা বই-এর দোকানে বিক্রি হু-হু করে কমছে, বাংলা সিনেমা তৈরির খরচ উঠছে না, বাংলা ফিল্ম স্টুডিওর দশা দেখলে চোখে জল আসে, নটে-পটো বাঙালী থিয়েটার করে, কিন্তু দর্শকদের কাছ থেকে চাল কেনার টাকাও ওঠে না।"

আমার কথা শুনে বিমর্ষভাবে বসে থাকেন মকবুল। "ইণ্ডিয়ার রেস-এ বাংলা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে, তাই না?"

মহম্মদ আলী বললে, "বাংলার 'বাং' পড়েছে পাকিস্তানে, শুধু 'লা' দিয়ে ওঁরা কত দূর কী করবেন ?"

মকবুল বললেন, "আপনি আমাকে প্রাদেশিক ভাববেন না। কিন্তু ইণ্ডিয়া-পাকিস্তানের লোকরা অন্য যত বিষয়ে ঝগড়া করুক, বাঙালীরা যে গোলমেলে জাত, সে বিষয়ে সবাই একমত। এর কারণ কী?"

মহম্মদ আলী বলে বসলো "বাঙালীর যে ব্রেন আছে।"

"ওসব আর সত্যি নয়," সঙ্গীকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন মকবুল। "পলাশীর যুদ্ধটা বাংলা দেশে হয়েছিল বলে বাংলা প্রথম পশ্চিমের আলো পেয়েছিল। সে তো কবেকার কথা—তারপর পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে—বাঙালী সর্বস্ব হারিয়ে নিজের ভাই-এর গলায় ছুরি লাগিয়েছে। হিঁদু বাঙালী পোঁটলা নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে হাজির হয়েছে, মুসলমান বাঙালী ঢাকার রেফ্যুজি ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছে। এখনও হিসেব নিয়ে মারামারি হচ্ছে: আমরা ভাল লোক, তোমাদের তেষট্টি জনের বদলে আমরা মাত্র তেতাল্লিশ জনকে মেরেছি।"

কলকাতা সম্বন্ধে এতো উদ্বেগ আর কোথাও দেখিনি। কলকাতা যে পিছিয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে, বিনাচিকিৎসায় অকালমৃত্যুর প্রবল সম্ভাবনা যে তার সর্বাঙ্গে দেখা দিচ্ছে, এতে কারুর কোনো চিন্তা নেই। কলকাতা যেন বাঙালীদেরই শহর, এই শহরের দোকান-পাট ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়টুকু যেন বাঙালীরাই উপভোগ করছে; এই শহরের বড় বড় বাড়িগুলোর মালিকানা যেন বাঙালীদের; পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর বড় বড় হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, ক্লাবে জীবনের সব আনন্দ যেন বাঙালীরাই উপভোগ করছে; শহরে যত মোটর গাড়ি আছে তা সব যেন বাঙালীরাই চড়ে বেড়াচ্ছে; কলকাতার কোটি কোটি টাকা ব্যাংকের ম্যানেজাররা যেন বাঙালীদের নামে লেজার লিখে রেখেছেন। কিন্তু এই শহরের সব বদনামের দায়িত্ব কেবল তাদেরই, আর কারুর নয়।

কয়েক শ বছর ধরে দুনিয়ার দুরন্ত লোকরা টাকা কামিয়ে বড়লোক হবার নেশায় কলকাতায় এসেছে। পৃথিবীতে যত রকম ব্যবসায়িক কেলেঙ্কারি আছে তার কালিমা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতার মুখে; আর কলহপ্রিয় অলস বাক্‌সর্বস্ব আত্মঘাতী অভিমানী বাঙালী

রাজনৈতিক প্রগতির নামে ট্রাম জ্বালিয়ে, রাস্তা বন্ধ করে, কারখানায় তালা লাগিয়ে, বক্তৃতা করে, পোস্টার মেরে বেচারা কলকাতাকে সোনার সিংহাসন থেকে পথের ধুলোয় নামিয়ে আনছে। 'মৃত্তিকার সন্তানদের' সংগঠনী প্রতিভার নিদর্শন কলকাতা কর্পোরেশন ও রাষ্ট্রীয় পরিবহণ; জ্ঞানতপস্যা ও মনীষার স্তম্ভ আজকের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; পরিচ্ছন্নতা ও রুচিবোধের প্রমাণ শ্যামবাজার অঞ্চলের পথঘাট এবং শিয়ালদহের মূত্রাগার; এবং সৌজন্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বাস কণ্ডাক্টর ও ড্রাইভার নামক হতভাগ্য জীবদের উদ্দেশে এক শ্রেণীর বঙ্গসন্তানদের মধুভাষণ। এই আড়াইশ বছরের ইতিহাসে কলকাতা সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় চিন্তা করবার জন্যে একটি কানাকড়ি কেউ বার করেননি। এ-বিষয়ে যে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন, সেটি যে একটি বিদেশী ফাউণ্ডেশন তা ভাবতে কলকাতার নুন-খাওয়া বড়লোকদের, কলকাতায় চাকরি-করা প্রত্যেকটি মধ্যবিত্তের এবং প্রত্যেকটি ম্যাট্রিক পাশ করা বাঙালীর এবং আমাদের সকলের লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ সব কী অবান্তর প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি? স্বদেশ থেকে বহুদূরে বিদেশী হোটেলের ঘরে বসে বসে এরকম অনেক চিন্তার কথা বহু ভূতপূর্ব কলকাতাবাসীদের কাছে শুনেছি, মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মকবুল আমাকে আশার বাণী শোনালেন: "দেখবেন দাদা, আমাদের চিরকাল এই অবস্থা থাকবে না। পূর্বপাকিস্তানের কথাই ধরুন না। আমাদের তো তেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে মন ছিল না। এখন অনেক বাঙালী ব্যবসায় নামছে, কলকারখানা খুলছে এবং আপনাদের আশীর্বাদে তারা খুব খারাপ করছে না। বাংলা গান, বাংলা গল্প, বাংলা কবিতার মধ্য দিয়ে আপনারা জাতটাকে জাগিয়ে তুলুন, দেখবেন মরা নদীতে আবার জোয়ার আসবে।"

মকবুল আমেদের সঙ্গে এইভাবেই শেষ কথা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পরে মকবুল আমাকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমি একলাই চলে যেতে পারবো। কিন্তু মকবুল কথা শোনেননি। ওয়াশিংটনে আর একজন পাকিস্তানী আমার বিপত্তারণের

ভূমিকা নিয়েছিলেন। নারীঘটিত ব্যাপার থেকে তিনি কী ভাবে আমাকে রক্ষা করেছিলেন, তা অন্যত্র বলবো।

ওয়াশিংটনে আরও কয়েকজন পূর্বপাকিস্তানী বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাঁরা শুধু গল্প করেননি, প্রাণভরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত শুনিয়েছেন এবং হাল আমলে পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের খবরাখবর দিয়েছেন।

মার্কিন দেশে যেসব গ্রন্থাগারে বাংলা বই রাখা হয় এবং যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাচর্চা করা হয়, তার দু-এক জায়গায় গিয়েছি এবং আলোচনা করে একটা ভুল ভেঙে গিয়েছে। কলকাতায় বসে থেকে যখন শুনতাম, বিদেশের অমুক অমুক জায়গায় বাংলাচর্চা হচ্ছে তখন গর্বের সঙ্গে ভাবতাম, দেখো আমাদের সাহিত্যকে আমরা কতখানি সমৃদ্ধ করেছি, বিদেশের লোকরা এখন বাংলা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু বাইরে গিয়ে বুঝলাম, বাংলার এই আন্তর্জাতিক মর্যাদার পিছনে পাকিস্তানীদের দান অনেক বেশী। বিদেশে বাংলা চর্চার অন্যতম কারণ বাংলা একটি স্বাধীন দেশের সরকারী ভাষা।

এই সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। ঈশ্বর জানেন, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার বিদেশে আমার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, নিজের সাধ্যমতো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা পরিচিত মহলে দূর করবার চেষ্টা করেছি। ভারতবর্ষ বাঁচলে যে আমরা সবাই বাঁচবো, এ কথা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি। কিন্তু আমার মাতৃভাষার সমৃদ্ধিও আমাকে আনন্দ দেয়। কোনো একটি ঘরোয়া বৈঠকে জনৈক মার্কিন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আর একজন ভারতীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন ভদ্রলোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর রাখেন না। আমি লেখক শুনে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ইংরিজীতে বই লিখি কি না। ওঁর ধারণা শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরিজীতেই লেখালেখি করেন। বললাম, না, আমি ইংরিজীতে লিখি না। "ও, তুমি তাহলে হিন্দীতে লেখো?" তিনি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি বাংলাভাষায় লিখি। বাংলা জিনিসটা কি জানতে চাইলেন বললাম, এটি ভারতবর্ষের অনেকগুলি সংবিধান-স্বীকৃত ভাষার মধ্যে একটি এবং এটি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

আমার ভারতীয় সঙ্গীটি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে

বলে ফেললেন, "পাকিস্তানের নয়, পূর্বপাকিস্তানের বাঙালীদের ভাষা।" কাছাকাছি একজন পূর্বপাকিস্তানী তরুণ বসেছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "মহাশয়, বাংলা শুধু পূর্বপাকিস্তানের ভাষা নয়, ইসলামাবাদেও বাংলা সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন। পাকিস্তানে সরকার স্বীকৃত দুটি ভাষার একটি হলো বাংলা।"

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। দেখলাম, বাংলা সাহিত্যের অনেক খবরাখবর রাখেন। বললেন, "আমেরিকার বাঙালীরা একদিকে ভাগ্যবান। স্থানীয় লাইব্রেরিতে দুই বাঙলা থেকেই বই আসে, যে-সুযোগ ঢাকা বা কলকাতার লোকরা একেবারেই পান না। বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে আপনাদের আমেরিকায় আসতে হবে বুঝলেন স্যার।"

ব্যাপারটা মোটেই মিথ্যে নয়। লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলাম, পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ফসল থাকে থাকে সাজানো রয়েছে। অথচ এমন যে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সেখানে পাকিস্তানের বাংলা বই ক'খানা আছে? বুঝলাম, পঁয়ষট্টি সালের গণ্ডগোলের পর পাকিস্তানের বই সংগ্রহ শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার আগেকার সমস্ত বই কি তাঁদের আছে? ধরে নিচ্ছি, সরকারী প্রতিষ্ঠানের নানা অসুবিধা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় কি এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই যাঁরা প্রয়োজন হলে লণ্ডন বা নিউইয়র্কের কোনো পুস্তক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানে প্রকাশিত সব বাংলা বই একখানা করে কিনে আনেন? ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের তালিকাটা দেখলেই তো অর্ধেক কাজ হয়ে যেতে পারে।

এই পাকিস্তানী বন্ধু প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের অনেক বই যুদ্ধের আগে পাকিস্তানে প্রকাশিত হতো! শুনেছি আপনারা তার জন্যে কিছুই পান না।"

বললাম, "আমরা বহু ঠকেছি, আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু শুনেছি, পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছে নয় ইণ্ডিয়ার বই ওখানে চলুক, সেই জন্যে তাঁরা দরিদ্র বাঙালী লেখকের সামান্য প্রাপ্যটুকু পাঠাবার অনুমতি কোনোদিন দেননি, যদিও বিলেত আমেরিকার লেখকদের সম্পর্কে তাঁরা

দরাজহস্ত। তবে একটা কথা সোজাসুজি বলতে চাই। পাঠকের পড়া এবং আমাদের কিছু প্রাপ্তি একসঙ্গে হলে খুব ভাল, কিন্তু আমরা টাকা পাবো না বলে পাঠকের পড়া বন্ধ হলে সেটা খুব দুঃখের কারণ হবে। আমাদের আনন্দ, কিছু লোক বাংলা বই পড়ছে তো। পাঠক তো লেখকদের ঠকাতে চায় না, ঠকাচ্ছে অন্য কেউ।"

দুই বাংলার সাহিত্যের সমগ্ররূপ সম্বন্ধে আরও জানা গেল শিকাগো শহরে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাণস্বরূপ ডাক্তার এডওয়ার্ড ডিমক সাধু প্রকৃতির লোক। এরকম নিরহঙ্কারী, বিনয়ী এবং প্রকৃত বৈষ্ণব বিরল। বাংলাচর্চায় তিনি ও তাঁর বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের উৎসাহ না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এঁদের একজন ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত কবি ও সাংবাদিক শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত। জ্যোতির্ময় আমার সঙ্গে এক মার্কিন যুবকের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন—নাম ক্লিন্ট সীলি! সাহিত্যরসিক প্রতিভাবান তরুণ মার্কিন ছাত্রদের গবেষণার বিষয়ের অভাব নেই। কিন্তু ক্লিন্ট কাজ করছেন তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের ওপর। পিস কোরের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের এক ইস্কুলে ক্লিন্ট বছরখানেক মাস্টারি করে এসেছেন, আর বরিশালের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন বরিশালের ছেলে জীবনানন্দ দাশ রূপসী বাংলার যে ছবি এঁকেছেন তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে। ক্লিন্টের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় পূর্ব বাংলায় যারা যায়নি তারা পুরোপুরিভাবে জীবনানন্দকে বুঝতে পারবে না। আবার জীবনের একটা বড় অংশ জীবনানন্দ কলকাতার আশে-পাশে কাটিয়েছেন। তাই ক্লিন্ট কলকাতায় আসবার পরিকল্পনা করছেন। ধানসিড়ি নদীর তীরে একদা আরেকটি নদীর জন্ম হয়েছিল, বহু পথ অতিক্রম করে সে এসে হারিয়ে গেল কলকাতায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ফুটপাথের হাইড্রান্টে—যেখানে 'কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল'। ক্লিন্ট যা পারবেন, ঢাকা বা কলকাতার কোনো ছেলে তা পারবে না, কারণ তারা যে যার নিজের কোটে দাঁড়িয়ে আছে, বেরোবার উপায় নেই।

শিকাগোর আগে নিউইয়র্কে বেশ কয়েকজন পূর্বপাকিস্তানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ভাবে ও কাজে তাঁরা আমাদের থেকে অনেক বেশী বাঙালী এবং নিউইয়র্কের মতো জায়গাতেও তাঁরা একটুও বাঙালী ভাব ত্যাগ

করেননি। অথচ বাঙালীর নিজস্ব অনুষ্ঠান বিজয়া দশমীতে এঁদের আসতে দেওয়া ঠিক হবে কিনা এ নিয়ে দু-একজন সরকারী কর্মচারীকে অন্য একটি প্রখ্যাত শহরে গোপনে দল পাকাতে দেখেছি।

নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন কলকাতার ছেলে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করছেন। তিনি এনথ্রপলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মণি নাগ। হঠাৎ ভেসে-আসা দেশের লোকদের জন্যে মণিবাবু এবং তাঁর স্ত্রী কল্পনা সব সময় তাঁদের বাড়ির দরজা খুলে রেখেছেন। মণিবাবুর ওখানেই একদিন খ্যাতনামা লেখক চাণক্য সেন-এর দেখা পাওয়া গেলো। চাণক্য সেন শুধু গল্প-উপন্যাস লেখেন না, তিনি নামকরা সাংবাদিক এবং চীন-বিশেষজ্ঞ। চীন এবং পাকিস্তান সম্পর্কে কি একটা ভজখট ব্যাপারে তিনি জটিল গবেষণা চালাচ্ছেন কলম্বিয়া স্কুল অফ ইনটারন্যাশনাল ষ্টাডিজে। চাণক্য সেন ছদ্মনামের আড়ালে যে ভবানী সেনগুপ্ত লুকিয়ে আছেন, তিনি একদিন তাঁর অফিসঘরে এক তরুণ পাকিস্তানী লেখকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন—নাম জিয়া হায়দার।

জিয়া হায়দার পূর্বপাকিস্তানের বাংলা আকাদমীর সঙ্গে সংযুক্ত এবং এক স্কলারশিপে নাটক ও অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্যে ওদেশে গিয়েছেন। ভবানীবাবু বললেন, "জিয়াকেই আমার লোকাল গার্জেন বলতে পারো। আমি যখন কিছুদিন আগে নতুন এলাম তখন হারিয়ে যাবার অবস্থা। কিন্তু জিয়ার সঙ্গে কয়েকটা দিন একঘরে রাত্রি কাটিয়েছি এবং একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ সমব্যবসায়ী লেখকের যা প্রাপ্য তার দশগুণ বেশী আদর যত্ন উপভোগ করেছি।"

জিয়া হাসতে হাসতে বললেন, "দাদার 'বাস্তব-ভিত্তিক' উপন্যাসে কী পরিমাণ গাঁজা থাকে এবার আন্দাজ করতে পারছি। আসলে আমার হোস্টেলের ঘরে একটা সীট সাময়িকভাবে খালি ছিল, সেখানেই দাদাকে কয়েকদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম। আর ওস্তাদের তামাকটা-পানটা এগিয়ে না দিলে কোন সাকরেদ ভাল কাজ শিখতে পারবে?"

জিয়া বললো, "যখন পড়াশোনা আর ইংরেজি ভাষার চাপে মেজাজটা চেপ্টে যায় তখন আড্ডার রোদে মনের বালিশটা একটু ফুলিয়ে নিতে দাদার কাছে চলে আসি।"

"আমাদের বেশ ভালই জমে", ভবানীবাবু জানান।

জিয়া হাসতে হাসতে বললো, "আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন 'সমীক্ষা' আর 'পরিক্রমার' নামে পাকিস্তানের উদ্দেশে যত বিষ দাদা এককালে উদ্গার করেছেন এখন সেগুলো একলা আমাকে সহ্য করতে হয়!"

"বেশী ফাজলামি কোরো না, তোমার ইণ্ডিয়াবিরোধী বক্তৃতা শুনে শুনে আমার 'ব্রেন ওয়াশিং' প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে! বাইরে বোকা-সোকা, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং আন্তর্জাতিক অথচ ভিতরে হিপক্রিট, কম্যুনাল, ইমপিরিয়ালিস্ট এবং সেলফিস ইণ্ডিয়া অন্যায়ভাবে কাশ্মীর দখল করে বসে আছে—এটা মাথায় বেশ ভালভাবে ঢুকছে!"

এবার আমরা সবাই হা-হা করে হেসে উঠলাম। জিয়া বললো, "বৃষ্টিতে ভিজে মেজাজ স্যাঁৎসেতে হয়ে গিয়েছে, এখন কফি খাওয়াবেন চলুন।"

কফির পরও আড্ডা হলো। তারপর ভবানীবাবু এক মিটিঙে চলে গেলেন, আর জিয়া আমাকে নিয়ে যেতে চাইলো তার হোস্টেলে। বাইরে সেদিন বৃষ্টি নেমেছে, নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী আকাশেও সেদিন উদাসী মেঘের সমারোহ। নিজের রেনকোটটা খুলে আমার গায়ে চড়িয়ে দিলো জিয়া। বললে, "আমরা এখানে কিছুদিন আছি, অনেকটা সহ্য হয়ে গিয়েছে—আপনি নতুন লোক, অসুখ বাধিয়ে বসবেন না।"

হোস্টেলের ঘরে জিয়া আবার কফি তৈরি করলো, খাবার বার করলো আর শুরু করলো বাংলা কবিতার কথা। ছেলেটির বড় কাব্যিক মন। বললো, "কাল রাত্রেও বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ দেশের কথা মনে হতে লাগলো। বাবার শরীর খুব খারাপ, আমি বড় ছেলে, মা-ভাই-বোনেরা হয়তো আমার মুখ চেয়ে বসে আসে। গ্রামের পথ, বাজার, নদীর ধার, আমাদের সেই ছোট বাড়িটা—সব মনের মধ্যে এসে হাজির হলো। যখনই এমন হয়, তখনই কাগজকলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসি। আর কবিতা লিখলে একটা শ্রোতা চাই, তাই ভবানীদাকে বিরক্ত করি। ওঁর অসীম ধৈর্য, খুব মন দিয়ে শোনেন, উৎসাহ দেন, আবার সমালোচনাও করেন।"

জিয়ার নতুন লেখা কবিতাটা প্রথম শোনার সৌভাগ্য আমারই হলো। শ্যামলী বাংলা থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরের ইস্পাত কঠিন শহরে এক প্রবাসী যুবকের ঘরে ফেরার কামনা। কতদিন হলো সে দেশ ছেড়েছে,

গ্রামের কত না পরিবর্তন হয়েছে, বাবা হয়তো আরও বৃদ্ধ হয়েছেন, মার চুলে হয়তো পাক ধরেছে, আদরের ছোট বোনটা কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে প্রবেশ করেছে। শাড়িপরা মেয়েটার মধ্যে সেই ফ্রকপরা বোনটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি, যে আসবার সময় বলেছিল, 'দাদা তুমি একটা মেম বিয়ে করে এনো।' কবিতাটি অত্যন্ত আন্তরিক। কবির কল্পনায় জিয়া দেখছে তার ঘরে ফেরার দিন এসে গিয়েছে, সে এইমাত্র তার দেশের বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে এসেছে।

পড়তে পড়তে জিয়ার চোখদুটো সজল হয়ে উঠলো। তারপর লজ্জা পেয়ে বললো, "নিজের মনের ভাবটা আপনার ওপর অন্যায়ভাবে চাপালাম।"

জিয়া সেদিন আমাকে আমার আশ্রয়স্থল মণিবাবুর বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জিয়া বলেছিল, "আমার কি ইচ্ছে হয় জানেন? সমস্ত বাঙালী জাতটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোনো ডাক্তারের চেম্বারে হাজির করি। এই তো এতোদিন বিদেশে আছি, কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু ভবানীদার সঙ্গে (এমন কি সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার সঙ্গেও) কেমন ভাব হয়ে গেলো। অথচ আইনত আপনাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, আমরা সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে এই সাতষট্টি সন পর্যন্ত বহুবার খুনোখুনি করেছি। মাথার ডাক্তাররা একমাত্র এর কারণ বলতে পারে, এর জন্যে চিকিৎসা দরকার।"

জিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, "হাওয়াই দ্বীপে যাচ্ছেন নাকি? ওখানে অনিমেষ রায় বলে এক পাকিস্থানী ছোকরা ইস্ট-ওয়েস্ট সেণ্টারে পড়ে। ওর সঙ্গে আলাপ করবেন।"

সারা মার্কিন দেশ ঘুরে ঘুরে অবশেষে হাওয়াই দ্বীপে এসে অনিমেষ রায়ের খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। তার বদলে আলাপ হয়েছিল ঢাকার ছেলে বেনেডিকট গোমেজের সঙ্গে। প্রাণ-রসায়নের কৃতি ছাত্র বেনেডিকট এবং তাঁর স্ত্রী স্থানীয় সমস্ত বাঙালীদের গার্জেন। বেনেডিকট আমাকে একদিন তার বাড়ীতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেদিন বিকেলেই ইস্ট-ওয়েস্ট সেণ্টারের জনৈক অধ্যাপকের

সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলেন, সন্ধ্যাবেলায় কী করছি। বললাম, এক পাকিস্তানী ভদ্রলোক মাছের ঝোল-ভাত খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। ভেবেছিলাম, এই অস্বাভাবিক ইন্দো-পাকিস্তান পীরিতের সংবাদে তিনি একটু অবাক হবেন।

কিন্তু বিস্ময়ের কোনো লক্ষণই তার মধ্যে দেখা গেলো না। তিনি বললেন, "পৃথিবীর বহু দেশের ছেলেরা এখানে আসে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক গোলমালকে তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেনে আনে না। এখানে আমরা একটা আদর্শ-পরিবার স্থাপনের স্বপ্ন দেখি।" তিনি বললেন, "আপনি তো শুধু নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন। তবে শুনুন একটা গল্প।"

"অনেক ইস্কুল-কলেজ থেকে আমার কাছে অনুরোধ আসে, বিদেশের ছাত্র পাঠাতে, তাদের দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে। এক কলেজের কাছ থেকে চিঠি এলো ইন্দো-পাকিস্তান সমস্যা, বিশেষ করে কাশ্মীর সম্পর্কে বলবার জন্যে দু'দেশ থেকে দুজন ঝানু বক্তাকে পাঠানো হোক। দুজন ছাত্রকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন।"

তর্কের দিনে বেশ বিপদ। দেখা গেল, ভারতীয় ছাত্রটিই শুধু সেই কলেজে হাজির হয়েছে। সে তীব্র ভাষায় আধঘণ্টা ধরে পাকিস্তানকে ছিন্নভিন্ন করে ভারতের বক্তব্য পেশ করলো। হাততালি পড়লো। তারপর একটু থেমে, একগ্লাস জল খেয়ে সে আবার উঠে দাঁড়ালো। "ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, আমার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশ করবার কথা ছিল ঢাকার মিস্টার অমুকের। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং গতকাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমি হাসপাতালে দেখা করে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছি। পাকিস্তানের বক্তব্য তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং কয়েকটি পয়েন্ট লিখে দিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আপনাদের সামনে এবার আমি পাকিস্থানের বক্তব্য পেশ করছি।" আধঘণ্টা ধরে আবার আগুনের মতো বক্তৃতা দিয়েছিল সেই যুবক।

বেনেডিকট গোমেজ নাম থেকে মানুষটাকে যেমন কল্পনা করেছিলাম, তার সঙ্গে আসল লোকটার মিল হলো না। শুধু দেখতে নয়, হাবে-ভাবে, কথা-বার্তায়, চিন্তায় সম্পূর্ণ বাঙালী কোনো চরিত্রকে যদি কোনোদিন কোনো উপন্যাসে আঁকতে হয় তাহলে আমি বেনেডিকট

গোমেজকে আর-একবার স্মরণ করে কলম নিয়ে বসবো। বলা বাহুল্য বেনেডিকট ক্রীশ্চান। হিন্দু বাঙালী ও মুসলমান বাঙালীর ভুল বোঝাবুঝি অনেক কমেছে ; কিন্তু বহু যুগ ধরে সঞ্চিত আবর্জনার যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার চাঁচর উৎসবে পৌরোহিত্য করতে ডাকবো ক্রীশ্চান বাঙালীকে।

বেনেডিকটের সেই এক কথা, ভায়ে-ভায়ের ঝগড়া আমরা কোর্ট ঘরে এনেছি ; উকিলের পয়সা গুনছি। অথচ অর্থাভাবে মায়ের যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা হচ্ছে না। ঘরের দেওয়ালে বেনেডিকট বাংলার মাদুরে তৈরি গ্রামের ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন। লেখাপড়া প্রায় শেষ, শিগগির দেশে ফিরবেন, এবং দেশের ছাত্রদের প্রাণ রসায়ন সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলবেন।

বেনেডিকট রেকর্ডে নজরুলের গান শোনালেন। বললেন, "স্বার্থপরতাই বলুন, সঙ্কীর্ণতাই বলুন—বাঙালীর একটা নিজস্ব কালচার আছে। সেটা অন্যের থেকে উৎকৃষ্ট বলছি না, কিন্তু কিছুটা স্বতন্ত্র। তাকে সম্পূর্ণ পদ্মায় বিসর্জন দিয়ে অন্য কালচার গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে বেশ কঠিন হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, অন্যের কালচারের প্রতি, অন্যের ভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই। আমরা আমাদের ভাষাকে ভালবাসি, কিন্তু অন্য ভাষাকে 'হঠাও' বলি না, অন্য ভাষার গায়ে আলকাতরাও লেপে দিতে পারি না।"

বেনেডিকট বললেন, "অথচ দেখুন বাংলা সাহিত্যের যা সেরা তা পৃথিবীকে আমরা উপহার দিতে পারছি না। দুনিয়ার যদু-মধু লেখকদের কবিতার বই ইংরিজীতে অনূদিত হয়ে বিদেশের দোকানে শোভা পাচ্ছে—আর আমরা রবীন্দ্রনাথকেও প্রচার করতে পারলাম না। কত বাঘা-বাঘা সাহিত্যের অধ্যাপকদের সঙ্গে এদেশে দেখা হয়। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নামও শোনেননি। অকৃতজ্ঞ আমরা মাথা ঘামাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তাঁর পাসপোর্টের রং কী হতো! আমরা ভুলে যাই, পৃথিবীর সব ভাল জিনিসে সব মানুষের সমান অধিকার।"

বেনেডিকট বললেন, "বাংলার সাহিত্য, বাংলার গান কখনও নীচতাকে প্রশ্রয় দেয়নি, গৃহবাসীকে বাংলার কবি সর্বদা দ্বার খুলতেই বলেছে, বন্ধ করতে নয়। ছেলেমানুষী হয়তো, কিন্তু আমার কি ইচ্ছে হয়

জানেন? দুনিয়ার লোককে ডেকে বলি—আমরা একেবারে ভিখিরী নই, আমাদেরও কিছু দেবার আছে। কিন্তু পারি কই?"

সেদিন আরও কয়েকজন পাকিস্তানী ও ভারতীয় যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে বিচক্ষণ, সংযতভাষী বেনেডিকট আমাদের সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। বেনেডিকট বলেছিলেন, "অনেকে মনে করেন, দেশবিভাগই আমাদের কাল হলো। দেশবিভাগটা দুঃখের কারণ, কিন্তু তার জন্যে সব কিছু গোল্লায় ঠেলে দেবার প্রয়োজন নেই। হাঁড়ি আলাদা হয়েছে বলে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে কেন? পূবের বাগান এবং পশ্চিমের বাগানে সাহিত্যের নতুন ফল ফলুক, হাটে গিয়ে আমরা দু'রকম ফলই মায়ের জন্যে নিয়ে আসবো।"

কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রাত্রি যে বেশ এগিয়ে গিয়েছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে নজর পড়তেই বললাম, "কাল না আপনার পরীক্ষা?"

আমরা এবার উঠে পড়লাম। বেনেডিকট বললেন, "বাংলার লেখকদের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। দুই বাংলার অগণিত মানুষের মনে আজও আপনাদের অবাধ গতিবিধি। আপনারা মানুষের মনকে উন্নত করুন, তাদের আশা দিন, তাদের বলুন—জয় হবে, জয় হবে।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। বেনেডিকট আমাদের গাড়ির মধ্যে তুলে দিলেন। গাড়ি স্টার্ট করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ থামতে বলে বেনেডিকট দ্রুত বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন তিনি। হাতে একটা মাদুরের আসন। গাড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বেনেডিকট বললেন, "আপনাকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। দেশ থেকে আসবার সময় মাদুরের এই আসনটা নিয়ে এসেছিলাম—এর উপরে পূর্ববঙ্গের গ্রামের একটা ছবি আঁকা আছে। এইটাই দেওয়াল থেকে খুলে এনে আপনাকে দিলাম। যখন আপনি দেশে ফিরে যাবেন, কলকাতায় নিজের টেবিলে বসে যখন আবার আপনি বাংলায় লিখতে বসবেন তখন এই সামান্য স্মৃতিচিহ্নটুকু যেন সীমান্তের অপর পারে আর-এক রূপসী বাংলার কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদেশের বাঙালীরা এখন হয়তো আপনার বই পড়ে না, কিন্তু একদিন তারা পড়বে। আপনার লেখাও যেন সেই সম্ভাবনার পথকে প্রশস্ত করে দেয়।"

আমাদের গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। প্রায়ান্ধকারে সজল চোখে বেনেডিকট ও তাঁর বন্ধুরা আমার উদ্দেশে হাত নাড়তে লাগলেন। আর নিরুত্তর আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

চ্যাপেল হিল

গ্রে-হাউণ্ড বাস থেকে চ্যাপেল হিল-এর মাটিতে নেমে প্রথমেই যাঁর কথা মনে পড়ে গেলো তাঁর নাম লুইস কার্নাহান।

মাত্র তিন দিন আগে মার্কিন দেশের রাজধানী ওয়াশিংটনে কার্নাহান সাহেবের ঘরে বসে আলাপ হচ্ছিল। তিনি কাউনসিল অন লিডারস অ্যাণ্ড স্পেশালিস্ট-এর প্রোগ্রাম অফিসার। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের নিমন্ত্রণে আমেরিকায় ছ'মাস কাটাবার জন্যে এখানে হাজির হয়েছি। ভার্জিনিয়া অ্যাভিনিউ-এ ওঁদের নিজস্ব দপ্তরে প্রাথমিক অতিথি সৎকারের পর স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি বললেন, "আপনাকে এবার আমরা আঠারো স্ট্রীটের ৮১৮ নম্বর বাড়িতে পৌঁছে দেব। সেখানে মিস্টার লুইস কার্নাহান আমাদের পক্ষ থেকে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।"

লুইস কার্নাহান বিরাট এক লম্বা-চওড়া পঞ্চাশোত্তর আমেরিকান। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপার থেকে লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় করমর্দন করলেন। মার্কিন দেশে আমাকে যথাবিহিত স্বাগত জানালেন, তারপর পররাষ্ট্র বিভাগের যুবতী অফিসারটিকে দেখিয়ে বললেন, "মিস স্লেটার এখন দায়মুক্ত হলেন, এবার আমাদের কাজ শুরু হলো। একটি ব্যাপার ছাড়া, আর সব বিষয়ে আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা আমাদের কাছে নিবেদন করতে হবে। মিঃ কার্নাহান ও মিস স্লেটারের মুখে অর্থপূর্ণ হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

মফঃস্বল ও কলকাতার আইন-আদালতে একসময়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি আমি। চাপাহাসি দেখলেই আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই গম্ভীর ভাবে বললাম, "ভদ্রমহোদয়, যে-ব্যাপারটি সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না তার ওপর কিছু আলোকপাত করুন।"

লুইস কার্নাহান আমাকে আশ্বস্ত করলেন। ওই বিষয়টি হলো আমি এবং এই কাউন্সিল। আমাদের বিরুদ্ধে যদি আপনার কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

সুরসিকা মিস স্লেটার বললেন, 'হরে রাম-এর মত ছুটি শব্দ আগামী ছ'মাস স্মরণ রাখবেন—লুইস কার্নাহান।" হরে রাম শব্দ ছুটি হিপিদের কল্যাণে আমেরিকায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। কোনোদিন না ওয়েবস্টারের অভিধানে জায়গা হয়ে যায়।"

কার্নাহান এবার মিস স্লেটারকে বললেন, "এই প্রশস্তির পর আপনার মনোরঞ্জন না করলে মহাপাতক হতে হবে।" কার্নাহান তাঁর তরুণী সেক্রেটারীর খবর বললেন এবং মিস আইলীন ঘরে ঢুকতেই তিন কাপ কফির অনুরোধ জানালেন।

একটু পরে স্বয়ং মিস আইলীনই যখন হাসিমুখে তিন কাপ কফি এনে আমাদের সামনে রাখলেন তখন বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। স্বদেশে অনেক অফিসে যাতায়াত আছে, কিন্তু বেয়ারা ছাড়া আর কাউকে চা আনতে বলার পরিণাম কী হতে পারে তাই কল্পনা করছিলাম।

অভিজ্ঞ কার্নাহান বোধহয় লোকের মনের কথা সহজেই বুঝতে পারেন। আমার দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এইটাই বোধহয় আপনার প্রথম বিদেশ-ভ্রমণ। তাই আপনাদের দেশের সঙ্গে অনেক পার্থক্য নজরে পড়বে। আমাদের এখানে টাইপিস্ট বালিকাদের অনেক কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো—কর্মকর্তা এবং তাঁর অভ্যাগতদের জন্যে কফি প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ!"

ব্যাপারটা আমার ঔৎসুক্য জাগাচ্ছিল। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ড সময়ের কড়াক্রান্তি হিসেব রেখে চলেন পশ্চিমদেশের লোকরা। সুতরাং কার্নাহানকে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ দিলাম। এবং তিনি কাজের কথা শুরু করলেন—"কাউন্সিল অন লিডারস অ্যাণ্ড স্পেশালিষ্ট-এর সঙ্গে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্পর্কটা কী তা আপনাকে বুঝিয়ে বলা উচিত।"

তিরিশ বছরের অভিজ্ঞ অধ্যাপকের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রথম লেকচারের মত কার্নাহান স্বচ্ছন্দে বলতে শুরু করলেন, "আমাদের নাম কাউন্সিল অন লিডার স্পেশালিস্ট থেকেই বুঝেছেন এটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। নিজেদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন অনেক বিশিষ্ট পুরুষ ও নারী প্রতিবছর মার্কিন দেশ ভ্রমণে আসছেন। তাঁরা কোথায় যাবেন, কার সঙ্গে দেখা করবেন,

কোথায় কতদিন থাকবেন এইসব সময়মত ঠিক করে দেওয়ার কাজে আমরা স্পেশালিস্ট। এই ব্যবসায়ে আমরা লাভের লোভে ভুগি না, রোজগার থেকে খরচ চলে গেলেই আমরা সন্তুষ্ট। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগও তাঁদের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আমাদের হাতে তুলে দেন—কিছু ফি-এর পরিবর্তে আমরা তাঁদের দায়িত্ব লাঘব করি।"

স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসার মিস স্লেটার হাসতে হাসতে বললেন, "কাজটা যতটা সোজা মনে হয়, তার থেকে ঢের শক্ত! এই এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা যাঁদের এখানে পাঠিয়েছি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—আফ্রিকার একটি শহরের মেয়র, ইনি ইংরিজী জানেন না; দক্ষিণ আমেরিকার মহিলাদের ফ্যাশন সংক্রান্ত তিনটি পত্রিকার সম্পাদিকা; একজন গ্রীক ভাস্কর, যিনি ইংরিজী জানেন না বললেই চলে; সাইপ্রাসের উদীয়মান এক নাট্যবিশারদ; ভারতবর্ষের খাদ্যগবেষণা বিভাগের জনৈক বৈজ্ঞানিক, যিনি নিজে মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না; আর একটি এশীয় রাজ্যের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেত্রী, যিনি শুয়োর খান না!"

কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে লুইস কার্নাহান বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, লেখক, খাদ্যগবেষক এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচারবিদের দ্রষ্টব্যস্থল এক হতে পারে না। আমাদের কাজটা তাই দরজির মত—প্রত্যেকটি লোকের আলাদা-আলাদা মাপ নিয়ে, তাঁদের রুচি ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভ্রমণ-সূচী সেলাই করতে হয়। ভাল দরজির দোকানের মত এখানেও ফাইনাল সেলাই-এর আগে ট্রায়ালের ব্যবস্থা আছে।"

কার্নাহান বলেছিলেন, "সাহিত্যিকদের ভ্রমণ-সূচী রচনা করতে ভাল লাগে—কারণ তাঁদের আগ্রহের পরিধি খুব 'চওড়া'। মাতৃজঠরে জীবনের উৎপত্তি থেকে শুরু করে গোরস্থানে জড়দেহের নিষ্পত্তি পর্যন্ত সর্ববিষয়ে কৌতূহলী হবার লাইসেন্স আপনাদের রয়েছে।"

কার্নাহানের সঙ্গে এর পর কয়েকদিন ধরে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কার্নাহানের মতে এই আলোচনা খুবই প্রয়োজনীয়। 'মাত্র দু'মাসের জন্যে এই বিরাট দেশে এসেছেন—সুতরাং আপনার যা-যা দেখার ইচ্ছে তা যেন বাদ না যায়। মনে রাখবেন, ভ্রমণের ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমরা শুধু আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে রয়েছি।

যদি আপনার ইচ্ছে হয় ওয়াশিংটনের পার্কে বসে দু'মাস আপনি কেবল পাতা-ঝরা দেখবেন আমাদের তাতে আপত্তি নেই। আবার যদি ভাবেন ষাট দিনে অন্ততঃ ষাটটা জায়গা চষে বেড়াবেন আমরা তার ব্যবস্থাও করে দেবো।"

আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কার্নাহান অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত আমার মনের ইচ্ছেগুলো নোট-বইতে টুকতে লাগলেন। বললেন, "বড়ো বড়ো লেখকদের সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ করতে চান?"

বললাম, "আপনারা না-চাইলে আমার তেমন ইচ্ছে নেই। লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁদের লেখা বই পড়া; সাহিত্য-সমালোচক ও জীবনীকাররা তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কাঁচামাল যোগাড় করতে পারেন, আমার কাছে সাধারণ মানুষ দেখার সুযোগটা আরও মূল্যবান। পণ্ডিতদের গ্রন্থাগারে বসে পাত্রাধারে তৈল না তৈলাধারে পাত্র বিচার করে ষাট দিন নষ্ট করতে চাই না।"

হেসে উঠলেন কার্নাহান। আমাকে নির্দ্বিধায় মনের ভাব প্রকাশ করতে উৎসাহ দিয়ে তিনি জানালেন, এই চেয়ারে বসে এর থেকে অনেক বেশী অবুঝ অতিথির সৎকার করেছেন তিনি।

কার্নাহান বললেন, "যত ইচ্ছে সময় নিয়ে চিন্তা করুন।" হাতের কাছের টেলিফোন দেখিয়ে বললেন, "বেল-টেলিফোন কোম্পানির কল্যাণে এই মুহূর্তে এখানে বসে বসে ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি যে-কোন মার্কিনীর সঙ্গে কথা বলতে পারি! কুড়ি কোটি লোকের জন্যে এই দেশে দশ কোটি টেলিফোন বসানো হয়েছে।"

আমাদের দেশেও টেলিফোন নামক বস্তু রয়েছে এবং এই যন্ত্রের কেরামতি কতখানি সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে, তাই মনে মনে হাসছিলাম! কিন্তু কার্নাহানের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, "একটা পরীক্ষা করা যাক না। আমেরিকার যে-কোন জায়গায় কেউ আপনার পরিচিত থাকলে তাঁর নম্বর দিন।"

বললাম, "আমার এক কলেজের সহপাঠী বন্ধু আছেন—তাঁর ঠিকানা জানি, কিন্তু ফোন-নম্বর জানি না।"

"ঠিকানাই বলুন, এখুনি ফোন-নম্বর বার করে নিচ্ছি।"

"আমরা বসে রয়েছি ওয়াশিংটনে, কিন্তু তিনি থাকেন সান-ফ্রানসিসকোতে।"

কার্নাহান আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তাতে কী হয়েছে? মাত্র তিন হাজার মাইলের তফাত।"

নামের দিকে তাকিয়ে কার্নাহান বললেন, "ইনি কি সেই বিখ্যাত সেতারবাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

একটা নম্বর ডায়াল করে কার্নাহান নিখিলের ফোন-নম্বর বার করে নিলেন। তারপর আবার ডায়াল করলেন। ফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নিন আপনার বন্ধুর নম্বর—শুধু মনে রাখবেন, আমাদের এখানে সকাল এগারটা হলেও ওখানে সবে ন'টা বাজলো।"

মুহূর্তের মধ্যে তিনহাজার মাইল দূরের কণ্ঠস্বর শুনে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। তবে কপাল খারাপ, নিখিলকে পাওয়া গেলো না। অনেকগুলো প্রোগ্রামের দায়িত্ব নিয়ে সে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের বাইরে ঘুরছে।

কার্নাহান বললেন, "মন খারাপ করবেন না। আমেরিকার কোথাও না-কোথাও আপনাদের দুই বন্ধুর প্রোগ্রাম একসঙ্গে পড়ে যাবে, তখন দুজনে জমিয়ে গল্প করতে পারবেন।"

এবার বিরাট একটা ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন লুইস কার্নাহান। একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, "এই আমাদের দেশ—এর সর্বত্র আপনার অবাধ-গতিবিধি। জলপথে, স্থলপথে, অন্তরীক্ষে যে-ভাবে খুশী কোথায় যাবেন বলুন?"

যে-সব নাম ছোটবেলা থেকে বার বার শুনেছি, সেগুলো এবার হুড়হুড় করে বলে যেতে লাগলাম: নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, পিট্সবার্গ, বোস্টন, বাল্টিমোর, শিকাগো, ডেট্রয়েট, মিনিয়াপলিস, ওকলাহামা, ডালাস্, লস্ এঞ্জেলস্, লা ভেগা, সান্‌ফ্রানসিসকো, মিয়ামি, হনলুলু।

কার্নাহান ধৈর্যের সঙ্গে আমার লিস্টি শুনলেন; বললেন, "যতদূর বুঝছি, নাগরিক জীবনেই আপনার আগ্রহ।"

বললাম, "আমার জন্ম শহরে না হলেও আমি শহরে পালিত, শহরে বর্ধিত এবং সব ঠিক মত গেলে শহরে মৃত হব। তাছাড়া আমেরিকা

বলতে শুধু আমি নই, আমার পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের সকলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, শিকাগোর ঐশ্বর্য, লস এঞ্জেলসের হলিউড। সুতরাং বুঝতেই পারছেন…"

কার্নাহান দ্বিরুক্তি করলেন না। শুধু বললেন, "আমার কাছে এই নামগুলো সবচেয়ে প্রিয় নয়। সুন্দর আমেরিকা বলতে আমার চোখে অন্য অনেকগুলো জায়গার ছবি ভেসে ওঠে।"

প্রোগ্রাম নিয়ে কার্নাহানের সঙ্গে আমার অনেক দরাদরি হয়েছিল। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, বড়ো বড়ো শহরেই আমি চৌদ্দ আনা সময় ব্যয় করতে চাই ; দরাদরিতে ইণ্ডিয়া যে পৃথিবীর সব দেশের ওপর, একথা এক বিরক্ত জাপানী ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলাম। সুযোগ বুঝে কার্নাহানকে তা জানিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর নার্ভ দুর্বল হয়ে পড়ে।

অগত্যা আমার ইচ্ছে অনুযায়ী প্রোগ্রাম তৈরি হলো। আসার সময় আটলান্টিক পেরিয়ে নিউ ইয়র্কে মার্কিন মাটি স্পর্শ করেছিলাম। সেখানে কোনো সময় নষ্ট না-করে পরের প্লেনে ওয়াশিংটনে হাজির হয়েছিলাম। আবার নিউ ইয়র্কে ফিরবো। সেখান থেকেই শুরু হবে আমার দেশ-দর্শন এবং আস্তে আস্তে ভাসতে ভাসতে পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে চলে যাবো যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জলরাশি সানফ্রানসিসকোর তীরভূমির ওপর বারংবার আছড়ে পড়ে অনন্তকাল ধরে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করছে। সানফ্রানসিসকো থেকে আরও উত্তরে সীয়াটল—যেখানে বোয়িং কোম্পানির বিমান তৈরি হয়। তারপর হাওয়াই। সেখানেই মার্কিন দেশ-ভ্রমণের সমাপ্তি।

কার্নাহান এবার বললেন, "নিউ ইয়র্কে যাচ্ছেন যান, তবে আমার অনুরোধ যাবার পথে ছোট একটা জায়গায় দু-একদিনের জন্যে থামুন।" হাসতে হাসতে কার্নাহান বলেছিলেন, "আমাকে বিশ্বাস করুন, ঠকতে হবে না। চ্যাপেল হিল আপনার যাবার পথেই পড়বে।"

অগত্যা রাজী হয়েছিলাম এবং একদিন বিকেলে ওয়াশিংটনের গ্রে-হাউণ্ড বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে চ্যাপেল হিল-এর বাসে চড়ে বসেছিলাম।

॥ ২ ॥

গ্রে-হাউণ্ড কোম্পানির চ্যাপেল হিল-গামী বাস বিকেলে ছাড়ে। বাস-স্ট্যাণ্ডে আমাকে তুলে দিতে এসেছিলেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীধীরেন ঘোষ। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, আর আমাদের এক বন্ধুর (সহজবোধ্য কারণে তিনি নাম প্রকাশে রাজী নন) বন্ধু শ্রীধীরেন ঘোষ সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ওয়াশিংটনে এসেও বঙ্গসেবা ও বন্ধুকৃত্য করছেন। কলকাতার বন্ধুটিও ভরসা পেয়ে দরাজ হাতে স্লিপ কেটে যাচ্ছেন। এঁর জানা-শোনা লোক প্রায়ই ওয়াশিংটনে গিয়ে ধীরেন ঘোষকে ফোন করেন।

ধীরেনবাবুর উৎসাহে এবং শ্রীমতী ঘোষের প্রশ্রয়ে ওয়াশিংটন ডি-সির ঘোষনিবাস একটি বেঙ্গলী ট্রানজিট ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া আদর-আপ্যায়ন ছাড়াও একটি শোফার চালিত ফোকসওয়াগন পাওয়া যায়। শোফার স্বয়ং ধীরেন ঘোষ, যিনি শুধু এয়ারপোর্ট বা হোটেল থেকে আপনাকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন তা নয়, আবার রাত্রে (সে যদি রাত তিনটেও হয়) স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। তবে অতিথি রাত্রে থেকে গেলে উভয়ে আরও খুশী হন—কারণ মার্কিন দেশের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পরও গাঁওকা আদমির সঙ্গে গল্প-গুজবে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে এঁরা রীতিমত পটু।

ধীরেন ঘোষ তাঁর যথাবিহিত সেবাযত্ন পর্বের শেষ অধ্যায়ে আমাকে 'সী অফ' করার জন্যে (ওঁর ভাষায় অতিথিকে 'সমুদ্রে ফেলে দিতে') বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এসেছিলেন। কলকাতার রেজিস্টার্ড নাগরিকের বাস সম্বন্ধে কী ধারণা তা একদা কলকাতাবাসী ধীরেন ভালভাবেই জানেন—তাই বললেন, "এ-বাস সে-বাস নয়।"

"অর্থাৎ ?" আমি প্রশ্ন করি।

"একদিকে এরোপ্লেন অন্যদিকে মোটরগাড়ির সঙ্গে লড়ে বাস কোম্পানিকে বেঁচে থাকতে হয়। রেল কোম্পানি তো অনেক আগেই এদের কাছে হেরে গিয়েছে। মার্কিনী বাসব্যবস্থা নিজের চোখে না দেখলে

লাইব্রেরী, কালিকাবাড়ী

বিশ্বাস হয় না। ইচ্ছে করলে নিউ ইয়র্ক থেকে বাসে কয়েক হাজার মাইল পেরিয়ে সানফ্রানসিসকো বা লস এঞ্জেলস্-এ যাওয়া যায়। নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রানসিসকোর বিমান-দূরত্ব সাড়ে ছ'ঘণ্টা, আর বাস-দূরত্ব ৭৮ ঘণ্টা। বাসে রাত্রে ঘুমোতে পারেন। আর অবিশ্বাস্য এদের সময়জ্ঞান। বাস আসার সময় যদি দেখেন বাস আসেনি, তাহলে বুঝতে হবে আপনার ঘড়ির মেরামতের সময় হয়েছে।"

ধীরেন ঘোষের কথায় নিজের ঘড়ির দিকে তাকালাম। বিরাট বাস-অফিস—আমাদের বড়ো রেলওয়ে স্টেশনের মত।

ধীরেন বললেন, "এই ক'শো মাইল পথ আপনাকে কয়েক ঘণ্টায় নিয়ে যাবে। দেখবেন এখানকার পথ-ঘাট। গাড়ির জন্যে পথ তৈরি হয়েছে এদেশে, গাড়িঘোড়ার জন্যে নয়!"

সময় হয়ে আসছিল। টিকিট দেখিয়ে গাড়ির তলপেটে মালপত্র জমা রেখে সীটে এসে বসলাম। ড্রাইভারের মাথার ওপর দেখলাম একটা প্লেট ঢোকানো রয়েছে। লেখা 'আপনাদের দেখাশোনা করবেন হিউ রবিনসন।" এদেশে এইটাই রীতি—দূরপাল্লার গাড়িতে ড্রাইভারের নাম লেখা থাকে; এবং তিনি একাধারে ড্রাইভার, কনডাক্টর এবং গ্রে-হাউণ্ড কোম্পানির জনসম্পর্ক-অধিকর্তা।

গাড়ি ছাড়বার আগেই যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিটের কাউন্টার-ফয়েল সংগ্রহ করতে লাগলেন হিউ রবিনসন। আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে হিউ জিজ্ঞেস করলেন, "ইণ্ডিয়া?" বললাম, "ঠিক ধরেছেন।" হিউ এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছাড়লেন, "হিন্দী আর পাকিস্তান?" বুঝলাম, ওঁর ধারণা—হিন্দী আর পাকিস্তান এই দু'দেশ নিয়ে ইণ্ডিয়া।

হিউ রবিনসন আমাকে আপ্যায়ন করে ড্রাইভারের ঠিক পিছনের সীটে জানালার ধারে বসতে দিলেন। বললেন "তুমি চিন্তা কোরো না। চ্যাপেল হিল এখনও অনেক দূরে। তোমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হবে। তবে আমি অতদূর যাবো না, আমার ডিউটি তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।"

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো।

সেপ্টেম্বরের শেষে গাছের পাতায় রঙের আগুন লেগেছে—মার্কিনী

নাম 'ফল'। ঝরার আগে গাছের পাতা রং বদলের নেশায় মেতে ওঠে, সে এক অপরূপ দৃশ্য! বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, রাস্তার দু'ধারে ঘন অরণ্য রঙের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। শরৎকালের প্রকৃতি বসন্তের হোলিখেলায় নেমেছে। নয়নাভিরাম রঙের দেশ ভারতবর্ষ—বেশ কয়েকজন বিদেশী যাত্রীর কাছে শুনেছি, এতো 'কলারফুল' সাধারণ মানুষ পৃথিবীতে কম আছে। কিন্তু মার্কিনী অরণ্যে রঙের রায়ট ভারতবর্ষে প্রতিপালিত আমার চোখ দুটোকেও অবাক করে দিলো।

এখানকার ধনীদের মত এখানকার প্রকৃতিও রঙের কোটিপতি! না হলে কেউ এমন বেহিসেবী রঙের খেলায় নামতে পারে? তবে এই খামখেয়ালী বেহিসেবীপনার মধ্যেও এমন সৌন্দর্য রয়েছে যা অরসিকের হৃদয়েও ঝঙ্কার তোলে, দৃষ্টিতে গঁদের আঠা লাগিয়ে দেয়। ফলে, চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

হাওড়া পৌরসভার রেজিস্টার্ড নাগরিক মনকে একটু বকুনি দিলাম—তুমি গরীব দেশের গরীব লেখক, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে তোমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে—তোমার আবার এই প্রকৃতি-প্রেমের বড়মানুষী কেন?

কিন্তু ফল হলো না। পৃথিবীর বিরাট এক প্রেক্ষাগারে বসবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি আমি—প্রকৃতির নিজস্ব রঙিন চলচ্চিত্র অদৃশ্য এক প্রোজেক্টর থেকে আমার চোখের সামনে প্রতিফলিত হচ্ছে।

হিউ রবিনসন স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে মাইকের সামনে গোঙানির মত শব্দ করে কি যেন বললেন। বুঝলাম, সামনের স্টপেজের নাম। যেমন কলকাতায় আমাদের সর্দারজী কনডাক্টর চিৎকার করেন—হর্সন রোড, হর্সন রোড। যেমন বার্মিংহামে সর্দারজী কনডাক্টরের মুখে শুনেছিলাম, 'ফারপিজ, ফারপিজ'। আন্দাজ করেছিলাম, 'ফারপোজ, ফারপোজ!' এখানে তাহলে বাসেও ফারপোর পাঁউরুটি বিক্রি হয়, ভাবছিলাম। তখন সহযাত্রী উদ্ধার করলেন। বললেন—'ভাড়া দাও, ফেয়ার প্লিজ।' দেশে দেশে বাস-ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরদের উচ্চারণ নিয়ে ইউনেসকো যদি কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

এক জায়গায় দেখলাম বাসের গতি কমে আসছে। সামনে রাস্তা জুড়ে বিরাট এক গেট। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী ব্যাপার?" হিউ রবিনসন বললেন, "এখানে রাস্তা-ভাড়া দিতে হবে।"

রাস্তা-ভাড়া! জিনিসটা আমার মাথায় ঢুকছিল না।

হিউ বললেন, "কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান গাঁটের পয়সা খরচ করে এই রাস্তা তৈরি করেছে—এখন ভাড়া আদায় হচ্ছে। এই নতুন রাস্তায় আমাদের সময় বাঁচছে, পেট্রোল সাশ্রয় হচ্ছে, সুতরাং পয়সা দিতে আপত্তি কি?"

হিউ জানতে চাইলেন, "তোমাদের দেশে বুঝি রাস্তার ভাড়া লাগে না?"

বললাম, "দু-এক জায়গায় পুল পেরোবার জন্যে টিকিট কাটতে হয়, কিন্তু রাস্তা তৈরি করে ভাড়া দেবার বুদ্ধিটা এখনও আমাদের দেশে ব্যবসায়ীদের মাথায় ঢোকেনি।"

হিউ বললেন, "মতলবটা এখান থেকে নিয়ে যাও। তোমাদের দেশে ঠিকমত চালু করতে পারলে মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবে।"

প্রায় একঘণ্টা চলার পর বাস থামলো। বোতাম টিপে হিউ রবিনসন বাসের অটোমেটিক দরজা খুলে দিলেন। কিছু যাত্রী নামলেন, দু-একজন মাত্র উঠলেন। বাস এখনও প্রায় খালি বললেই চলে। এক কাপ কফি খেয়ে হিউ নিজের সীটে ফিরে এলেন এবং বোতাম টিপে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর গর্জন করে এয়ার-কণ্ডিশনড্ বাস আবার যাত্রা শুরু করলো। পথে আবার প্রকৃতির রঙের মেলা শুরু হলো। মাইলের পর মাইল শুধু রঙ আর রঙ—এর যেন শেষ নেই।

পরের স্টপেজে ড্রাইভার বদল হলো। নিজের নেম-প্লেটটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিয়ে বাসের ভিতরটা তদারক করে নিয়ে নিজের সীটে গিয়ে বসলেন নতুন ড্রাইভার জর্জ রাদারফোর্ড।

জর্জ রাদারফোর্ডের বয়স হয়েছে। ছোটখাট হাসিখুশী মানুষটি। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? তুমিই তো ইণ্ডিয়া থেকে আসছো—আমার সহকর্মী বলে গেলো তোমার দেখা-শোনা করতে।"

অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "আমাকে তরুণ বলায় পুলকিত বোধ করছি। কিন্তু উত্তর-তিরিশে খোকা সেজে থাকলে তরুণরা বিরক্ত বোধ করতে পারেন।"

"কাম অন! পঞ্চাশ বছর না হওয়া পর্যন্ত সবাই যুবক। ডোন্ট্ ফরগেট, তুমি এখন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায় রয়েছো" জর্জ বেশ আমুদে গলায় এবং মাত্র একটি হুকুমে আমার যৌবন ফিরিয়ে দিলেন।

জর্জ যে ধরনের মানুষ তাতে একটু গল্প-গুজব করা চলবে মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম, "রাদারফোর্ড নামে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববিখ্যাত, তাঁর সঙ্গে তোমাদের কোন আত্মীয়তা আছে নাকি?"

"মোটেই না। আমার ঠাকুর্দা কোন্ কালে বিলেত থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। লেখাপড়ার সঙ্গে তিনপুরুষ আমাদের সম্পর্ক নেই! ঠাকুর্দা ছিলেন রেলরোডে। বাবা ছিলেন রেল ইঞ্জিন ড্রাইভার, আমি হয়েছি বাস ড্রাইভার, ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু নো আমার ছেলে পাইলট। আমার নাতিকে স্কুলমাস্টার করার ইচ্ছে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমার ছেলের নাতি হয়তো কলেজ প্রফেসর হবে। তখন বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ডদের সঙ্গে কোনো একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করা যাবে।" হা হা করে হেসে উঠলেন জর্জ।

বেশ দিল-খোলা লোক জর্জ। আমার একটা ভিজিটিং কার্ড দিলাম ওঁকে। জর্জ প্রশ্ন করলেন, "তোমাকে সবাই কি বলে ডাকে?"

উত্তর পেয়ে বললেন, "তাহলে আমিও তোমাকে শংকর বলে ডাকবো, আর তুমি আমাকে জেরি বলো।"

জানালাম, "মিঃ রাদারফোর্ড, একটু মুশকিল আছে। আমরা আমাদের বাবার বয়সী লোককে নাম ধরে ডাকি না।

বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন রাদারফোর্ড। গাড়ি তখন ৬৫ মাইল বেগে ফ্রিওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। নিপুণ হাত দুটো স্টিয়ারিংয়ে রেখে পথের দিকে তাকাতে তাকাতে ড্রাইভার বললেন, "ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো। আমার এক ভাই যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়াতে ছিল। সে বলেছিল বটে, সিনিয়র লোকেদের ইণ্ডিয়াতে যে সম্মান করা হয়, এমন কোথাও করা হয় না।"

বললাম, "পৃথিবীর অন্য জায়গার খবর জানি না, তবে নানা পরিবর্তনের মধ্যেও আমরা এখনো গুরুজনদের প্রাপ্য সম্মান দেবার চেষ্টা করি। যদিও এই সম্মান দেওয়ার নিয়ম-কানুন আগে আরও জোরালো ছিল।"

জর্জ জানতে চাইলেন, "তোমরা তাহলে বয়োজ্যেষ্ঠদের কী বলে ডাকো?"

বললাম, "সামান্য পরিচয়েই আমরা একটা পারিবারিক সম্পর্ক পাতিয়ে নিই। বয়সে বড়ো হলে দাদা দিদি, না হলে কাকা কাকিমা মাসিমা মেসোমশায় এই রকম যা-হয় একটা বলতে হবে। আমার এক দিদি বৌবাজারে থাকেন। সে-পাড়ার গোটা পঞ্চাশেক ছেলেমেয়ে আমাকে পাইকারী হারে 'শংকরমামা' না হয় 'মামা' বলে ডাকে।"

"কি মিষ্টি বলো তো! আমাদের দেশের ছেলেদের ইণ্ডিয়াতে ম্যানার শিখতে পাঠানো উচিত। আমি তো শুনলাম তুমি আমাদের সরকারের অতিথি হয়ে এদেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে এসেছো! যেখানেই সুযোগ পাবে, ছেলে-ছোকরাদের তোমাদের দেশের এই দিকটার কথা বলো। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করতে এই দেশ একেবারে ভুলে গিয়েছে।...যাই হোক, তুমি বরং আমাকে মিঃ ফোর্ড বলে ডাকো", জানালেন জর্জ রাদারফোর্ড।

রাস্তাটা এক জায়গায় তিন ভাগ হয়ে গিয়েছে, সেখানে একটা বাঁক নিতে নিতে মিঃ ফোর্ড বললেন, "আমার হাতের দিকে কী দেখছো? আটত্রিশ বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছি। প্রথমে চালাতাম ট্রাক। তারপর দেখলাম, আমার স্ত্রীর বেজায় আপত্তি। ট্রাক-ড্রাইভারদের বউদের মনে নাকি শান্তি থাকে না। ইতিমধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলো। ওয়ারেও ট্রাক চালিয়েছি—কত দেশে গিয়েছি—কিন্তু ইণ্ডিয়ায় যাওয়া হয়নি। ফিরে এসেই বাস কোম্পানিতে ঢুকেছি।"

বাঁ-হাতের সোনার ঘড়িটা এবার আমার দিকে এগিয়ে দিলেন মিঃ ফোর্ড। বললেন, "এটা পেয়েছি কোম্পানি থেকে—বিনা দুর্ঘটনায় দশ লক্ষ মাইল নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্যে।"

গর্বিত মিঃ ফোর্ড এবার ঘড়িটা মণিবন্ধ থেকে খুলে ফেলে আমার হাতে দিলেন—পিছনে ওঁর লেখা নাম ও কোম্পানির প্রশংসাপত্রের দিকে

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ঘড়িটা সযত্নে ওঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "আমার সৌভাগ্য যে আপনার মত একজন ড্রাইভারের গাড়িতে চড়তে পেয়েছি।"

মিঃ ফোর্ড বললেন, "কাঠ ছোঁও, কাঠ ছোঁও,। সবই তো ঈশ্বরের ইচ্ছা। কখন তাঁর মনে কী খেয়াল চাপবে কে জানে।"

এবার টাই থেকে একটা পিন খুলে ফেলে আমার হাতে দিলেন মিঃ ফোর্ড। আমস্টার্ডামে কাটা আসল একটা হীরা আছে এই টাই-পিনে —তিন বছর আগে পেয়েছি, কুড়ি বছর নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্যে। বিরাট এই কোম্পানিতে ডজন খানেকের বেশী লোক পাবে না যারা এই হীরের টাই-পিন পেয়েছে।"

আমি মিঃ ফোর্ডকে অভিনন্দন জানালাম। মিঃ ফোর্ড বললেন, "আমার স্ত্রী বলেন, এমন দামী জিনিস, বাড়িতে রেখে যাও। কিন্তু এটা না পরলে আমি ডিউটি করে শান্তি পাই না। তাছাড়া ছেলে-ছোকরাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তারা দেখুক। চেষ্টা করলে, ডিউটিতে আসবার আগে মদ না খেলে, বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে মাথা গরম না করলে, স্টিয়ারিং ধরে অন্য মেয়েমানুষের কথা না ভাবলে এবং সবার ওপরে ভগবানে বিশ্বাস রাখলে তারাও একদিন এই হীরের টাইপিন পরে ঘুরে বেড়াতে পারবে।"

আমরা দু'জনে মনের সুখে গল্প করে যাচ্ছি। বাসে মাত্র আর একজন মহিলা যাত্রী। তিনি পিছন দিকের সীটে হেলে পড়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করছেন। মিঃ ফোর্ড বললেন, "এত খালি বড়ো একটা যায় না। সব বাস বোঝাই গেলে তো গ্রে-হাউণ্ড কোম্পানি সোনার বাস চালাতে পারতো। আজকে খালি হয়ে ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গে গল্প জমানো যাচ্ছে।"

আমি সায় দিলাম। মিঃ ফোর্ড বললেন, "বাস-ড্রাইভারের জীবনে এই বন্ধুত্বটুকুই লাভ। বাস চালানো একঘেয়ে। এই রাস্তায় কোথায় ক'টা ল্যাম্প-পোষ্ট আছে, কোথায় কী গাছ আছে, তোমায় মুখস্থ বলে যেতে পারি। কিন্তু মানুষগুলো নতুন। অনেক মুখের সঙ্গে অবশ্য বার বার দেখা হয়ে যায়—কিন্তু তাদেরও ভাল লাগে।"

একটু ফিস ফিস করে মিঃ ফোর্ড বললেন, "ওই যে মহিলাযাত্রী দেখছো,

উনি এ-লাইনে অনেকদিনের যাত্রী। ওঁর কোমরের মাপ যখন ২২ ইঞ্চি ছিল তখন থেকে দেখছি—তারপর বিয়ে হলো, ছেলে হলো। বাড়তে বাড়তে কোমর ৩২ ইঞ্চি পেরিয়ে গেলো। দু'বছর আগে বেচারার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। ছেলেও ভিয়েতনামের যুদ্ধে ক'দিন আগে মারা গিয়েছে। এসব আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু ছেলে মারা যাবার পরে সেদিন কাগজে ওঁর ছবি বেরিয়েছিল। তার থেকে জানতে পারলাম। প্রতি মঙ্গলবার ওঁকে এই বাসে দেখবে। শনিবার ওয়াশিংটনে যান, কোন্ কাজিনের সঙ্গে উইক-এণ্ড করতে. ফেরেন সোমবারে।"

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম মিঃ ফোর্ডের কথা। দূর প্রবাসে এই সামান্যক্ষণের মধ্যে এমন আলাপ হয়ে যেতে পারে তা বিশ্বাস হয় না।

নিজের ঘরের অনেক কথা বলতে লাগলেন মিস্টার ফোর্ড। বড়োমেয়ে বিয়ে করেনি। তার ডাইং-ক্লিনিংয়ের দোকান আছে। ভাল রোজগার করে। মেজমেয়ে নার্স, বিয়ে করেছে এক পশু-চিকিৎসককে। থাকে আইওয়া স্টেটে। মেজমেয়ে প্রতি শনিবার দূরপাল্লার ফোন করে বাবা-মার খোঁজ নেয়। সেজমেয়ে এয়ার হোস্টেস ছিল, বিয়ে করেছে এক সুইস ছোকরাকে। এখন থাকে 'দি হেগ'-এ, জামাই ওখানকার সুইস এয়ার লাইনের চাকুরে। ছোটমেয়েকে নিয়েই চিন্তা—নিউ ইয়র্কে আই-বি-এম অফিসে লেডি সেক্রেটারি। বিয়ে হবার নাম-গন্ধ নেই।"

"এই ছোট মেয়েটার জন্মেই আমি আর আমার স্ত্রী প্রায়ই ভাবি। দু'বছর এক ছোকরার সঙ্গে স্টেডি গেলো।"

"আজ্ঞে এই 'গোয়িং স্টেডি' কথাটা আরও দু'এক জায়গায় শুনলাম, ব্যাপারটা কী?"

"ওহো, তোমাদের ইণ্ডিয়াতে তো চাইল্ড ম্যারেজ। টেলিভিশনে দেখেছিলাম—একটা আট বছরের মেয়ের সঙ্গে বারো বছরের ছেলের বিয়ে। 'স্টেডি' মানে, আমার মেয়ে তখন একজন মাত্র ছোকরার সঙ্গে ডেট করছে। তার মানে দুজনেরই দুজনকে মনে ধরেছে, কিন্তু তখনও বাগ্দান হয়নি, বা পাকাপাকি মনস্থির হয়নি।"

এরপর নিজের কনিষ্ঠ কন্যার কথা বলে যেতে লাগলেন মিঃ ফোর্ড। "দু'বছর স্টেডি যাবার পরে কী যে হলো জানি না। সে ছোকরা নাকি এক

আলাজ-বাথের সুইডিস মেয়ুয়ার সঙ্গে জমে গিয়েছে। সে যাকগে। এককথায় তো বিয়ে হয় না, হওয়া উচিতও নয়। দু'চারটে ঠোকর খাওয়া দরকার, তবে তো বিবাহিত জীবনের মর্ম বুঝবে। তা আমার মেয়ে দেখতে সুন্দরী, খুব ভাল কথাবার্তা বলতে পারে। অনেক ছোকরাই এমন মেয়ে পেলে বর্তে যাবে। কিন্তু কি যে হল মেয়ের মনে, প্রতি শনিবার আমাদের এখানে এসে হাজির হয়। ভাবো, সমর্থ কুমারী মেয়ে তোমার, যদি উইক-এণ্ডে ডেট না করে বাড়িতে এসে বসে থাকে, তাহলে বাবা-মার দুশ্চিন্তা হবে না ?"

"আমরা তো শেষ পর্যন্ত ফন্দি করে মেয়েকে বললাম, কেটি, সামনের দুটো উইক-এণ্ডে আমরা একটু বেড়াতে বেরুবো। তুমি আসতে চাইলে ওয়েলকাম, আমরা নেবারের কাছে চাবি রেখে যাবো, কিন্তু এতখানি কষ্ট করবে কিনা ভেবে দেখো।"

"এতে ফল হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ মেয়ে আমার তার পরের দু'সপ্তাহ আসেনি। শনিবার ওর অ্যাপার্টমেন্টে টেলিফোন করেও আমার স্ত্রী ওকে পায়নি। তার মানে নিশ্চয় ও আবার ডেট করছে। তাছাড়া কিছুদিন আগে মাথায় ভূত চেপেছিল, পীস-কোরে যোগ দিয়ে আফ্রিকায় যাবে। এবারের চিঠিতে মাকে লিখেছে, পীস কোর-এ যোগ দেবার পরিকল্পনা এখন বাতিল।"

এই মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলেই ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যান মিস্টার ফোর্ড। বললেন, "রোজগার তোমাদের দশজনের শুভেচ্ছায় মন্দ করি না। মাইলেজ অ্যালাউন্স নিয়ে তা মাসে হাজার আটেক টাকা হয়। বাড়িতে দু'খানা গাড়িও আছে। থাকি রলে শহরে। স্যার ওয়াল্টার রলের নাম শুনেছ তো ? ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ যাঁকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর নামেই আমাদের শহরের নাম। যদি কখনও রলেতে আসো, আমার বাড়িতে ড্রপ কোরো। আর তিন বছর পরে রিটায়ার করবো। গিন্নী ওখানকার এক মুদির দোকানে অ্যাসিস্টেণ্ট—হাজার তিনেক টাকা মাস গেলে ঘরে নিয়ে আসেন। তিনিও রিটায়ার করবেন ভাবছেন। তারপর কর্তা-গিন্নী মিলে ইয়োরোপ বেড়াতে যাবো। এশিয়াতে যাবারও ইচ্ছে, কিন্তু অনেক খরচ। কতদিন বাঁচতে হবে ঠিক নেই,

আর ডলারের দাম যেভাবে কমছে তাতে খরচপত্তর সাবধানে করতেই হবে।”

স্টিয়ারিংয়ের ওপর অভিজ্ঞ হাত দুটো রেখে মিস্টার ফোর্ড বললেন, “দেশভ্রমণের আনন্দটা আমি বাসের বিদেশী যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে মিটিয়ে নিই। একবার তোমাদের দেশের এক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দল বেঁধে ওরা যাচ্ছিল চ্যাপেল হিল-এ, অতগুলো স্কার্টের মধ্যে একটা শাড়ি-পরা মেয়ে। আহা, যেমন চোখ, তেমন চুল, আর ঠিক তেমন ধীর শান্ত কথাবার্তা। আমার একটা ফটো নিয়েছিল, আমার ঠিকানাও চেয়ে নিয়েছিল। কত লোকই তো ফটো তোলে, ঠিকানা চায়, কিন্তু পরে কোন উত্তর আসে না। এই মেয়েটার ভারি সুন্দর নাম— শকুন্তলা বসু। সে আমাকে শুধু ছবি পাঠায়নি—সঙ্গে একটা লর্ড গণেশের মূর্তি পাঠিয়েছিল। ভেরি সুইট গার্ল। দেশে ফিরে গিয়েছে, কিন্তু ক্রিস্টমাসে এখনও কার্ড পাঠায়। আমি তো সেদিন একটা ছোট্ট গিফ্‌ট পাঠালাম ওকে।”

মিঃ ফোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তায় বেশ জমে গিয়েছি। এশিয়া আফ্রিকা সম্বন্ধে ভদ্রলোক অনেক কথা বললেন। ইণ্ডিয়ার দারিদ্র্য সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। “টেলিভিশনে তোমাদের দেশের দুরবস্থা দেখি। বিহারের কয়েকটা বাচ্চাছেলের কঙ্কালসার ছবি দেখে আমার স্ত্রী তো কেঁদেই ফেললেন। বড়ো নরম ওঁর মনটা। আমাদের এখানে এত রুটি, কত খাবার তো আমরা নষ্টই করি, আর তোমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেরা খেতে পাচ্ছে না।”

বললাম, “আপনার মত মানুষের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, মিস্টার ফোর্ড।”

মিঃ ফোর্ড বললেন, “আমরা সামান্য মানুষ। তবু আমার স্ত্রী বলেন, সবারই যথাসাধ্য করা উচিত। আমাদের চার্চ থেকে অনেক গুঁড়ো দুধ পাঠানো হচ্ছে তোমাদের দেশে। আমরা দুজনে ছ'মাস ধরে দশ ডলার করে দিয়ে যাচ্ছি।”

আফ্রিকা সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন মিঃ ফোর্ড। ‘আপনি দেখছি অনেক পড়াশোনা করেন”, বললাম ওঁকে।

"পড়াশোনা! ওসবের পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি! তবে টেলিভিশনটা মন দিয়ে দেখি। সারা পৃথিবীর খবর পাওয়া যায়। চোখের সামনে পৃথিবীর পাঁচটা মহাদেশের ছবি দেখতে পাই। আমার যতটুকু বিদ্যে এই টেলিভিশন দেখে। বিশেষ করে এডুকেশন টি-ভিটা আমার ভাল লাগে। আমার স্ত্রীর আবার অন্য চ্যানেল পছন্দ। তাই দুটো টি-ভি সেট রাখতে হয়েছে।"

সাধারণ মানুষের শিক্ষায় টেলিভিশন সত্যি কি বিপ্লব আনতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সমস্ত পৃথিবীটাকেই প্যাকেটে পুরে প্রতিটি পরিবারের ড্রয়িংরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। খবরের কাগজে খবর পড়া, কিংবা রেডিওতে খবর শোনার সঙ্গে টি-ভিতে খবর দেখার যে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তা টি-ভি দেখার আগে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।

চোখের সামনে যা দেখা যায় তাই মনের মধ্যে গেঁথে যায়—অথচ কোনো চেষ্টা করতে হয় না, সুইচটা অন করে টি-ভি সেটের সামনে বসে থাকলেই হলো।

অক্ষরে পড়া বা কানে শোনার সঙ্গে চোখে দেখায় তফাৎ কত নিজেই বুঝেছিলাম, যেদিন টি-ভিতে কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের দৃশ্য দেখলাম। কলকাতায় নিজের বাড়িতে বসে এর আগে বহুবার কাগজে রিপোর্ট পড়েছি, দু'তিনবার দূর থেকে হৈ-হুল্লোড়ও দেখেছি, পুলিস আসছে বুঝে দ্রুতবেগে পালিয়েছি—কিন্তু আসল রণটা কখনও চোখে দেখিনি। পরের দিন শুধু কাগজে পড়েছি—এতগুলি ট্রাম ভস্মীভূত, পুলিসের এতো রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ও এতো রাউণ্ডগুলি চালনা, এতোজন হতাহত, এতোজন গ্রেপ্তার। কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডটা চোখের সামনে দেখলে অন্যরকম উপলব্ধি হয়। যে-দৃশ্য কয়েকজন পুলিস, কিছুসংখ্যক দাঙ্গাকারী এবং সামান্য কয়েকজন ডাক্তার দেখে থাকেন, আমরা দশহাজার মাইল দূরে হোটেলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে তা পুরোপুরি দেখলাম।

টি-ভিতে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, আমরা সবাই যদি চোখের সামনে এই ছবি দেখতাম, তাহলে এর পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে আমরা অনেক বেশী তৎপর হতাম। হয়তো আমার ভুল ধারণা, কিন্তু

আমাকে অন্য লোকেরা কীভাবে দেখছে আমরা সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, তাই মাঝে-মাঝে আয়নায় নিজের মুখ দেখলে লাভ ছাড়া লোকসান হতে পারে না।

পরবর্তী বাস-স্টপে মিস্টার ফোর্ড আমাকে কফির দোকানে টেনে নিয়ে গেলেন। সেখানে নিজেই কফির দাম দিলেন, আমার ডায়েরিতে নিজের নাম সই করে, ব্রাকেটে লিখলেন 'চ্যাপেল হিল-এর বাস-ড্রাইভার'।

প্রশ্ন করলাম, "এটা লিখলেন কেন ?"

'বা রে! না লিখলে তোমার মনে থাকবে কেন ? মার্কিন মহাদেশ ভ্রমণে এসেছো, কত গুণী জ্ঞানী লোকের সঙ্গে দেখা হবে, কত লোকের ঠিকানা লেখা হবে তোমার খাতায়, তারপর যখন দেশে ফিরে যাবে তখন হয়তো ঠিক করে উঠতে পারবে না—কে কোন্ জন। মুখগুলোর সঙ্গে নামগুলো মিলিয়ে নিতে হবে তো ? যখন দেখবে লেখা আছে জর্জ রাদারফোর্ড, বাস-ড্রাইভার, তখনই মনে পড়ে যাবে ওয়াশিংটন থেকে চ্যাপেল হিল-এর পথে এই কয়েক ঘণ্টার কথা।"

এদিকে কথার ফাঁকে-ফাঁকে কখন সূর্যাস্তের সময় হয়েছে। নতুন পৃথিবীর আকাশে সারাদিন ডিউটি দিয়ে বয়োবৃদ্ধ সূর্য কখন পশ্চিমের আকাশে তাঁর ক্লান্ত রশ্মি প্রসারিত করেছেন। আমরা কখন নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের প্রায় হৃদয়স্থলে হাজির। অরণ্যময় মার্কিন দাক্ষিণাত্যের পাইন ওক পপলার আর ওয়ালনাট গাছগুলোর লম্বা ছায়া মাটির বুকে সেখানে নানা নক্সা সৃষ্টি করেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম বিদায় নেবার সময় প্রায় সমাগত। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে চ্যাপেল হিল-এ গাড়ি পৌঁছবে।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়েই সত্যি বাসটা চ্যাপেল হিল বাস-স্টেশনে ঢুকে পড়লো। আমার ব্যাগদুটো নিজের হাতে বাস থেকে নামিয়ে দিয়ে জর্জ রাদারফোর্ড তাঁর ভারী হাতখানা এগিয়ে দিলেন। দীর্ঘ উষ্ণ করমর্দনের পর রাদারফোর্ড আশীর্বাদ করলেন, "হ্যাভ এ গুড টাইম। মনের আনন্দে আমাদের দেশ দেখো ; আর খেয়াল রেখো, ভালোর সঙ্গে কিছু কিছু বদ লোকও ঈশ্বর সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন।"

॥ ৩ ॥

চ্যাপেল হিল-এর মাটিতে পা দিয়েই মনটা জুড়িয়ে গেলো। বেশ বুঝতে পারলাম, চ্যাপেল হিল আমার ভাল লাগবে।

লুইস কার্নাহানের কথা মনে পড়ে গেলো। ওঁকে বিশ্বাস করে আমার যে ঠকতে হচ্ছে না তা এই দীর্ঘ বাস-যাত্রায় বুঝে গিয়েছি। আর মনে পড়লো আমার মা-র কথা। যাবার আগে মা বলেছিলেন, যখন যেখানে থাকবি সেখানকার সবকিছু দেখে নেবার বুঝে নেবার চেষ্টা করিস। দেশের কথা ভেবে মন খারাপ করিস না—তাতে বাড়িও পাবি না, বিদেশও দেখা হবে না।

ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আমেজ রয়েছে, পরিচ্ছন্ন চ্যাপেল হিল-এর নির্মল হাওয়ায়, কিন্তু ওভারকোট চাপাবার মত অবস্থা মোটেই নয়। তবু ওই বস্তুটা গায়ে চড়াতে হলো—কারণ কোটের মালিক (তিনি ওটি আমাকে দীর্ঘ মেয়াদে ধার দিয়েছিলেন) সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধি দিয়েছিলেন, বিদেশে সহজেই ঠাণ্ডা লেগে যায়।

গলায় ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে নিয়ে এবার দু'হাতে দুই ব্যাগ পাকড়াও করে নিজের মনেই ফিক করে হেসে ফেললাম। স্থানভেদে সত্যি একই পাত্র অন্য পাত্রের রূপ নেয়। কলকাতায় এই দু'খানি আধমনি ব্যাগ বইবার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। আমার এই অবস্থার কথা আন্দাজ করে লণ্ডনে আমার স্থানীয় গার্জেন শল্যচিকিৎসক শুভব্রত রায়চৌধুরী বলেছিল, "মাল বইতে-বইতে দেশ দেখার আনন্দ বেরিয়ে যাবে।" শুভব্রত সেলফ্রিজের দোকান থেকে একটি চাকাওয়ালা বেল্ট কিনে দিয়েছিল। শুভব্রতর রসিকতা : "দেখুন দাদা, কী কল বানিয়েছে সায়েব কোম্পানি ; চাকাতে মাল চলে আপনি-আপনি।"

এই চাকা বিদেশে আমার বিপদভঞ্জন মধুসূদন! ব্যাগের গায়ে চাকা বেঁধে বেমালুম কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ব্যাগ দুটো একটা ট্যাক্সির সামনে এনে হাজির করলাম।

চ্যাপেল হিল-এর ট্যাক্সিওলা আমাকে ক'মিনিটেই আমার গন্তব্যস্থল 'ক্যারোলিনা ইন্'-এ পৌঁছে দিল।

মনে আছে, ছোটবেলায় স্কুলে স্কুলে মুখস্থ করতাম 'আই ডবল এন ইন্—ইন্ মানে সরাইখানা'। তারপর এই তেত্রিশ বছরের জীবনে সরাইখানার কত গল্প পড়েছি, কত কথা শুনেছি। সরাইখানায় থাকার সুযোগ হবে জেনে তাই বেশ পুলকিত হয়েছিলাম।

গাড়ি থেকে নেমেই বুঝলাম, নামেই ইন্ আসলে হোটেল। হোটেলের খাতায় নাম লিখে, নিজের ঘরে না-গিয়ে বাইরের বাগানে বেরিয়ে এলাম। বড়ো ভাল লাগছে জায়গাটা। চ্যাপেল হিল-এর আকাশে বাতাসে অনির্বচনীয় প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে। উটের পিঠে চড়ে হাজার হাজার মাইল মরুভূমি পেরিয়ে ক্লান্ত বেদুইন আমি জীবনে এই প্রথম আমার স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে এলাম।

দুরন্ত মানবশিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্যে স্নেহময়ী পৃথিবী রাত্রির কোমল আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়েছেন চ্যাপেল হিল-এর বুকে।

চ্যাপেল হিল-এর প্রথম রাত্রির কথা ভাবলে আজও আমার অবাক লাগে। হঠাৎ পাল্টে গিয়েছিলাম। ইট-কাঠ-লোহার তৈরি কলকাতায় জীবন কাটিয়ে যে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো আজন্ম মনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল, বিদেশের সঞ্জীবনী সুধায় সেগুলো হঠাৎ চোখ মেলে তাকাতে শুরু করলো।

বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এতোদিন কলেজ স্ট্রীটের আশুতোষ ভবনটাই চোখের সামনে ভেসে উঠতো। এবার অন্য ধারণা হলো। প্রকৃতির কোলের মধ্যে ভুবনমনোমোহিনী শান্তিনিকেতনে জ্ঞানের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় যন্ত্রসভ্যতার অত্যাচারের কথা ইস্কুলে পড়েছিলাম, মানুষ নাকি সেখানে দুয়োরাণীর মত শ্যামলী প্রকৃতিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। কিন্তু বিদেশে এসে বুঝলাম, প্রকৃতিকে এরা আমাদের থেকে অনেক বেশি ভালবাসে, অনেক বেশি মূল্য দেয়।

লবলোলি পাইন আর সাইপ্রেস গাছের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে, টিউবলাইটের স্নিগ্ধ আলোয় চ্যাপেল-হিল-এর নিস্তব্ধ রাজপথে চিরজ্যোৎস্না নেমে এসেছে। আর আমি নির্বাক বিদেশী মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে আছি রাতের গাউন-পরা অপরূপা চ্যাপেল হিল-এর দিকে।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে এল একটি প্রশ্নে: "মাপ করবেন। আপনি কী ভারত থেকে এসেছেন এইমাত্র? আপনার টেলিফোন।"

টেলিফোন ধরলাম। ওদিক থেকে ভেসে এলো, "আমি প্রফেসর এ সি হাওয়েল কথা বলছি। ওয়েলকাম টু চ্যাপেল হিল। কাল সকালে আপনার কাছে যাবো আমি। ইতিমধ্যে আপনার কোনো অসুবিধে হলে আমার বাড়িতে ফোন করবেন।"

টেলিফোন নামিয়ে, মালপত্র নিয়ে এবার ঘরে গেলাম। সিঁড়ির কাছে দেখলাম হোটেলের ইতিহাস লেখা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগন্তুক ও অতিথিদের জন্যে বহুদিন আগে এই সরাইখানা তৈরি হয়েছিল। নানা হাত ফিরি হয়ে অবশেষে এর মালিক হলেন এক মার্কিন-দম্পতি। মৃত্যুকালে তাঁরা এই মূল্যবান সম্পত্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে গিয়েছেন, এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এটি পরিচালনা করেন।

ঘরে ঢুকে সবেমাত্র জামা-কাপড় পাল্টে বসেছি, আবার ফোন। এবার খাঁটি বাংলায়, "হ্যালো, শংকরবাবু?"

চ্যাপেল হিল-এ বাংলা কথা শুনে মনে হলো যেন টেলিফোন থেকে খাঁটি মধু ঝরছে! "আমি বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে কথা বলছি। আপনার ওখানে যেতে পারি?"

চলে আসতে বললাম। মিনিট দশেক পরেই ঘরে টোকা পড়লো। তিন জন ভারতীয়কে একসঙ্গে দেখে আমি তো অবাক। এঁদের একজন কেরালার লোক, একজন অন্ধ্র প্রদেশের এবং আরেকজন বঙ্গনন্দন, যিনি ফোন করেছিলেন।

ওঁরা বললেন, "ইণ্ডিয়ান নেই মানে? এখানে আমরা ভারতীয় ছাত্র সমিতি পর্যন্ত করেছি। এটা জেনে রাখবেন যে, নয় নয় করেও মার্কিন দেশে যাটহাজার ভারতীয় আছেন।"

সি পি রাও, যিনি স্থানীয় ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, বললেন, "আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছরে আটষট্টি হাজার ভারতীয় পড়াশোনা করেছেন। এখনও প্রায় আট হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিতে কয়েক হাজার ভারতীয় মাস্টার-মশায়ও রয়েছেন।"

"যেভাবে আপনি ফিগার দিচ্ছেন তাতে মনে হয় স্ট্যাটিসটিকস-এর চর্চা করেন আপনি," বললাম আমি।

"আমি স্কুল অফ বিজনেস অ্যাডমিনিসট্রেশনের ছাত্র। তবে স্বভাবতই স্ট্যাটিসটিকসে আগ্রহী। স্ট্যাটিসটিকসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নাম।"

এবার জানলাম, প্রফেসর হাওয়েলের নির্দেশে ওঁরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু মোটর বিভ্রাটে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে যায়। ওঁরা ভারতীয় সমিতির পক্ষ থেকে কোনো এক সন্ধ্যায় ছোটখাট আসরে আমার সঙ্গে মিলিত হতে চান। প্রফেসর হাওয়েল আমাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন।

অতিথি-আপ্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যত্ন ও ধৈর্য অশেষ। প্রফেসর হাওয়েল আমাকে চিঠিতে স্বাগত জানিয়েছেন, চ্যাপেল হিল-এ আসবার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছেন, এবং আমার সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করে রেখেছেন। তাছাড়া প্রতিটি লাঞ্চ ও ডিনার বুক্‌ড্। চিঠির সঙ্গে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট্ট একটি ইতিহাস—আর একটি ম্যাপ, যা পকেটে থাকলে হারিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই।

ভারতীয়দের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়া গেলো। অমূল্য নস্কর ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই এখানে পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় লেগে আছেন। অমূল্যবাবুর বন্ধু জানালেন, দুজনেই দু'নামের আলাদা আলাদা পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে এসেছিলেন। তারপর কি ছিল বিধাতার মনে! এখানেই বিয়ের ফুল ফুটলো।

আর একজন হাসতে হাসতে বললেন, "ভারতীয় মেয়েদের এখানে খুবই দাম।"

"মানে?"

"মানে, দেশে ফিরে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বাবাকে বুদ্ধি দিতে পারেন, কোনোরকমে মেয়েকে এদেশে পাঠিয়ে দিতে। বিনা পণে একেবারে প্রথম শ্রেণীর হীরের টুকরো জামাই যোগাড় হয়ে যাবে।"

"সত্যি নাকি?"

ওঁরা বললেন, "এসম্বন্ধে আপনাকে আরও তথ্য দেওয়া হবে।" কথাবার্তা আর চললো না, কারণ দু'জন ছাত্রের তখন ল্যাবরেটরিতে কাজ ছিল। শুধু অমূল্যবাবু রয়ে গেলেন।

অমূল্যবাবু বললেন, "চ্যাপেল হিল এবং কাছাকাছি অঞ্চলে আপনি

নিজের দেশের লোক অনেক পাবেন। শ্যামবাজার, পাইকপাড়া, বৌবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ—যেখানকার লোক চান আলাপ করিয়ে দেবো।"

শুনে একটু ভরসা পাওয়া গেলো। জীবন-সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালীরা যেভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে, তাতে বিদেশে তাদের হাসিমুখ দেখবো আশা করিনি। শুনলাম ছাত্রীও আছে—তাদের একজন শ্রীমতী শিপ্রা রক্ষিত, আমাকে ফোন করবে এবং সময়মতো দেখা করবে। "বিদেশে আমরা তো রোজ-রোজ দেশের লোক পাই না। সুতরাং কেউ এলে তাঁর ওপর আমরা একটু অত্যাচার করি, দেশের খবরাখবর তো আমরা কিছুই পাই না।" বললেন অমূল্যবাবু।

অমূল্যবাবু বললেন, "আর একটা কথা বলে রাখি ; প্রফেসর হাওয়েলের কাছে শুনেছি, ইন্-এ মাত্র তিন দিনের জন্য সীট পাওয়া গিয়েছে। ফুটবল খেলার জন্যে হোটেল আগে থেকে রিজার্ভ করা রয়েছে। চতুর্থ দিনের রাত্রিটা আমাদের বাড়িতে কাটাবেন, অন্য কাউকে কথা দেবেন না।"

বিদেশে বাঙালীমাত্রই সজ্জন, কথাটা বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র বহুকাল আগে লিখেছিলেন—কিন্তু বক্তব্যটা যে এখনও সমান সত্য তার প্রমাণ বিদেশে বার-বার পেয়েছি। নাম-ধাম-পরিচয়ের অপেক্ষা না-রেখে কত বাঙালী অপরিচিত পরিবেশে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। লণ্ডনের শ্যামাপ্রসাদ পালের কথাই ধরুন না। হিথরো বিমান-বন্দরে এঁর সঙ্গে দেখা না হলে কী রকম বিপদেই যে পড়ে যেতাম! সে এক গল্পের মতো। সে-কাহিনী পরে একসময় বলা যাবে।

কোথায় খাওয়া পাওয়া যায়, রাত্রি কোথায় কাটবে, এইসব চিন্তায় অভ্যস্ত বঙ্গসন্তান আমি হঠাৎ উল্টপুরাণের দেশে হাজির হয়েছি। এদেশে ঘন-ঘন টেলিফোন, ঘন-ঘন সাক্ষাৎকারে প্রবাসী বঙ্গসন্তানের বিনীত অনুরোধ—"কোনো ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না, আমাদের বাড়িতে দুটো ডাল-ভাত খেতেই হবে। জানি সরকারী অতিথি হয়ে এসেছেন, বড়ো বড়ো হোটেলে থাকার সুবিধে অনেক। কিন্তু যদি গরীবের বাড়িতে ওঠেন তাতে আপনার কষ্ট হবে, কিন্তু আমাদের মুখ চেয়ে রাজী হোন। বুঝতেই তো পারছেন পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়ে বিদেশে পড়ে রয়েছি—না-হয় একটু আমাদের জন্যে কষ্ট করলেন।"

ছোটবেলায় নবদ্বীপ হালদারের কমিক শুনেছিলাম, "কী অত্যাচার কী অত্যাচার! মশায়, সন্দেশ খাবো না বলছি, তবু জোর করে মুখের মধ্যে গুঁজে দিলো!"

বিদেশে প্রবাসী বাঙালীর এই পরমাত্মীয়বোধ আমাকে বিস্মিত করেছে। গভীর কৃতজ্ঞতায় এবং অপার আনন্দে আমার চোখ বার বার অশ্রুসিক্ত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

সকাল-সকাল ঘুম ভেঙেছিল। ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

সোনালী সূর্যের তরুণ কিরণ এসে পড়েছে পথের ওপর। দলে দলে ছাত্রছাত্রীরা বই হাতে বেরিয়ে পড়েছে পথে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তবান দেশের যুবক যুবতীদের মধ্যে একটু বাবু-বিবিভাব এবং চালবাজী থাকবে এমন একটা ভুল ধারণা মনের মধ্যে ছিল। দেখলাম ঠিক উল্টো।

জামা-কাপড় সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের কোনো লক্ষ্য আছে বলেই মনে হলো না। যার যা-খুশী গায়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেদের কেউ পরেছে খালাসী-নীল টাইট ফুলপ্যান্ট, ওপরে শার্ট। কেউ হাফপ্যান্ট, হাফ-হাতা স্পোর্টস গেঞ্জি এবং রবারের স্লিপার পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে।

মেয়েরা আরও সহজ ও স্বাভাবিক, যদিও কেউ কেউ হাঁটু পর্যন্ত লম্বা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর ঢলঢলে ব্লাউজ পরেই দোকানে এসেছে কফি কিনতে। মহিলাদের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য মার্কিন দেশে কোটি কোটি ডলারের প্রসাধন ব্যবসা চলছে—কিন্তু চ্যাপেল হিল-এর ছাত্রীদের দেখে মনেই হলো না তারা রুজ, লিপষ্টিক, ক্রিম, মেক-আপ, স্নো ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায়।

আর স্বাস্থ্য! প্রশস্ত হৃদয়ে ঈশ্বর এদের আশীর্বাদ করেছেন। যেমন দীর্ঘ দেহ, তেমনি সুগঠিত তনু; প্রতিটি মুখে আত্মবিশ্বাসের ছবি। বেশ কিছু মেয়ে লম্বা চুল রেখেছে। শুনলাম, দক্ষিণ আমেরিকার কিছু মহিলাদের দেখাদেখি লম্বা চুল বিশ্ববিদ্যালয় মহলে এখন জনপ্রিয়। বলা যায় না, হয়তো এরা একদিন আমাদের দেশের খোঁপার জন্যে পাগল হবে, এবং কেবল খোঁপা-বাঁধা শিখিয়ে আমাদের দেশের কিছু মহিলা প্রচুর অর্থ নিয়ে আসবেন ডলার-ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষে।

সামনের একটা দোকানের দিকে যাচ্ছে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরা। আমিও সেদিকে পা বাড়ালাম। দোকানটার বাইরে একটু বাগানের মতো রয়েছে—এবং সেখানেও কিছু টেবিল ও চেয়ার রয়েছে। দোকানে খাবার ও স্টেশনারী একসঙ্গে বিক্রি হচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা কফি, স্যাণ্ডউইচ, ডিম, আইসক্রিম, ফলের রস, দুধ যা খুশী কিনছে। যারা বিক্রি করছে তারাও ছাত্রছাত্রী। এক ঘণ্টা কাজ করলে আড়াই ডলারের মত আয় হয় শুনলাম।

খাবারগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। যে-ছেলেটি বিক্রি করছিল, সে বললে, "আপনাকে সাহায্য করতে পারি কী? মনে হচ্ছে, আপনি নিরামিষ কোনো খাবার খুঁজছেন।"

ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এরকম মনে হলো কেন?"

"আপনাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু বই পড়েছি।" ছেলেটি হেসে উত্তর দিলো।

বললাম, "আমি মাছ-মাংস খাই—তবে গরু খেতে অনভ্যস্ত।"

ছেলেটি যত্ন করে ডিমের স্যাণ্ডউইচের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো। অন্য একটি মহিলা কাগজের কাপে কফি এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি এখানে খাবেন না নিয়ে যাবেন?"

হেসে বললাম, "এটা জানতে চাইছো কেন?"

ছাত্রীটি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললে, "আপনি যদি বাইরে নিয়ে যান তাহলে একটা কাগজের ঢাকনা লাগিয়ে দেব কফির গ্লাসের ওপর—ধুলো পড়বে না, কফি বেশীক্ষণ গরম থাকবে।"

কফির টেবিলে দুধ ও চিনির প্যাকেট রয়েছে—কিন্তু দেখলাম প্রায় সব ছেলেমেয়েই ওদিকে হাত বাড়াচ্ছে না। কালো তেতো কফি খাওয়াটা এদের সভ্যতার প্রায় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কফি ও স্যাণ্ডউইচ নিয়ে বাইরের টেবিলে বসলাম। প্রায় সব টেবিলই ভরা। আইসক্রিম হাতে করে একটা ছোকরা এসে আমার টেবিলে বসলো। একটু একটু আইসক্রিম কামড়াচ্ছে আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

"হাই! জেরি", দেখলাম বইপত্র হাতে করে একটি মেয়ে আমাদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

জেরি নামক যুবক উত্তর দিলো, "হাই, লিণ্ডা। তোমার তো দেখা পাওয়াই ভার।"

লিণ্ডা বললো, 'পরীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষা। পাগল হয়ে গেলাম। কালকে ভোর তিনটের সময় ঘুমোতে গিয়েছি।"

জেরি কপট সহানুভূতি দেখিয়ে বললো, "পুওর গার্ল! তোমার চোখের কোণে কালো দাগ পড়ে গিয়েছে—ভাগ্যিস কারণটা বললে, না হলে আমি ভাবতাম ডরমিটরি থেকে পালিয়ে বুধবার রাত্রেও কোথাও ডেট করেছো।"

সুদেহিনী লিণ্ডা ভ্রূধনু ভঙ্গ করলো, 'বটে! এর উত্তর দিচ্ছি। আগে কফি নিয়ে আসি।"

"তার আগে", এই বলে জেরি তার আধ-খাওয়া আইসক্রিম কোন্‌টা লিণ্ডার দিকে এগিয়ে দিলো। লিণ্ডা খিল-খিল করে হেসে বেশ খানিকটা আইসক্রিম চেটে নিলো।

লিণ্ডার দুই সহপাঠিনী ইতিমধ্যে কফির জন্যে লাইন দিয়েছে—লিণ্ডার কার্যকলাপের দিকে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সম্মান করে, অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে অথবা অযথা কৌতূহল প্রকাশ করে নিজের সময় অপচয় করে না।

দেখলাম বান্ধবী দু'জন কফির গ্লাস হাতে করে গাছের তলায় ঘাসের ওপর বসলো। হাতের খাতা খুলে দু'জনে এবার লেখা পড়ায় মন দিলো। একজন একটু পরে সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে পায়ের চটিটা ফুটবলের মত দূরে ছুঁড়ে দিল।

ওয়াশিংটনের এক বাঙালি ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। তিনি বলেছিলেন, "আমরা যা, ওরা ঠিক তার উল্টো। আমরা যদি শীতের ভারখয়ানস্ক হই, তাহলে এরা গ্রীষ্মের জেকবাবাদ! আমাদের আগে বিয়ে পরে প্রেম, এদের আগে প্রেম পরে বিয়ে। আমাদের জীবনে চির-বার্ধক্য, সরকারীভাবে সেখানে যৌবনের প্রবেশ নিষেধ, এদের জীবনে যৌবনেরই জয়জয়কার। যৌবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে শিকলে বেঁধে এরা ধরে রাখতে চেষ্টা করে।" ভদ্রলোক বলেছিলেন, "যৌবনকে নিয়ে এই আদেখ্‌লেপনা

আমার চোখে মশাই দৃষ্টিকটু ঠেকে, এতো পণ্ডিত হয়েও এরা বোঝে না যৌবন দেরিতে এসে সবার আগে চলে যায়!" কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছিলেন, "যৌবন নিয়ে যুক্তিহীন মাতামাতিতে যদি আপনার ক্লান্তি আসে তাহলে কোনো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবেন। যৌবনের আদর্শ বিকাশ ওখানে দেখতে পাবেন।

সত্যি, ভোরের আলোয় চ্যাপেল হিল-এর ক্যাম্পাসে যুবক-যুবতীদের মধ্যে সংযত অথচ প্রাণবন্ত যৌবনের যথার্থ চিত্র দেখতে পেলাম। এরা সবুজ এবং স্বপ্নে ভরা, অথচ আত্মনির্ভর এবং দায়িত্বশীল।

প্রাচীন যুগে ঋষিদের আশ্রম সম্বন্ধে আমার যা কল্পনা ছিল তারই আধুনিক সংস্করণ যদি কোথাও খুঁজতে হয় সে এইখানে, এইখানে। এমন বিরামহীন জ্ঞানের তপস্যা এখন আর কোথায় হচ্ছে? ভোরবেলায় গ্রন্থাগারের দরজা সেই যে খুললো, মধ্য রাতের আগে তা আর বন্ধ হয় না। আর বই? গোটা কয়েক ন্যাশনাল লাইব্রেরি ঢুকে যাবে এমন গ্রন্থাগার আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে। বাংলাভাষায় প্রকাশিত সমস্ত বই কেনা হয় এমন মার্কিন গ্রন্থাগারের সংখ্যাই সতেরোটা। সেখানে যা বাংলা বই আসে, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিও তা সংগ্রহ করতে পারেন না।

এইসব ভাবনার মধ্যে সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো প্রফেসর হাওয়েলের আসার সময় হয়ে গিয়েছে। হোটেলের লবিতে ঢুকতেই দেখলাম এক সৌম্য বৃদ্ধ বসে আছেন আমার জন্যে। নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আমিই হাওয়েল। আমি এখানকার বিদেশী ছাত্রদের দেখাশোনা করি।"

হোটেল থেকে বেরিয়ে পথ হাঁটতে-হাঁটতে হাওয়েল বললেন, "আগে আমি ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতাম। প্রফেসর থাকাকালীন দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতাম খুব—এটা আমার একটা নেশার মত। অধ্যাপনা থেকে অবসর নেবার পরও কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত 'বিশ্ববিদ্যালয়' কথাটার মধ্যে 'বিশ্ব' শব্দটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।"

আমি মৃদু হাসলাম। অধ্যাপক হাওয়েল বললেন, "গত তিরিশ বছরে কত দেশের ছেলেমেয়ে দেখলাম। দেশে দেশে কত পার্থক্য, আবার সব মানুষ একও বটে। আমি অবাক হয়ে ছাত্রদের লক্ষ্য করি। হঠাৎ যখন নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশী পরিবেশে হাজির হয়, তখন কত রকমের প্রতিক্রিয়া হয়। আমার সাধ্যমত এদের সাহায্যে আসবার চেষ্টা করি; যাতে ওরা এই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, অথচ নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে না ফেলে। সেইটাই আমার লক্ষ্য।"

বললাম, "ভারতীয় ছাত্রও আছে নিশ্চয় এর মধ্যে?"

হাওয়েল বললেন, "প্রচুর ভারতীয় ছাত্র পেয়েছি আমি।"

"আশা করি তারা আপনার দুশ্চিন্তার বোঝা খুব বাড়ায় না," আমি ওঁকে উদ্দেশ করে বলি।

হেসে ফেললেন হাওয়েল। "দুশ্চিন্তার ধারাবাহিক সরবরাহ না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে রাখবেন কেন বলুন? তবে, আই মাস্ট সে, ভারতীয় ছাত্রদের এখানে যথেষ্ট সুনাম। তারা পরীক্ষায় খুব ভাল করে, বিশেষ করে অঙ্কে এত খাসা মাথা খুব কম জাতেরই আছে।"

একটু থেমে হাওয়েল বললেন, "আপনার দেশের ছেলেরা এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়। তাদের নিয়ে ইদানীং বরং অন্য ধরনের অসুবিধায় পড়ি। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে, পরীক্ষায় পাস করার পর তারা দেশে ফিরতে চায় না, বলে এখানেই চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। ব্যক্তিগতভাবে এর মধ্যে আমি কোনো অন্যায় দেখি না, আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো একদিন অন্যদেশ ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন। আর মেধাবী ও প্রতিভাবান ছেলেরা যদি এদেশে থাকতে চায় তাতে আমেরিকার লাভ। কিন্তু মার্কিন সরকার এখন অসুবিধার সৃষ্টি করছেন। তাঁদের বক্তব্য, ভারত সরকার এবং অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের কর্তৃপক্ষ এর বিরোধী। এরই নাম নাকি 'ব্রেন ড্রেন'—দেশের ছেলে যদি দেশের কাজে না লাগলো, তাহলে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে লাভ কী? আমেরিকার কর্মচারীসমস্যা সমাধানের জন্যে তো অন্যদেশের প্রতিভাবানদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়নি।"

অধ্যাপক হাওয়েল জানতে চাইলেন "এ-বিষয়ে তোমার মতামত কী?"

বললাম, "ঘরের ছেলে পর হয়ে গেলে কার না দুঃখ হয়? তবু এ বিষয়ে আমার মতামত খুবই স্পষ্ট। আমি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। নগদ খরচ করবার জন্যে যখন একটি মাত্র জীবন ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন তখন যার যেখানে সুবিধে, যার যেখানে প্রাণ চায়, সে সেখানে থাকুক। ব্যক্তিগতভাবে আমার স্বপ্ন, আমার যদি কিছু দেবার থাকে সেটা প্রথমেই আমার দুঃখিনী মাকে নিবেদন করবো। কিন্তু সেটা আমার অভিরুচি। নিজের মন থেকে এই ইচ্ছা কারুর মনে না এলে, গায়ের জোরে তাকে জন্মস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়াটা আমার ন্যায়সঙ্গত মনে হয় না। আমার ছেলে বাড়ি থেকে পালালে আমি তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবো; কিন্তু অন্য গৃহস্থকে বলবো না তুমি দরজা বন্ধ করো, তবে আমার ছেলে বাড়ি ফিরবে।"

হাওয়েল বললেন, "তাছাড়া শুনি, অনেকে ফিরে গিয়ে কাজের কোনো সুযোগ পায় না, তাদের প্রতিভা ও শিক্ষা দুটোই নষ্ট হয়।"

আমি বললাম, "ব্রেন ড্রেনের সঙ্গে 'ব্রেন স্যাংচুয়ারি' কথাটা স্মরণ রাখবেন। বিশ্বের সেরা প্রতিভাধরদের একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থলও তো দরকার! তুলনাটা এই পরিপ্রেক্ষিতে খাটে না, কিন্তু স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে কার্ল মার্কস যদি ইংলণ্ডে স্থান না পেতেন, আইনস্টাইনকে যদি হিটলারের জার্মানিতেই থাকতে হতো, তাহলে পৃথিবীর কী পরিমাণ ক্ষতি হতো? কেউ স্বেচ্ছায় স্বদেশে ফিরতে না চাইলে আমার মনে হয় সেখানে আমাদের বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত, তাঁকে রেখে আপনাদের কোনো লাভ হবে কি না। যদি তিনি আপনাদের বোঝা না হন, যদি কাজ খালি থাকে, তাহলে তাঁকে সুযোগ দিতে ক্ষতি কী?"

হাওয়েল বললেন, "এই যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দেখছো, এটি এদেশের প্রাচীনতম স্টেট ইউনিভার্সিটি। ১৭৯১ সাল থেকে এখানে জ্ঞান-চর্চা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যেই চ্যাপেল হিল শহরের সৃষ্টি। ওই যে গাছটা দেখছো, ওর নাম ডেভি জুনিয়র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে পছন্দ-মত জায়গা খুঁজতে-খুঁজতে সেনাপতি ডেভি এইখানে এক গাছের তলায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই গাছটা কিছুদিন আগে যখন মারা গেলো তখন এই গাছটা পোঁতা হয়—আগের গাছটার নাম ছিল ডেভি সিনিয়র।"

বিশ্ববিদ্যালয়টা একটা বিরাট বাড়ি নয়। অনেকগুলো বাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাস—প্রতিটা বাড়ির আবার ইতিহাস আছে।

হাওয়েল বললেন, "সরকারী সাহায্য ছাড়াও, বহুলোকের, বিশেষ করে প্রাক্তন ছাত্রদের দানে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হয়েছে। প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক। অনেকে এখানে বেড়াতে আসেন, নিজেদের ছাত্রাবস্থার দিনগুলোর কথা স্মরণ করে তাঁরা আনন্দ পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে উইলে টাকা রেখে যাওয়াটা এদেশে কোনো খবরই নয়।"

আমি মনে-মনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবছিলাম। ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শিখে কত মানুষই তো জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আমরা কেউ কিছু করি না। আমাদের উইলে ছেলে-মেয়ে-বউয়ের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাইপো-ভাইঝি নাতি-নাতনীরাও ঢুকে পড়েন—কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। অথচ খবরের কাগজে প্রকাশিত শোকসংবাদে 'দানশীল' অথবা 'দানশীলা' শব্দটি প্রতিদিনই ব্যবহৃত হয়। মৃত্যুর পরে ধনীরা দু'দশ লাখ অথবা দু'দশ হাজার দিচ্ছেন কি না সেইটাই বড়ো প্রশ্ন নয়। জীবিতকালে যাঁরা দু'পাঁচ টাকা দিতে পারেন এমন লোকও কম নেই। বছরে প্রতিটি প্রাক্তন ছাত্র পাঁচটি টাকা দিলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কত কাজই না করা যেতো!

হাওয়েল বললেন, "আমাদের এক প্রাক্তন ছাত্রের কথা শুনুন; এক সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় এখানকার ল্যাবরেটরিতে জন মোটলে মোরহেড সামান্য গবেষণা করেন। সেই গবেষণার সূত্র ধরে বিখ্যাত ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি কিন্তু ভোলেন নি। মোরহেড ফাউণ্ডেশন থেকে আমরা অনেক টাকা পেয়ে থাকি। এ বছরে ৯৯টি ছাত্র মোরহেড বৃত্তি পাচ্ছেন। প্রতিটি বৃত্তির পরিমাণ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশী। মোরহেড তাঁর কলেজে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক প্লানেটোরিয়াম তৈরি করে দিয়েছেন। পৃথিবীর আর কোনো কলেজে এমন প্লানেটোরিয়াম নেই। মার্কিন মহাকাশচারীরা নক্ষত্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে এখানে ট্রেনিং নিতে আসেন। মোরহেডের যে বন্ধুর কথা বলছিলাম, তিনিও পরে অনেক

অর্থ রোজগার করেন। তাঁর টাকাটা এমন ভাবে দিয়ে গিয়েছেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুণী জ্ঞানীদের আমরা এখানে ভাল মাইনে দিয়ে অধ্যাপক হিসেবে আনতে পারি। ওঁর নাম অনুসারে তাঁদের বলা হয় কেনান অধ্যাপক।"

অধ্যাপক হাওয়েল এবার আমাকে অবাক করে দিলেন। জানালেন, "একজন কেনান অধ্যাপক তোমাদের দেশ থেকেই এখানে এসেছেন। স্ট্যাটিসটিকসে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি নাম শুনে থাকবে হয়তো, রাজচন্দ্র বসু।"

অপরাধ স্বীকার করে বললাম, "ওঁর সম্বন্ধে কিছু শুনিনি। গোলা লোকদের কাছে ও বিষয়ে আমাদের দেশে একটি মাত্র নামই পরিচিত। তিনি হলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।"

প্রফেসর হাওয়েল বললেন, "তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তুমি ইচ্ছে করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-কোনো ক্লাসে যোগ দিতে পারো। এখানে ভোরবেলা থেকে ক্লাস আরম্ভ হয়। সন্ধ্যেবেলাতেও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় না। তুমি তো জানো, আমরা সন্ধ্যা ৬টার সময় ডিনার খেয়ে নিই। ডিনারের পর কিছু-কিছু ক্লাস হয়, তাছাড়া নানা ধরনের মিটিং লেগেই আছে। বিভিন্ন হলে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হয়, ছাত্র ও অধ্যাপক দল বেঁধে সে-সব শুনতে আসেন এবং বক্তৃতার পর কফির সঙ্গে এ-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হয়। শুধু পরীক্ষায় পাস করার জন্যে বিদ্যালয়ে আসার মানে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ আসে তার জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করতে। তাই দেখবে সঙ্গীতের বক্তৃতায় পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্ররা ভিড় করছে, সাহিত্যের তেমন বক্তৃতা থাকলে তো তিলধারণের জায়গা থাকে না। আজ সন্ধ্যায় একটা বিশেষ বক্তৃতা করবেন প্রখ্যাত মার্কিন লেখক নরম্যান করউইন। আমাদের সৌভাগ্য, ওঁকে আমরা রাইটার-ইন-রেসিডেন্স হিসেবে পেয়েছি।"

"আবাসিক লেখক" ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। অধ্যাপক হাওয়েল বললেন, "এটা ইদানীং আরম্ভ হয়েছে। বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতনামা প্রতিভাবান লেখকদের নিমন্ত্রণ করছেন ক্যাম্পাসে এসে কিছুদিন থাকবার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের কিছু সম্মানমূল্য দেন, থাকার সুবিধে ছাড়াও লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়। লেখক

তাঁর নিজের কাজকর্ম নিয়েই ডুবে থাকেন। তবে মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং কখনও কখনও নিজের পছন্দমত কোনো বিষয়ে সন্ধ্যাবেলায় বক্তৃতা দেন। এইসব বক্তৃতায় অনেক সময় বসবার জায়গা পাওয়া যায় না।”

হাওয়েল বললেন, “এইভাবে বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ হওয়ার ফলে ছাত্ররা লাভবান হন। কারণ আমরা দেখেছি পেশাদার অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচকদের সান্নিধ্যে সাহিত্যের সব রসটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়— যে গাছে ফল ফলে তার সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকলে অনেক সুবিধে। আবাসিক লেখকদের আমরা যথেষ্ট সম্মান দিই। তাঁরা কেউ আসেন ছ'মাসের জন্যে, কেউ এক বছরের জন্যে। ক্যাম্পাসের শান্ত পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরাও খুশী হন, অনেকে নতুন লেখার বিষয় পেয়ে যান।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ছাত্র-শিক্ষকের সহজ সম্পর্কটা যে কোনো নবাগতের নজরে পড়ে যায়। হাওয়েল বললেন, “কে যে অধ্যাপক এবং কে যে ছাত্র, তা অনেক সময় বুঝতে পারবে না। কারণ আমাদের এখানে অনেক বয়সী ছাত্র আছেন। তাঁরা প্রথম জীবনে কাজ কর্ম করে টাকা জমিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন।”

ক্লাশরুমেও পূর্ণ স্বাধীনতা। এক ক্লাশ থেকে আর এক ক্লাসে যাবার আগে এক যুবক তার বান্ধবীকে চুম্বন করলো; কিন্তু সেদিকে অন্য কারও নজর নেই।

প্রফেসর হাওয়েল আমাকে নিয়ে একটা ক্লাসে ঢুকলেন। একজন ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। “ইনি তোমাদের ক্লাসটা করবেন, তারপর ওঁকে আমার ঘরে পৌঁছে দিও।”

ছাত্রী বললেন, “আমার নাম পলিন। তুমি আমার পাশে বসো।”

পলিন এবার সোজা জিজ্ঞেস করে বসলো, ‘তোমার বিষয় নিশ্চয় স্ট্যাটিসটিকস?”

বললাম, “মোটেই নয়। অঙ্কে তিরিশের বেশী কখনও পাইনি।”

পলিন বললো, “একটু ভরসা পাচ্ছি—ইণ্ডিয়ান অথচ অঙ্কে কাঁচা তাহলে সম্ভব। আমার বয়ফ্রেণ্ড স্ট্যাটিসটিকস পড়ে। ভারতীয় দেখলেই

সে তো কমপ্লেক্সে ভোগে ; বলে, আমাদের ক্লাসে দু'জন ইণ্ডিয়ান রয়েছে, সুতরাং আমি আর কি রেজাল্ট করবো ?"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা যে-যার সীটে বসে পড়েছে। কেউ-কেউ কফির কাপ হাতে ক্লাসে ঢুকলো। অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকেই বললেন, "আমার সিগারেট ফেলে এসেছি। তোমরা যদি কেউ একটা সিগারেট দাও।" সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন জন ছেলে সিগারেট এগিয়ে দিলো।

সিগারেট ধরিয়ে, টেবিলের ওপর ঘোড়ায় চড়ার মত বসে দুলতে-দুলতে পড়ানো শুরু হলো। অধ্যাপক বললেন, "আজকের যে-বিষয়টা আমাদের পড়বার কথা, সে-সম্বন্ধে কয়েকদিন আগে খুব একটা ভাল বই পড়লাম। আমি একটা চ্যাপ্টার তোমাদের জন্যে টাইপ করে, সাইক্লোস্টাইল করে ফেলেছি। তোমরা কেউ কিছু ইণ্টারেষ্টিং পেলে নাকি ?"

অর্থাৎ ক্লাস লেকচার মানে মোটেই বক্তৃতা নয়। স্রেফ আলোচনা, যাতে ছাত্রছাত্রীরা পুরোপুরি অংশ নিচ্ছে এবং তাদের মতামত দিচ্ছে। কথা বলবার সময় ছেলেরা সীটে বসে থাকছে।

অধ্যাপক বললেন, "এর পরের দিনের বিষয় সম্বন্ধে আমি একটা বইয়ের লিস্ট টাইপ করে রেখেছি। তোমরা যাবার সময় এই টেবিল থেকে নিয়ে যাবে আর তোমাদের এবারকার মতামতটা আমি লিখিত ভাবে চাই। তোমরা প্রবন্ধ লিখে ৫ই তারিখের মধ্যে আমার বাক্সে ফেলে দেবে।"

একঘণ্টার ক্লাস কোথা দিয়ে কেটে গেলো। একটা জিনিস সহজেই বোঝা যায়, এখানে মুখস্থ করবার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয়। স্বাধীন চিন্তা করবার ক্ষমতা যাতে বিকশিত হয়, তার জন্যেই মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। প্রফেসর হাওয়েলের কাছে রবার্ট হাচিন-এর একটি চমৎকার উদ্ধৃতি পেয়েছিলাম: "*Freedom of inquiry, freedom of discussion, freedom of teaching—without these a university cannot exist···The university exists only to find and to communicate the truth. If it cannot do that it is no longer a university.*

ক্লাসের শেষে পলিন আমাকে নিয়ে বেরুলো। প্রফেসর হাওয়েলের অফিসে যাবার পথে সে বললো, "সেশনের শুরুতেই আমাদের টাইপ-করা

প্রোগ্রাম দিয়ে দেওয়া হয়, কোন্ তারিখের কোন ঘন্টায় কোন্ চ্যাপ্টার পড়ানো হবে। আর ক্লাসটা কিছুই নয়, প্রতি ঘন্টা ক্লাসের জন্যে আমাকে অন্ততঃ চার-ঘন্টা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে হয়। এত চাপ যে পাগল হয়ে যেতে হয়।"

হাওয়েলের কাছে শুনলাম, এরই মধ্যে শনি-রবিবারে ডেটিং করতে হয়। কারণ শুধু পড়াশোনায় ভাল হলে কেউ ভাল বলবে না; পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ভবিষ্যতের স্বামী অথবা স্ত্রীর সন্ধান করতে হবে। ছেলে মেয়েদের বিয়ের দুশ্চিন্তা মার্কিন বাবা-মায়ের রাত্রের ঘুম নষ্ট করে না। দায়িত্বটা তাঁরা পুরোপুরি যারা বিয়ে করবে তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছেন। ফলে, শনি-রবিবারে ছেলে-মেয়েদের মেশা-মেশি করাটা পরীক্ষায় পাশের মতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হাওয়েল বললেন, "আর একটা ব্যাপার তোমার ভাল লাগবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জানা-শোনা হয়ে অনেকেই বিয়ে করে ফেলে। তখন অনেক মেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি করে স্বামীর পড়ার খরচ যোগাবার জন্যে! পাশ করে বেরুবার পরে স্বামী চাকরি করবে এবং তখন স্ত্রী আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন নেবে। এই সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী ঠিক করেন কোন বছরে তাঁদের প্রথম সন্তান হবে।

হাওয়েল এবার আমাকে অধ্যাপক ডঃ গায় জনসনের কাছে নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক জনসন সাদা-কালো সমস্যার একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। এ-বিষয়ে বহু বই লিখেছেন। আমাকে দেখেই বৃদ্ধ ডঃ জনসন বললেন "আমাকে ক্ষমা করবেন। ঘরখানার কী অবস্থা হয়ে রয়েছে! সত্যি আমি লজ্জাবোধ করছি।"

দেওয়ালে, মেঝেয়, টেবিলে স্তূপীকৃত বই। টেবিলের কোণে একটা ছোট টাইপরাইটার বসানো রয়েছে। তপস্যাশীর্ণ দেহ ডঃ জনসনের। চোখদুটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। ডঃ জনসন আমাকে এক কাপ কফি এগিয়ে দিয়ে বললেন "যৌবনে আমার স্ত্রীকে বলতাম, কাজ-কর্ম একটু গুছিয়ে নিই, তারপর দুজনে খুব হৈ-হৈ করবো। কিন্তু কাজ-কর্ম গুছোতে গুছোতে কখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি।"

ডঃ জনসন বললেন, "আমার স্ত্রীকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না, ক্লাস

নেওয়াটা একজন অধ্যাপকের কাজের একশোভাগের দশভাগ মাত্র। আসল কাজ হল জ্ঞানান্বেষণ। পৃথিবীর সব অধ্যাপকরা যদি ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি চলে যেতে আরম্ভ করেন, তাহলে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে।"

নিগ্রো-সমস্যা সম্পর্কে ডঃ জনসনের সহানুভূতি সর্বজনবিদিত। বললেন, "অনেকদিন থেকেই দেশের মানুষদের চোখ খোলবার চেষ্টা করছি। এমন সময় গিয়েছে যখন এর জন্যে যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। আমার কর্মজীবনের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা আমাকে চাকরি থেকে তাড়াবারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যাঁরা চালান তাঁরা আমাকে সহ্য করেছেন, বলেছেন—স্বাধীন চিন্তার সুযোগ না থাকলে নূতন ভাবধারার জন্ম হবে কেমন করে।"

ডঃ জনসন বললেন, "সমস্ত পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কেমন করে আমরা এই সমস্যা সমাধান করি। সমস্যা থাকাটা কিছু অন্যায় নয়, কিন্তু অপরাধ হল তার সমাধানের চেষ্টা না করা।"

"সাদা-কালো সমস্যাটা কালোর ওপরে সাদার অত্যাচারের মত সহজ হলে ভাল হতো। কিন্তু এর সঙ্গে ইতিহাস, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞানী জট পাকিয়ে এক বিচিত্র সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে।" ডঃ জনসন তাঁর মতামত আমাকে জানাচ্ছিলেন।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে তিনি অনেকগুলো চিঠি সই করে ফেললেন। বললেন, "পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা বিষয়ে চিঠি আসে, আমার নিজের কাজের জন্যেও চিঠি লিখতে হয়। ইংরেজদের কাছ থেকে এই বদ অভ্যাসটা আমরাও পেয়েছি—চিঠি পেলে তার উত্তর দিতেই হবে।"

নিগ্রো-সমস্যা সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে ডঃ জনসন নিজের কার্ড ইনডেক্সের কাছে এগিয়ে এক একটি কার্ড বার করে বলতে লাগলেন: "তুমি যা বলতে চাইছো সে বিষয়ে ১৯৬২ সালে ৬ই জুন নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সোসিয়লজি মার্চ সংখ্যাটাও দেখতে পারো।" এ দেশের সর্বত্র মেথড। স্মৃতিশক্তির ওপর সর্বদা নির্ভর করে এঁরা অযথা শক্তির অপচয় করেন না। কার্ড ইনডেক্সের মাধ্যমে সমস্ত খবরাখবর নখাগ্রে রাখেন মার্কিন অধ্যাপকরা।

ডঃ জনসন এরই মধ্যে আমার কফির কাপটা নিয়ে ধুয়ে ফেললেন।

তারপর একটা ঝাড়ন নিয়ে কয়েকটা বই ঝাড়তে লাগলেন। আর বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন, "কিছু বই হাতের গোড়ায় না থাকলে কাজ-কর্মের অসুবিধে হয়, তাই বাধ্য হয়েই এই অবস্থা। মেঝের বইগুলো পড়া শেষ করে ফেলেছি, ওগুলো এবার ফেরত পাঠিয়ে দেবো।"

ডঃ গায় জনসনের ঘর থেকে বেরিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ হ্যালোওয়েল পোপের কাছে আমার যাবার কথা ছিল। দেখলাম, একটা ঘরের বাইরে কার্ডে লেখা 'দি ভ্যাটিকান'।

ডঃ পোপ আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। তরুণ সুপুরুষ অধ্যাপক আমাকে বসতে বললেন। এঁর ঘরেও শুধু বই আর বই।

বললাম, "একটা জিনিস বুঝলাম না, ঘরের বাইরে কেন 'ভ্যাটিকান' লেখা রয়েছে?"

"সে কী!" আকাশ থেকে পড়লেন অধ্যাপক। তারপর দ্রুত বাইরে গিয়ে কার্ডটা দেখে বললেন, "কোনো দুষ্টু ছাত্রের কাজ। যেহেতু আমার নাম পোপ, সেই হেতু আমার ঘর পোপের রাজপ্রাসাদ ভ্যাটিকান।"

পাশের ঘরের অধ্যাপকের দরজায় যে-কার্ডটা রয়েছে সেটা পড়তে বললেন আমাকে। সেখানে লেখা, "এই ঘরের অধিবাসীটির ধারণা পৃথিবীর যত জ্ঞান সব তাঁর মগজেই আছে।"

ডঃ পোপ দেখলাম বিরক্ত হলেন না। "ছেলেরা এই সব মজা করেই থাকে। রাগ করলে পড়ানো যাবে না।"

অত্যন্ত আমুদে ভদ্রলোক এই ডঃ পোপ। বললাম, "তিরিশে পড়বার আগেই অধ্যাপক হয়ে বসেছেন, সারাজীবন করবেন কী?"

হেসে উঠলেন পোপ, "যা বলেছেন। সারা জীবন খেটে মরতে হবে, অথচ উন্নতি হবে না।"

শুনেছিলাম, আজকের যুগের আমেরিকানদের জানবার সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায় হলো মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানী ও অ্যানথ্রপলজিস্টদের কয়েকটা বই পড়ে ফেলা। নিজেদের ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং সামাজিক এমন কোনো বিষয় নেই যে-বিষয়ে মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান না চালাচ্ছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলে মাঝে মাঝে সমাজে বোমা ফেটে পড়ে—চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। যেমন ধরুন কীনসে

রিপোর্ট। ইনি মার্কিন দেশের যৌন সম্পর্কের বিষয়ে যে অনুসন্ধান করেছেন, তা নিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে এখন হৈ-চৈ।

ডঃ পোপ বললেন, "আমাদের দেশ সম্বন্ধে বাইরে যে এতো কুৎসা রটে তার অন্যতম কারণ আমরা আমাদের জীবনের কোনোদিক গোপন রাখি না। কত জন যৌন ব্যাধিতে ভুগছেন, কত জন বিবাহের পূর্বেই যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, কত জন বিবাহের পূর্বেই মা হচ্ছে—এসব সংখ্যা আপনি বই খুললেই পেয়ে যাবেন। জাত হিসেবে নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি, পৃথিবীর খুব কম দেশই বোধহয় নিজেদের সম্বন্ধে তা দাবি করতে পারেন।"

যে সব বিষয়ে ডঃ পোপের খ্যাতি স্বীকৃত, তার মধ্যে একটি হলো মার্কিন সমাজে প্রাক্-বৈবাহিক যৌন-অভিজ্ঞতা। এ-বিষয়ে সম্প্রতি যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সে সম্বন্ধে ডঃ পোপ আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। কৌমার্য ও কুমারীত্ব সম্বন্ধে সমাজের চিন্তাধারা পাল্টাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করছেন ডঃ পোপ।

ডঃ পোপ বললেন, "আপনাদের দেশে মধ্যবিত্তরা সাধারণ ভাবে তাঁদের দেহে পবিত্রতা যেভাবে বজায় রাখেন সেটা এদেশে অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য। ডেটিং-এর মাধ্যমে বিয়ে ঠিক করার ব্যবস্থাটাই এমন যে বিয়ের আগে যৌন-সম্ভোগ প্রায়ই হয়। কিন্তু তা বলে যাঁরা প্রচার করেন, কুমারীত্ব জিনিসটা এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁরাও ঠিক নন।"

"কিছু উদাহরণ দিন", বললাম ডঃ পোপকে।

ডঃ পোপ বললেন, "১৯০০ সালের আগে যেসব বিবাহিত মহিলাদের জন্ম, তাঁদের মধ্যে এক সমীক্ষা চালানো হয়। দেখা যায়, তখনই শতকরা ২৭ জন মহিলা বিবাহের পূর্বে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ১৯০০-১৯১০-এর মধ্যে যাঁদের জন্ম তাঁদের মধ্যে শতকরা ৫১ জন বিয়ের পূর্বে অভিজ্ঞ হন, তবে মাত্র শতকরা ৬ জন হবু স্বামী ছাড়া অন্য কারও শয্যাসঙ্গিনী হন। এই হিসেবের ওপর নির্ভর করে জনৈক সমাজবিজ্ঞানী দ্বিতীয় যুদ্ধের কিছু আগে ভবিষ্যৎবাণী করেন যে ১৯৪০ সালের পরে যে-সব মেয়ে জন্মাবে তাদের কেউই বিবাহের সময় কুমারী থাকবে না।"

ডঃ পোপ বললেন, "কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজে সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নানা ব্যবস্থা সত্ত্বেও অবৈধ সন্তানের জন্ম ও আরও নানা ভয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে বিবাহ-পূর্ব মিলনে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। ১৯৪০ সালে এরম্যান কিছু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক সমীক্ষা চালান। তিনি দেখেন, শতকরা ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী মনে করে যে কুমারী অবস্থায় প্রেমাস্পদের সঙ্গে দেহ-সম্ভোগ অন্যায় নয়। আর দশভাগেরও কম প্রেম না হলেও স্বল্প-পরিচিতের সঙ্গে মিলতে অরাজী নয়। ১৯৫৯ সালে ভার্জিনিয়ার কলেজে সমীক্ষায় দেখা যায় যে, শতকরা মাত্র চারজন মেয়ে এই মতবাদে বিশ্বাসী। আর ১৯৬০ সালে জাতীয় স্যামপল সার্ভেতে দেখা যায় যে, দশভাগেরও কম মেয়ে বিবাহের পূর্বে যৌন-সম্ভোগ ন্যায়সঙ্গত মনে করে।”

ডঃ পোপ বললেন, “আমরা যা দেখছি তাতে এমন একটা সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যে কিছুদিন পরে বিবাহের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নরনারীর মধ্যে দৈহিক মিলন প্রকাশ্যে স্বীকৃত হবে। ডেনমার্কে এইরকম একটা রীতি অনেকদিন ধরে চলে আসছে।”

আমার দিকে তাকিয়ে ডঃ পোপ বললেন, “আমরা সমাজ-বিজ্ঞানী, সমাজের ছবি সমাজের সামনে তুলে ধরছি। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের ওপর নেই। যেমন ধরুন চার্চের অনেকে অভিযোগ করেন যে, প্রকাশ্যে ‘পেটিং’ (আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি) করাকে নীতিবাগিশরাও আর অন্যায় মনে করেন না। এককালে ‘পেটিং’ অসামাজিক ছিল। এখন অত্যন্ত গোঁড়া ঘরের মেয়েরাও এতে আপত্তি করেন না। ফলে যাঁরা বিবাহপূর্ব মিলনে বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও কেবল ‘টেকনিক্যাল ভার্জিন’ থেকে যান।”

একটু থেমে ডঃ পোপ বললেন, ‘সমস্যাটা কোথায় জানেন? প্রাক্-বৈবাহিক যৌন-মিলন সম্বন্ধে মতামত যাই হোক, অবিবাহিতা মাতার সন্তানকে আমরা সামাজিক স্বীকৃতি দিতে রাজী নই। নানারকম সাবধানতা সত্ত্বেও জারজ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ওহিয়ো রাজ্যের প্রথম সন্তান জন্মের এক সমীক্ষায় দেখলাম, শতকরা একুশ জন মা বিবাহের পূর্বেই গর্ভবতী হয়েছিল।”

ডঃ পোপ বললেন, “জারজ সন্তান নিয়ে আরও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতো, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বহু আমেরিকান পরিবার দত্তক নেবার

জন্যে ব্যাকুল। প্রতিটি বাচ্চার জন্যে দশ জোড়া দম্পতি আবেদন করেন। তবে ইদানীং একটু চিন্তার কারণ দেখা দিচ্ছে। কারণ দত্তক গ্রহণের জন্যে আবেদনের সংখ্যা কমছে।"

ডঃ পোপ এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার একটা ক্লাস রয়েছে।"

ওঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। উনি হাসতে হাসতে বললেন, "শিল্প-বিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক জীবনেও নানা সমস্যা আসবে। তবে আপনারা বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় একটা সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন—সুতরাং নতুন ও পুরাতনের সমন্বয়ে যা ন্যায়সঙ্গত তাই গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন আপনারা। শুধু এইটা মনে রাখবেন, অনেক সমাজে গোপনে গোপনে কী হচ্ছে তার খোঁজ রাখা হয় না—সেটা মোটেই নিরাপদ নয়। আপনাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের বিরাট সুযোগ পড়ে রয়েছে।"

ডঃ পোপ এবার কাগজপত্র হাতে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। বললেন, "যদি কখনও ভারতবর্ষে যাই যেন দেখা হয়।"

মার্কিন পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যা বললাম তা নতুন কিছু নয়, কিন্তু যে নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের দেশকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা আমার মনকে পরম শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দিয়েছিল।

দুপুরবেলায় প্রফেসর হাওয়েল আমাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেলেন। সেখানে লাইন দিয়ে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমরাও খাবার নিলাম। যে টেবিলে বসলাম, সেখানে এক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হলো। ইনি ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে কাজ করছেন। কিছুদিন দক্ষিণ ভারতের গ্রামে কাটিয়ে এসেছেন, আবার যাবেন ভারতবর্ষে; মনে হলো, ভারতের বিরাট বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের বুদ্ধিজীবিরা তেমন সচেতন নন বলে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন।

একটু পরে আর একজন এলেন; অধ্যাপক ও ঔপন্যাসিক ম্যাক্স ষ্টীল—ইনি সৃষ্টিশীল সাহিত্য বিভাগের প্রধান। বললেন, "আমাদের বিভাগে ছাত্ররা গল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখে। ট্রেনিং দিয়ে কোনো লেখক তৈরি করা যায় না সত্যি কথা, কিন্তু আমাদের এইটুকু বিশ্বাস, নিজে

লেখার চেষ্টা করলে ভাল পাঠক হওয়া যায়। লেখকের জুতোয় একবার পা না গলালে সমালোচকের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় না।"

প্রফেসর হাওয়েল লাঞ্চের পর বিদায় দিলেন। যাবার আগে বললেন, "প্রফেসর ষ্টীল তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন সন্ধ্যাবেলায়। ওইখানেই তুমি ডিনার খাবে। তারপর উনিই তোমাকে নরম্যান কর‍উইন-এর বক্তৃতা শোনাতে নিয়ে আসবেন।" একটু থামলেন হাওয়েল, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, তোমাকে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার বাড়ি বড়ো আগোছালো। আমার স্ত্রী কয়েকমাস হল মৃত।" আমি চমকে উঠে বৃদ্ধ সদাপ্রসন্ন হাওয়েলের দিকে তাকালাম। উনি কিছুই খেয়াল করলেন না। বললেন, "আমি চলি, ইথিওপিয়া থেকে দুটি ছাত্র এসেছে। তাদের কম্বল নেই—আমার বাড়ির বাড়তি কম্বল দুটো অফিস থেকে ওদের নিয়ে যেতে বলেছি।"

॥ ৫ ॥

"এই দেশে হাওয়েলের মত অনেক মানুষ পাবেন," বলেছিলেন খ্যাতনামা সংখ্যাতত্ত্ববিদ রাজচন্দ্র বসু।

রাজচন্দ্র বসুর সঙ্গে আলাপ হলো ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতার পর। ভারতীয় ছাত্রদের বলছিলাম, "বিদেশে আপনারা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন দেখে আমার আনন্দের সীমা নেই। 'নেই-নেই, পারি-না পারি-না, হচ্ছে-না হচ্ছে-না হতাশার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে আপনাদের মধ্যে আশার আলো দেখছি।" তারপর দেশের হাল আমলের খবর, দেশের সাহিত্যের সমস্যা সম্পর্কে কিছু কথা বলে যখন বসে পড়লাম তখন খ্যাতনামা অধ্যাপক বসু আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, "একদিন রাত্রে ডাল-ভাত খেতে আসতেই হবে।"

ডাল-ভাত খেতে গিয়েই গল্প হচ্ছিল। ওঁকে হাওয়েলের কথা শোনাতেই বললেন, "এখানে কত জনের স্নেহ যে পেয়েছি সে আপনাকে কী বলবো!"

"কিন্তু সে কথা থাক, আপনার বক্তৃতা সেদিন আমার খুব ভাল লেগেছিল। আপনি বললেন, জীবনে দুঃখ কষ্ট সমস্যা থাকবে, তার মধ্যেই আনন্দের আয়োজনে ভাগ বস'তে হবে, আমাদের এমনভাবে কাজ

করতে হবে যাতে অনাগত উত্তরপুরুষের কাছে আমরা ছোট হয়ে না যাই।"

এবার তুলসীদাসের এক দোঁহা সুর করে গাইতে লাগলেন রাজচন্দ্র বসু। তুলসী বলছেন, "যখন তুমি এই পৃথিবীতে এসেছিলে তখন সবাই হেসেছিল আর তুমি কেঁদেছিলে, তুমি এমন কাজ করো যাতে যখন তুমি চলে যাবে তখন তুমিই কেবল হাসবে, আর সবাই কাঁদবে।"

রাজচন্দ্র বসু ষাট পেরিয়েছেন। সানফ্রানসিসকো থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত মার্কিন পণ্ডিত মহলে তাঁর প্রচণ্ড খ্যাতি। স্ট্যাটিসটিকস সংক্রান্ত বইয়ের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে তাঁর নাম এসে যায়। কিন্তু ঘরে রবীন্দ্রনাথের বই ঠাসা। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি—হুড়হুড় করে কবীর, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস থেকে মুখস্থ বলে যেতে পারেন।

রাজচন্দ্র এখন আমেরিকান নাগরিক, কিন্তু পাসপোর্টের রঙ পাল্টালেও বাংলার সংস্কৃতিকে ভুলতে পারেননি। খাঁটি বাঙালীই রয়ে গেলেন নানা দিক দিয়ে।

বহুদিন পরে জন্মভূমির এক ভ্রাম্যমাণ লেখকের সান্নিধ্য লাভ করে রাজচন্দ্র সেদিন নিজের মন খুলে দিয়েছিলেন। বলছিলেন নিজের প্রথম জীবনের কথা। "আইনতঃ আমি স্ট্যাটিসটিকসের লোক নই—কারণ অঙ্ক নিয়ে এম এ পাস করেছিলাম কলকাতা থেকে। তারপর আশুতোষ কলেজে আশি টাকা মাইনের অধ্যাপনা করতাম, আর থাকতাম এক মেসে। পরীক্ষায় খুব ভাল করেছিলাম, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি যোগাড় করতে পারলাম না—প্রতিবারই তদ্বিরের জয় হলো। শেষে রিসার্চ করছিলাম। একদিন ডঃ মেঘনাদ সাহার বাড়িতে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, কী করছো? বললাম, কতকগুলো অঙ্কের জ্যামিতিক সমাধান নিয়ে থিসিস তৈরি করছি।"

"সেইদিন ওই পর্যন্ত কথা হয়েছিল। সেই সময় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ভারতীয় স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট খুলছেন। ডঃ সাহার সঙ্গে গল্প করতে এসে প্রশান্তচন্দ্র একদিন বললেন জ্যামিতি জানা একটা ভাল লোকের সন্ধান করছি। ডঃ সাহা বললেন, একটি ছেলে এসেছিল কিছুদিন আগে। সে বলছিল ঐ বিষয়ে কাজ করছে।

"একদিন প্রশান্তচন্দ্র আমার মেসে হাজির। বললেন, চলো আমার আই-এস-আইতে।" বললাম, আমি স্ট্যাটিসটিকসের কিছুই জানি না। উনি বললেন, কোনো অসুবিধে হবে না, সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেব'খন।"

"কয়েক টাকা মাইনে বেশি হলো, আর চলে এলাম আই-এস-আইতে। এখানে কয়েকমাস কাজ করেছি। প্রায়ই প্রশান্তচন্দ্রকে বলি, কই আমাকে স্ট্যাটিসটিকস শেখালেন না? উনি বলেন, হবে হবে, এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?"

"পুজোর ছুটিতে সেবার সস্ত্রীক দার্জিলিং যাওয়া হলো। প্রশান্তচন্দ্র ইনস্টিটিউটের বড়োবাবুকে বললেন, অমুক অমুক বইগুলো আমাদের সঙ্গে দার্জিলিংয়ে যাবে। দার্জিলিংয়ে উনি বইগুলোর কয়েকটা পরিচ্ছেদ মার্কা করে দিলেন। বললেন, এইগুলো পড়ে ফেলো, তাহলেই তুমি স্ট্যাটিসটিসিয়ান হয়ে যাবে।"

"সুতরাং আইনতঃ আমি একজন হাতুড়ে স্ট্যাটিসটিসিয়ান", হাসতে হাসতে বললেন রাজচন্দ্র বসু।

তারও অনেকদিন পরে একজন আমেরিকান অধ্যাপক ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে বরানগরে স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। তিনিই দু'জন বাঙালী অধ্যাপককে—সমর রায় ও রাজচন্দ্র বসুকে—মার্কিন দেশে নিয়ে এসেছিলেন।

এরাই নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাটিসটিকসের গোড়াপত্তন করেন। অধ্যাপক সমর রায় কিছুদিন আগে চ্যাপেল হিল-এ দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওখানেই রয়ে গিয়েছেন।

"মিসেস রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন রাজচন্দ্র।

বললাম, "আলাপ হয়েছে! দু'দিন রাত্রে ওঁদের বাড়িতে গিয়ে প্রাণভরে গল্প করেছি। অতি চমৎকার পরিবার। যে-ছেলেটি ডাক্তারি পড়ে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছে।"

"ওঁদের বড়োছেলে রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এর মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়েছে," বললেন রাজচন্দ্র।

রাজচন্দ্র এবার নিজের কথায় ফিরে এলেন। "ছোটবেলা থেকেই দেশ-ভ্রমণের নেশা ছিল—আমার গৃহিণীরও ওই রোগ আছে। দুজনে থার্ড ক্লাসে ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছি। হোটেলের খরচ বাঁচাবার জন্যে

সারাদিন ঘুরে রাত্রে ট্রেনে চেপে বসেছি। দেশ দেখবার লোভেই এখানে এসেছিলাম প্রথমে। তারপর বুঝলাম, এখানে কাজের অনন্ত সুযোগ।"

"গুণের সমাদরে এদের জোড়া নেই, বুঝলে ভাই," বললেন রাজচন্দ্র।

বিদেশে ক্রমে ক্রমে অনেক উন্নতি করলেন রাজচন্দ্র। কিন্তু অন্য অসুবিধাও দেখা দিলো। দেশরক্ষাসংক্রান্ত গোপনীয় কাজকর্ম মার্কিন নাগরিক ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়াও সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান নাগরিক হয়ে গেলেন কলকাতা আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক রাজচন্দ্র বসু।

রাজচন্দ্র বললেন, "পরিবেশ যে মানুষকে কতখানি পাল্টে দেয় তার প্রমাণ আমি নিজে। কর্মজীবনের প্রথম অর্ধেক ভাগে কলকাতায় বসে যা করেছি, এখানকার বাকি অর্ধেকে তার থেকে পাঁচ ছ'গুণ কাজ করেছি।"

"ভারতবর্ষে প্রথম জীবনে খেটেখুটে কেউ একটা কাজ করে, তারপর সেইটা ভাঙিয়েই বাকি জীবন চলে। এখানে তার উপায় নেই। কবে তুমি কী থিয়োরি আবিষ্কার করেছ বলে এখন বসে বসে সময় নষ্ট করবে, তা চলবে না।"

কাজকে প্রাণাধিক ভালবাসেন রাজচন্দ্র। নিত্য নতুন গবেষণায় এখনও তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ।

রাজচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে আপনার কী কী জিনিস চোখে পড়লো?"

বললাম, "এত অল্প সময়ের মধ্যে এতবড়ো দেশকে বোঝবার মত স্পর্ধা নেই। কোনো দেশ সম্বন্ধে একটা ঢালাও মন্তব্য করতেও আমার মন চায় না। তবে এই প্রথম দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশে পা দিয়ে বুঝলাম – মানুষের একটা দাম আছে। অভাব অনটন দুর্ভিক্ষ বেকার সমস্যার মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে এতদিন ভাবতাম মানুষ আসলে একটা বোঝা, খাতায়-কলমে যাই বলি, আসলে তার কোনো দাম নেই।"

আমার মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে, আমাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছিলেন রাজচন্দ্র বসু। সাহস পেয়ে আমি বললাম, "অন্য মানুষের দাম আছে বলেই এখানে প্রত্যেক মানুষকে খাটতে হয়। আর এই সভ্যতার আদর্শ-বাদের দিকটা দেখতে হলে নর্থ ক্যারোলিনার মত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হয়।"

রাজচন্দ্র বললেন, 'আমি অঙ্কের মানুষ—অ্যাভারেজ কথাটার ওপর

জোর দিই। ছোটবেলায় যে-ভারতবর্ষে মানুষ হয়েছি - সেখানে বড়কে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। সবচেয়ে বড়ো রাজা, সবচেয়ে বড়ো কবি, সবচেয়ে বড়ো শিল্পী, সবচেয়ে মহান জন-নেতা, সবচেয়ে বড়ো অধ্যাপক, সবচেয়ে বড়ো কলেজ, সবচেয়ে ভাল ছাত্র – এই নিয়েই আমরা মাথা ঘামাতাম! এখন জিনিসটা ভাল লাগে না। এখন জানতে ইচ্ছে করে সাধারণ স্তরটা কেমন বলো। কিছুদিন আগে শুনলাম, আমার এক শুভানুধ্যায়ী ভারতবর্ষে বলেছেন —'দেশে থাকলে রাজচন্দ্র নিজের প্রফেশনের চূড়ায় উঠতে পারতো।' আমি শুনে বলেছি—আমি যে-দেশে আছি সেখানে পর্বতশৃঙ্গ নেই—কিন্তু একটা উঁচু মালভূমির ওপর অন্য অনেকের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে আছি।"

রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে সেদিন আমার দৃষ্টি উন্মীলিত হতে আরম্ভ করেছিল। সত্যি, চূড়োর দিকেই নজর আমাদের, সেই নিয়েই আমাদের মাতামাতি—সাধারণ গোল্লায় যাক, তাদের সম্বন্ধে ভাববার মত সময় আমাদের নেই।

রাজচন্দ্রকে বললাম, 'বিদেশ-ভ্রমণে এসে মার্কিনমুলুক কতখানি আবিষ্কার করছি জানি না, কিন্তু নিজের দেশের ছবিটা ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।"

"ঈশ্বর আপনার দৃষ্টিকে আরও স্বচ্ছ করে তুলুন," এই আশীর্বাদ করে আমাকে তিনি বিদায় দিয়েছিলেন।

রাজচন্দ্রের বাসা থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোয় স্নান করা চ্যাপেল হিলকে দেখছিলাম। অধ্যাপক হাওয়েলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল— "এমন সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে খুব কম পাবেন। চ্যাপেল হিল-প্রেমিক এক কবি লিখেছিলেন—জীবনে অন্তত শতরমণীকে ভালবেসেছি আমি, কিন্তু আমার ভালবাসার শহর একটিই—তার নাম চ্যাপেল হিল।"

চ্যাপেল হিলকে আমিও যেন আমার অজান্তে কখন ভালবাসতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু আমার বিদায়-মুহূর্ত আগত। আগামীকাল ভোরেই আমাকে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে নিউ ইয়র্কের পথে।

পরের দিন ভোরে চ্যাপেল হিল থেকে বিদায় নেবার আগে, মনে মনে লুইস কার্নাহানকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ওঁর জবরদস্তিতে চ্যাপেল হিল-এর প্রকৃতি, বিশ্ববিদ্যালয় আর মানুষগুলোকে দেখা হলো। এসব না দেখলে আমার বিদেশ ভ্রমণ এবং আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

নিউ ইয়র্কের পথে

চ্যাপেল হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে সংখ্যাতত্ত্বের উদীয়মান অধ্যাপক শ্রীসেনের গাড়ির এক কোণে বসে পুরনো কথাগুলো ভাবছিলাম। সেন-গৃহিণী বললেন "কী এত ভাবছেন, শংকরবাবু?"

"ভাবছি, বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন আগে যে কথাটা কৌতুকচ্ছলে লিখেছিলেন, তা আজও মিথ্যে হয়নি। বিদেশে বাঙালী মাত্রই সজ্জন। জীবনে এই প্রথম দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে কত যে মাতৃভাষীর সঙ্গে আলাপ হল এবং তাঁরা যেভাবে আমাকে আপন করে নিলেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

অধ্যাপক সেন সরল সোজা মানুষ। বললেন, "বিদেশে বাঙালীর কথাটাও একটু ভাবুন। হয় বিদ্যালাভ অথবা অর্থলাভের জন্যে নিজের দেশ ছেড়ে কোথায় আমরা পড়ে আছি! স্বদেশের মানুষ দেখলে আমাদের একটু আনন্দ হবে না? দেশওয়ালীর সঙ্গে গল্প করে, সময় কাটিয়ে, বাংলায় কথা বলে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে বাংলায় চলে যাই যেখানে সশরীরে যেতে গেলে অন্ততঃপক্ষে হাজার বারো টাকার এরোপ্লেন-ভাড়া লাগে।"

বললাম, "আপনারা সংখ্যাতত্ত্বের পণ্ডিত, বেপাড়া থেকে এসে ধুরন্ধর আমেরিকানদের পর্যন্ত হিসেব শেখাচ্ছেন—আপনার সঙ্গে আমি কী করে কথায় পেরে উঠবো?"

অধ্যাপক সেন বললেন, "আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলুম—বিদেশের যে কোনো জায়গায় অপটিমাম বাঙালীর সংখ্যা আট। এর বেশী হলেই দুর্গাপুজো এবং থিয়েটার এসে পড়বে; এবং দুটি উৎসব কেন্দ্র করে যে-বঙ্গসন্তান ঝগড়া না-পাকায় তার বাঙালীত্ব ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।"

এবার গাড়ি ছাড়লো। সঙ্গে আরও দু'জন বাঙালী বন্ধু আছেন। এঁরা সবাই আমাকে র‍্যালে বিমান-বন্দরে পৌঁছে দেবেন। কোথায়

চ্যাপেল হিল আর কোথায় র‍্যালে! কিন্তু চ্যাপেল হিলবাসীরা শুনলেন না। তাঁরা শুধু আদর যত্ন করলেন তাই নয়—ভোরবেলা অধ্যাপক সেন গাড়ি বার করলেন আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক সেনকে বলেছিলাম, "সমস্ত সপ্তাহ ধরে খাটাখাটি করেন—কেন এই ছুটির দিনের সকালটা আমার জন্যে মাটি করবেন?"

কিন্তু কোনো কথাই চলেনি। ওঁর স্ত্রী বললেন, "জানেন তো জামাইয়ের নামে মেরে হাঁস, বংশ সুদ্ধ খায় মাস! আপনার নাম করে আমরা সবাই আউটিং করতে পারছি এবং তার থেকেও বড়ো কথা, মিসেস দে-র সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছি। জানেন, মিসেস দে-র সঙ্গে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলি—কিন্তু মাঝেমাঝে ওঁকে না দেখলে ভাল লাগে না। ওঁর মধ্যে একটা ব্যাটারি চার্জার আছে—যেন কোনো ঝিমিয়ে-পড়া ইণ্ডিয়ানকে নিজের স্নেহ ও উৎসাহে অণিমাদি আবার চাঙ্গা করে দেন।"

ষ্টিয়ারিং ঘুরোতে-ঘুরোতে মিঃ সেন বললেন, 'মিসেস দে না থাকলে এখানকার বাঙালী গিন্নীদের খুব অসুবিধে হতো। কারণ এঁদের বেশীর ভাগই তো স্বামী গরবে গরবিনী হয়ে বিয়ের পরই পাসপোর্ট হাতে করে এখানে হাজির হন। সংসার ও রান্নাবান্নার কোনো অভিজ্ঞতাই সঙ্গে নিয়ে আসেন না। অথচ বিদেশে কট্টর সায়েব বাঙালীও মাছের ঝোল-ভাত এবং পোস্তচচ্চড়ির জন্য চোখের জল ফেলেন। রসনা পরিতৃপ্তির জন্যেই তো হাজার হাজর মাইল দূর থেকে বউ ইমপোর্ট করা—না হলে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্থানীয় মেমসাহেবরা কী দোষ করলো?''

শ্রীমতী সেন সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে প্রয়োজনীয় ভৎসনা করলেন। কিন্তু বিশেষ ফল হলো না। অধ্যাপক সেন বললেন, 'এই সব কাঁচা মেয়ে পিটিয়ে বউ করবার পবিত্র দায়িত্ব মিসেস দে স্বেচ্ছায় নিয়েছেন।''

র‍্যালের কাছে ডারহামে দে পরিবারের বাস। কর্তা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ওইখানেই গাড়ি থামলো।

ওঁরা আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। অধ্যাপক দে আমাকে স্বাগত জানিয়ে, সেনকে বললেন, "সেই সকাল থেকে মুখ চেয়ে বসে আছি।

ভেবেছিলাম আরও আগে চলে আসবেন। রাস্তায় কোনো অসুবিধে হয়নি তো ?”

অধ্যাপক দে ও তাঁর স্ত্রীকে না দেখলে আমার মার্কিন-ভ্রমণ সত্যিই অসমাপ্ত থেকে যেতো। শ্রীমতী দে দু'তিন শ' বর্গ মাইল বিস্তৃত এক ভূখণ্ডের যতো বাঙালী আছেন তাঁদের পরামর্শদাতা ও গার্জেন। এমন মিষ্টি স্বভাবের মহিলা আজকাল জীবনে তো দূরের কথা, নাটক-নভেলেও পাওয়া যায় না। শ্রীমতী দে আমাদের নিয়ে হৈ হৈ করতে লাগলেন। একজন ভক্ত রসিকতা করে বললেন, “দুই পুত্রকে লালন এবং দাদাকে পালন করেও বৌদি এতো বাড়তি এনার্জি কোথা থেকে পান ?”

বৌদি হাসিমুখে চটপট উত্তর দিলেন, “কেন ? দেশে ফিরে গিয়ে হরলিকসের বিজ্ঞাপন লিখবে নাকি ?”

শ্রীমতী দে আমাদের খুবই আদর-যত্ন করলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এমন আপন করে নিলেন যে, কে বলবে এখানে কয়েক মিনিট আগে এসেছি। মিসেস দে-র ছেলে দুটি পড়াশোনায় খুব ভাল। স্কুলে ও কলেজে যথেষ্ট নাম কিনেছে। কিন্তু মিসেস দে ছেলেদের বলে দিয়েছেন, আমি চাই তোমরা দেশে ফিরে যাবে, সেখানে দেশের যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করবে।”

চা খেতে-খেতে মিস্টার দে বললেন, “এখানে বাড়ি করেছি। এত প্রাচুর্যের মধ্যে আছি—কিন্তু দেশের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। দেশের লোকদের দেখলে দেশের মানুষদের দুঃখের কথাও মনে পড়ে যায়। অনেকে দেখি হতাশ হয়ে পড়েছেন—তাঁদের ধারণা ভারতবর্ষকে দিয়ে আর কিছু হবে না। কথায় না বড়ো হয়ে, কাজে বড়ো হওয়ার চেষ্টা নাকি তেমন দেখা যাচ্ছে না। আমি কিন্তু হতাশ হইনি। আমার ধারণা, আমরা আবার বড়ো হবো—আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে কোনো রকমে জাগাতে পারলেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে।”

আরও কয়েকজন স্থানীয় বাঙালী সস্ত্রীক এলেন দে নিবাসে। এদের সঙ্গে একে-একে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীমতী দে। কেউ ওঁর দেওর, কেউ ভাই, কেউ ভাগ্নে। দে নিবাসে এসে সবাই আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

আড্ডা বেশ জমে উঠলো। এই ঘরের কথাবার্তা শুনলে কে বলবে আমরা স্বদেশ থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে অন্য এক মহাদেশের প্রান্তে বসে আছি।

অধ্যাপক দে বেশী কথা বলেন না, কিন্তু যা বলেন তা যে তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে তা বুঝতে একটুও দেরি হয় না।

চাপা গলায় নিজের সংসারের বিবরণ দিতে-দিতে অধ্যাপক দে আমাকে বললেন, "আমার স্ত্রী সবসময় ছেলে দুটোর কথা চিন্তা করেন। ওঁর ইচ্ছে ওরা যেন ভারতবর্ষের উপযুক্ত হয়ে উঠে। আমাদের এই যে স্বাচ্ছল্য—এটা যে সাময়িক, আমাদের যে আবার ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হবে এবং প্রয়োজন হলে মফস্বলে পৈতৃক বাড়িতে থাকতে হবে যেখানে সবেমাত্র ইলেকট্রিক এসে পৌঁচেছে, তা আমার স্ত্রী প্রায়ই ছেলেদের মনে করিয়ে দেন।"

শ্রীমতী দে আমাকে চা দিতে-দিতে বললেন, "ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে না? বলুন তো?"

একটু থেমে শ্রীমতী দে বললেন, "ভগবানের দয়ায় ছেলে দুটো পড়াশোনায় বেশ ভাল, ইস্কুলে খুব নাম করেছে। সেদিন ওদের হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হলো। ভদ্রলোক বললেন, মিসেস দে, দুটি সত্যি ভাল ছাত্র আমাদের উপহার দেবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। বললাম, মিষ্টার রাইট, আপনার ধন্যবাদের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই—আমার এই আপনাদের উপহার দেবার জন্যে ছেলে দুটিকে আমি লালন করছি না। সময় হলেই এদের আমি ইণ্ডিয়াতে নিয়ে যাবো—সেখানে ওদের আরও বেশী দরকার আছে।"

মিসেস দে এবং তাঁর অতিথিদের সঙ্গে সেদিন কতো মজার কথা হলো। মিসেস দে এরই মধ্যে কয়েকবার টেলিফোন ধরলেন। দু একটা কথাবার্তা যা কানে ভেসে এলো তা এই রকম।

'কে, রমেন কথা বলছো? কী ভাই, ঠিকমত পড়াশোনা হচ্ছে তো? দেখো বাপু, মেমসায়েবদের সঙ্গে ডেট-ফেটে জড়িয়ে পড়ো না—কী বললে? শোনো ছোকরা, এই সব মেমসায়েব শো-কেসে সাজিয়ে

রাখবার পক্ষে খুব ভাল···কিন্তু সংসার করলে হাড়ে দুর্বো গজিয়ে দেবে। যা হোক, সামনের শনিবার রাত্রে ডেট না করে এখানে চলে আসবে, মাছের ঝোল ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন। রাত্রে এখানেই থেকে যাবে—হোল-নাইট আড্ডার ব্যবস্থা করা যাবে।"

আর একটা ফোন, "হ্যালো, কে সুধীর নাকি? শোন, তোমার ওভারকোট চ্যাপেল হিলে কিনো না। এখানকার সেলে এক ডলার সস্তা হবে আমি কিনে, কারুর হাতে পাঠিয়ে দেবো। মনে রেখো ভাই, ডলারগুলো জলে ফেলবার জন্যে নয়। আর ওই চাকরির ব্যাপারে চিন্তা কোরো না—ওখানকার টার্ম শেষ হলেই কাছাকাছি কোনো ইউনিভার্সিটিতে যাতে কিছু পাও তার জন্যে কর্তাকে রোজ তাগাদা লাগিয়ে যাচ্ছি।"

মিসেস দে-র এই মধুর বৌদি ভাবটা খুব ভাল লাগছিল। কানাঘুষায় জানা গেলো বিদেশে বাঙালীদের বিপদ-আপদে সুখে দুঃখে শ্রীমতী দে সব সময় জড়িয়ে আছেন।

আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে কখন যে সময় গড়াতে আরম্ভ করেছে তা বুঝিনি। এরই মধ্যে প্রচুর খাওয়াদাওয়া হয়েছে। শ্রীমতী দে-র রান্নার প্রশংসা করতে-করতে একজন ভদ্রলোক বললেন—"একহাতে খুন্তি অপর হাতে ঝাঁটা, এই হচ্ছে আদর্শ বঙ্গরমণীর মূর্তি।"

অধ্যাপক দে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার উঠতে হয়। শংকরবাবুকে নিশ্চয় তোমরা প্লেন ফেল করাতে চাও না?"

মিসেস দে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, "তোমার সব কিছুতেই তড়িঘড়ি। এখনও সময় রয়েছে। এ তো আর কলকাতার রাস্তা নয় যে, ঘণ্টায় পনেরো মাইলের বেশি যেতে পারবে না।"

ওঁদের বড়ছেলে বললো, 'কিন্তু মা ভুলো না—আজ আমাদের ফুটবল টীম ফিরছে।"

অধ্যাপক দে আঁতকে উঠলেন। "তাই নাকি! সর্বনাশ! তাহলে আর এক মিনিটও দেরি না।"

এতে আঁতকাবার কি আছে, আমি ভাবছিলাম। অধ্যাপক দে জানালেন, "এই ফুটবলের ব্যাপারে আমেরিকান জাতটা সমস্ত পরিমিতি-বোধ হারিয়ে ফেলে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট এয়ারপোর্টে আসুক—

কিছুই ভিড় হবে না। কিন্তু ফুটবল টীম অন্য জায়গায় জিতে নিজের স্টেটে ফিরছে— সে এক এলাহি ব্যাপার। কোনোরকমে ব্রেকফাস্ট গিলে ছেলে বুড়ো সবাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে—দেড়মাইল-দু'মাইল লম্বা ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যাবে।"

আমাদের স্থানীয় বন্ধুরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গেলেন। এক-একটা দল এক-একটা গাড়িতে চড়লেন।

আমাদের গাড়িটা অধ্যাপক দে নিজেই চালাচ্ছেন। রসিকতা করে তিনি বললেন, "স্বদেশ সম্বন্ধে যারা হতাশ হয়ে পড়েছে তাদের আমার ভাল লাগে না। আমার স্ত্রী তো ছেলেদের সব সময় বলছেন—মনে রেখো তোমাদের দেশ খুব গরীব, সেখানেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম: "বিদেশে বসে আপনি ছেলেদের স্বদেশী করবার জন্যে এত চেষ্টা করছেন কেন? আপনার স্বার্থটা কী?"

মিসেস দে হেসে ফেললেন। "ঠিকই আন্দাজ করেছেন। এর পেছনে দেশপ্রেম ছাড়াও নিজের স্বার্থ আছে। এদেশে ছেলেমেয়েরা বুড়ো বাবা-মাকে দেখে না। আমি বাপু বুড়োবয়সে একা থাকতে পারবো না, তাই ছেলেদের নিয়ে ইণ্ডিয়াতে চলে যেতে চাই।"

স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে অধ্যাপক দে বললেন, "কোথায় যেন শুনেছিলাম, ভাগ্যবানরা জাপানে শৈশব, আমেরিকায় যৌবন এবং ভারতবর্ষে বার্ধক্য অতিবাহিত করেন।"

মিসেস দে পরামর্শ দিলেন "এদেশে যখন এসেইছেন, তখন বার্ধক্যের সমস্যাটা একটু খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করবেন। অনেক গল্পের উপাদান পাবেন।"

এরপর তেমন আর কথাবার্তার সুযোগ হয়নি। যা ভয় করা গিয়েছিল তাই হলো। ছুটির দিনে হাজার হাজার গাড়ি এয়ারপোর্টের রাস্তা প্রায় জমাট করে দিয়েছে—তাঁদের প্রিয় ফুটবল দল দেশে ফিরছেন, আর তাঁরা কি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারেন?

এয়ারপোর্টের আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে পদযাত্রা শুরু করতে হলো। ওরা আমাকে এরোপ্লেন কোম্পানির হাতে জমা দিয়ে একে একে বিদায় নিলেন। অধ্যাপক দে বললেন, "কোনো দরকার হলে চিঠিপত্র লিখবেন।"

বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসেই কেমন নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো। এই এতোক্ষণ দেশওয়ালী পরিবৃত হয়ে ছিলাম, আর এখন একা—সত্যিই বিদেশে বাস করছি।

আশেপাশে দু'একজন যাত্রী আমারই মত প্লেনের অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে সেধে আলাপের লোভ সংবরণ করতে হলো। বিদেশ-যাত্রার আগে জনৈক শুভানুধ্যায়ী হাতে একখানা পুস্তিকা ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন—'হোয়াট টু ডু অ্যাণ্ড হোয়াট নট টু ডু ইন আমেরিকা' মার্কিন মুলুকে ভারতীয় মুশাফির কী করতে পারেন এবং কী করতে পারেন না সে সম্বন্ধে নানা গোপন উপদেশে এই বইটি বোঝাই। যেমন, 'থ্যংক ইউ' শব্দদ্বয়ের ঢালাও বিতরণ যে অবশ্যকর্তব্য তা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো মার্কিন গৃহে ডিনারে নিমন্ত্রিত হলে নিজের এঁটো থালা-বাটি মেজে দেবার প্রস্তাব অতিথির সৌজন্যবোধের অঙ্গ। কোনো গৃহে পরিবারে অতিথি হলে—সবচেয়ে অসভ্যতা বাথরুম ভিজে রেখে চলে আসা। আমার বন্ধু জগাকে এটি বলায় সে কিছুই বুঝতে পারলো না। 'পিঁয়াজি রাখো—কথাটার কোনো মানেই হয় না।'—বাথরুম যে ভিজে ছাড়া আর কিছু হয় তা খাঁটি বাঙালী জগার কল্পনাতীত।

আরও দুটি প্রয়োজনীয় উপদেশের কথা মনে পড়লো। কখনও গায়ে পড়ে আলাপ করাটা সুশোভন নয়। দীর্ঘ বাস অথবা প্লেন যাত্রায় তোমার পাশের সীটের যুবতী মহিলা তোমার সঙ্গে মিষ্টি বাক্যালাপ করতে পারেন—কিন্তু মনে রেখো, তার মানেই তিনি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছেন তা নয়। সাধারণ সৌজন্যকে হৃদয়দানের সবুজ নিশানা বলে ভুল করলে পস্তাবে।

বিনা ইনট্রোডাকশনে সায়েবরা যে পরিচিত হতে চান না, তার এক গল্প গিলবার্ট ও সালিভানের ছড়ার বই ব্যাব ব্যালাডস্‌-এ পড়েছিলাম। দু'জন সায়েব জাহাজডুবি হয়ে এক নির্জন দ্বীপে উঠেছেন। দু'জনেই সমুদ্রের ধারে বসে আপন মনে নিজের আত্মীয় বন্ধুদের স্মৃতিচারণ করছেন, বিড় বিড় করে বকছেন—কিন্তু অন্য জনের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। কী করে ওঁরা কথা বলবেন? ওঁদের যে ইনট্রোডিউস করে দেওয়া হয়নি!

লোকমুখে শোনা গিয়েছিল এই গোমড়া সামাজিকতা ইংরেজদের বৈশিষ্ট্য, মার্কিন মুলুকের মানুষরা অনেক সহজ এবং সরল। তবু সাহস হচ্ছিল না, নিজে থেকে কোনো সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ করার। মনের মধ্যে তখন দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছে। একপক্ষ বলছে, "এত লজ্জা কেন? সামান্য ক'দিনের জন্যে এসেছো এখানে। সুতরাং দেশ ও মানুষকে জানবার সুযোগ হারিও না। এমন লাজুক মুখচোরা হয়ে থাকলে চলবে কেন? যাও, এগিয়ে গিয়ে কথা বলো।"

অপর পক্ষ বলছে, "কখনও না। এখনও কি ছেলেমানুষীর বয়স আছে? এখন তুমি একজন প্রৌঢ় ভারতীয়—সেধে আলাপ করতে গিয়ে কেউ যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে শুধু তোমার নয়, পঞ্চাশ কোটি ইণ্ডিয়ানের অপমান—ইন ফ্যাক্ট, ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন ও কালচারের অপমান।"

মনকে বোঝালাম, হঠাৎ আলাপ থেকে অনেক সময় ভাগ্যের মোড় ফিরে যায়। হঠাৎ-আলাপের ফলেই অনেক স্মরণীয় ঘটনা পৃথিবীতে সম্ভব হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথাই ধরা যাক। বিদেশ-বিভূঁইয়ে অপরিচিত স্বামীজীর সঙ্গে ট্রেনে যদি হঠাৎ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের পরিচয় না হতো তাহলে তিনি হয়তো শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে বক্তৃতা দেবার সুযোগই পেতেন না। তার পরবর্তী ঘটনাগুলো সাজিয়ে নেওয়া যাক। সায়েবরা স্বামীজীকে ভাল না বললে, আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে আদর করতাম না। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের সত্যজিৎ রায় ও রবিশঙ্কর পর্যন্ত সকলকেই আগে সায়েবদের সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে, তবে দেশের লোকেরা তাঁদের গলায় বড়ো বড়ো মালা পরাবার ভরসা পেয়েছেন।

মনের এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ গেটের দিকে নজর পড়ে গেলো। দেখলাম এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ট্যাক্সি থেকে নেমে অনেকগুলো মালের চাপে নড়বড় করছেন! কুলি বস্তুটি এদেশে বিরল—নিজে যা বইতে পারবে না তা নিয়ে পথে বেরিও না, এই হল পথের বিধি। বিমান-বন্দরে অবশ্য সুদৃশ্য ঠেলাগাড়ি থাকে। তাতে মাল চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ। হাতের কাছে সেটাও দেখা যাচ্ছে না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ডান

হাতটা একটু দুর্বল মনে হলো। হাতটা মালের চাপে সামান্য কাঁপছে। মাল বওয়া আমার কোনোদিনই অভ্যাস ছিল না—কিন্তু কয়েক সপ্তাহ করেন ট্রেনিংয়ে এখন মুটে হওয়ার ভয় কেটে গিয়েছে। সুতরাং দ্রুতবেগে একটা ঠেলা যোগাড় করে ওঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি?"

সায়েব চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরনির্ভরশীলতায় আন্তরিক অনিচ্ছা। আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সায়েব বললেন, "না না, আমি এই ক'টা মাল নিয়ে যাবার মত শক্তি রাখি। শুধু হঠাৎ ডান হাতটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল।"

আমি বললাম, "আমার মালপত্তর আমার বন্ধুরা এইমাত্র তুলে দিয়ে গেলেন। এখন আপনাকে সাহায্য করবার সুযোগ দিন।"

মালগুলো আমার হাতে তুলে দিতে পেরে ওঁর সত্যিই কষ্টের লাঘব হলো। এয়ার লাইনস কাউন্টারে ভারমুক্ত হয়ে তিনি এসে আমার পাশে বসলেন। নিজের চশমাটা মুছতে মুছতে বৃদ্ধ বললেন, "এই জন্যেই বলে, আমরা সময়ের দাস। কেউ কি বিশ্বাস করবে যে যৌবনে আমি একজন চ্যাম্পিয়ান ওয়েটলিফটার ছিলাম—অনেক প্রাইজ পেয়েছি!"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ভদ্রলোক আমাকে এমনভাবে ধন্যবাদ দিলেন যেন মানবসেবার বিরাট এক রেকর্ড স্থাপন করেছি।

বললাম, "আপনারা যে-বয়সে ভারি মাল নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সে-বয়সে আমাদের দাদু-দিদিমারা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্যের আমি একজন ভক্ত।"

ভদ্রলোক এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন "গোয়িং ফার? অনেক দূরে যাওয়া হচ্ছে নাকি?"

গল্প করার সুযোগ পেয়ে আনন্দের সঙ্গে জানালাম, "এমন কিছু দূরে নয়—নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমিও নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি। সুতরাং তোমার কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলতে দ্বিধা করো না।"

হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেলাম। প্যারিস থেকে ওয়াশিংটন

আসবার পথে নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে প্লেন পালটিয়েছি। কিন্তু নিউ ইয়র্কের ভেতরে ঢোকা হয়নি। এই প্রথম নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি। ওখানকার যে-সব গোলমেলে ব্যাপার শুনেছি, তাতে পথে জানাশোনা লোক থাকা খুবই ভাল।

"তুমি কি ইণ্ডিয়া থেকে আসছো?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে।"

ভদ্রলোক এবার আশ্বস্ত হলেন। "যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। ইণ্ডিয়ানদের ম্যানারস-এ স্বাভাবিক ডিগনিটি আছে।"

ওঁর কথায় বেশ অবাক হলুম। বললাম, "আপনি কখনও ইণ্ডিয়াতে ছিলেন?"

"কখনোই তোমাদের দেশে যাবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আমি জানি, তোমরা এখনও কীভাবে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করো। কয়েকজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সত্যি, তারা অন্য রকম—বৃদ্ধ মানুষদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় তারা জানে।"

ইতিমধ্যে প্লেন চড়ার ডাক এলো। বোয়িং বিমানের মধ্যে গিয়ে দু'খানা পাশাপাশি সীট আমরা দখল করলাম।

ভদ্রলোক বললেন, "তোমার নাম জানতে পারি কি? আমার নাম ডেভিড ফারপো।"

নিজের নামটা জানালাম। কিন্তু ওঁর নাম শুনেই আমার মুখের ভাব পরিবর্তন দেখে উনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। "এই নামের কারুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে নাকি?"

বললাম, 'কলকাতার লোকদের কাছে ফারপো নামটি অতি পরিচিত। আমাদের সবচেয়ে অভিজাত রেস্তোরাঁর ওই নাম। সেখানে অবশ্য ক'জন আর যেতে পারেন? কিন্তু ওই কোম্পানি আবার পাঁউরুটি তৈরি করেন। গরীব বড়লোক অনেকেই এই ফারপো রুটির ওপর নির্ভরশীল।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'তোমাদের ফারপো নিশ্চয় আমারই মতো ইটালিয়ান?"

আমি সত্যিকথা নিবেদন করলাম। "ছোটবেলা থেকেই সব বিদেশীকেই আমরা 'সায়েব' বলে জানি। সায়েবদের রং ফর্সা, চুল কটা,

স্বাস্থ্য ভাল এবং তাঁরা ইংরিজী বলেন, এই আমাদের ধারণা। সায়েবদের মধ্যে যে আবার নানা জাত আছে এবং অনেকেই যে ইংরিজী জানেন না, এই খবরটা আমাদের হাওড়ার গলিতে অনেকদিন পরে এসেছিল। তখন খবনাখবর নিয়ে জেনেছিলাম ফারপো রুটির ফারপো সায়েব ইটালিয়ান।

মিস্টার ফারপো আমার কথা শুনে প্রাণ খুলে হাসলেন। তারপর বললেন, "আমাকে তুমি একজন ইটালিয়ান-আমেরিকান বলতে পারো। জানো তো এই দেশকে মেলটিং পট বলা হয়। কয়েক-শ বছর ধরে বহু দেশের মানুষ ভাগ্যের সন্ধানে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে—তারপর এই কড়াইয়ে সব ধাতু গলে গিয়ে মিলেমিশে নতুন এক সভ্যতা সৃষ্টি করেছে···তার নাম মার্কিনী সভ্যতা।"

মেলটিং পট কথাটা মন্দ লাগলো না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে গেল। মিঃ ফারপোকে বললাম, "আমাদের কবি বিভিন্ন মানুষের একীকরণ সম্পর্কে আর একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন।

"তাই নাকি?"

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারততীর্থ কবিতায় এক একটি জাতিকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন—নানা পথ বেয়ে তারা ভারতবর্ষের মহামানব-সমুদ্রে লীন হয়ে গিয়েছে—কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।"

মিঃ ফারপো বললেন, "আমাদের কল-কারখানার দেশ—তাই কামার-শালার উপমাটাই লোকের মাথায় এসেছে। ভারতবর্ষের কবির মতো উদার দৃষ্টি আমরা কোথায় পাবো?"

আমি বললাম, 'আপনার কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারছি না —প্রকৃতির এমন বিচিত্র ঐশ্বর্য আর কোনো দেশে আছে কী? আর আপনাদের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রকৃতিকে কতখানি ভালবাসে এবং কতখানি আপন করে নিয়েছে সে তো নিজের চোখেই দেখছি।"

ইতিমধ্যে এক কাপ কফি পাওয়া গেলো। মিঃ ফারপো বললেন, "আশ্চর্য ঘটনা! আমেরিকার ঘরোয়া বিমান সার্ভিসগুলোতে যাত্রীসেবার কোনো চেষ্টাই নেই—সাধে কি আর এক জাপানী ভদ্রলোক বলেছিলেন,

'সার্ভিস' বা সেবা কথাটা ডিকসনারি ছাড়া আমেরিকার আর কোথাও খুঁজে পেলাম না। সামান্য কিছুক্ষণের ফ্লাইটে এই যে এক কাপ কফি পাওয়া গেলো এটা অপ্রত্যাশিত।"

ডোমেস্টিক মার্কিন বিমানে তেমন আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা নেই এটা সত্য কথা। তবে এর একটি কারণ, মার্কিনীরা বিমানকে বাস-এর মতন ব্যবহার করেন। হাজার-হাজার লাখ-লাখ লোক সব সময় বিমান-বন্দরের দিকে ছুটছেন, মিনিটে-মিনিটে প্লেন ছাড়ছে এবং সব সময়ই কয়েক লক্ষ লোক আকাশচারী হয়ে রয়েছেন! সবার নজর ঘড়ির দিকে, ছশো পাঁচশো মাইল দূরের কাজটা ঝট করে সেরে ফেলে কী করে লাঞ্চের আগেই অফিসে ফেরা যায় তার চেষ্টা করছেন সবাই।

সোজা হয়ে দাঁড়ালে মিস্টার ফারপো বোধহয় সাড়ে ছ'ফুট হবেন, যদিও বয়সের ভারে এখন একটু কুঁজো হয়ে পড়েছেন। আমাকে বললেন, "ইয়ং ইণ্ডিয়ান, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দ বোধ করছি। তা তুমি এদেশে কী করছো? কতদিনই বা এখানে থাকবে?"

বললুম, "এদেশে আমি কিছুই করছি না—বিনা ধান্দায়, নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সরকারী এবং বেসরকারী নিমন্ত্রণে যে কয়েক হাজার লোক প্রতি বৎসর আপনাদের দেশ দেখতে আসেন, আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন। সামান্য কয়েক সপ্তাহে এই বিরাট সভ্যতাকে বুঝে ফেলবো এমন স্পর্ধা আমার নেই। তাই ছাত্রের মতো এসেছি আপনাদের দেখতে এবং আপনাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। একমাত্র আনন্দের কথা, ছাত্র হলেও মাথার ওপর পরীক্ষার আড়াইমণি বোঝাটা নেই। যা দেখছি, তার সব কিছু মনে রাখার দায়িত্বও নেই।"

মিস্টার ফারপো আমার মুখের দিকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। আমি লিখি শুনে ওঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, "আমি এক সময় ইনসিওর কোম্পানিতে চাকরি করতাম—'পলিসি' বিক্রি করে আরও কমিশন রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পলিসি আমার কর্মজীবনে ছিল না। এখন রিটায়ার করেছি—এবার যদি লেখাপড়া একটু হয়। তবে লেখাপড়া করি না বলে লেখার কদর বুঝি না, এমন নয়।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছিলাম। মিঃ ফারপো বললেন, "আমার এক বন্ধুর মতে, একমাত্র গল্প কবিতা উপন্যাসেই সমাজের সত্যি খবর পাওয়া যায়। সত্যি খবর সংগ্রহ করা আজকাল সমস্ত পৃথিবীতেই শক্ত হয়ে উঠেছে।"

একটু থামলেন মিস্টার ফারপো। তারপর বললেন, "ইয়ংম্যান, তুমি পৃথিবীর এক প্রাচীন দেশ থেকে এসেছো—আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর করে যেও। আমরা নিজেদের অজ্ঞাতে এবং হয়তো অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনপুরুষের মধ্যে যে-সম্পর্ক গড়ে তুলছি তা কতখানি আধুনিক তা দেখে যেতে ভুলো না।"

বললাম, "আপনি কি নাতি, বাবা এবং ঠাকুর্দা এই তিন ভূমিকার কথা বলছেন?"

হেসে ফেললেন মিস্টার ফারপো। "আজ্ঞে, ঠিকই ধরেছো। আজকাল সর্বত্র জেনারেশন গ্যাপ (এক বয়সের লোকের সঙ্গে অন্য বয়সের লোকদের দূরত্ব) কথাটা শুনতে পাবে। আমরা ক্রমশঃ পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছি এবং সরে যাবার পরে নিজের চারিদিকে পাঁচিল তুলে নিজেকে আলাদা করে ফেলছি; তার ফলে নানা মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।"

মিস্টার ফারপো বললেন, "না, আমি বড়ো বক বক করছি! বুড়ো বয়সের এইটাই রোগ। এই জন্যে ইয়ং আমেরিকানরা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।"

"আপনি কথা বলে যান, মিঃ ফারপো। আপনার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ তো রোজ পাবো না।"

মিস্টার ফারপো বেশ খুশি হলেন। বললেন, "ইটালিয়ান-আমেরিকান, জার্মান-আমেরিকান, ইংরেজ-আমেরিকান, আইরিশ-আমেরিকান এদের সবারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবে। তাছাড়া আছে ইহুদি—আমেরিকান, প্রোটেস্টান্ট আমেরিকান, ক্যাথলিক আমেরিকান। আর সাদা আমেরিকান ও কালো আমেরিকানের সমস্যাটা তো পৃথিবীর সমস্ত লোকদের জানা।"

নিজের কথা শুরু করলেন মিঃ ফারপো। তিনি ইটালিয়ান-আমেরিকান। ১৮৯৩ সালে তাঁর বাবা ইটালিতে সংসার চালাতে না পেরে

ভাগ্যসন্ধানে মার্কিন মুলুকে চলে আসেন। সঙ্গে করে এনেছিলেন বুড়ো বাবা ও মাকে। ইটালি থেকে বহু চাষী পরিবার এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকায় হাজির হন। এঁরা অনেকটা আমাদের মতো। যৌথ পরিবারের প্রতি আকর্ষণ ছিল, বৃদ্ধ বাবা ও মা সংসারে অনেক ক্ষমতা রাখতেন।

মিস্টার ফারপো বললেন, "নামের শেষে 'i' '0' 'u' থাকলেই বুঝবে ইটালিয়ান হবার সম্ভাবনা। আমাদের নিজেদের মধ্যে টান এখনও কিছুটা আছে। এমন কি কাগজে দেখে থাকবে, আমাদের একটা সঙ্ঘ আছে—যারা প্রায়ই আর্থিক সাহায্যের জন্যে বিজ্ঞাপন দেয়। সঙ্ঘ এখন চেষ্টা করছে যাতে এই দেশে কেউ ইটালিয়ান-আমেরিকানদের হেয় করতে না পারে। নাটকে-নভেলে, থিয়েটারে টেলিভিশনে গুণ্ডার পার্ট থাকলেই তার ইটালিয়ান নাম দেওয়া হয়। স্বীকার করছি, শিকাগোর সেই বিখ্যাত ব্যানডিটদের বেশ কয়েকজন ইটালিয়ান ছিল। কিন্তু তাই বলে, গুণ্ডা ডাকাত মাত্রই ইটালিয়ান হবে এ কেমন কথা?"

সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং টেলিভিশন কোম্পানির এই ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্যে সঙ্ঘ এবার উঠে পড়ে লেগেছে। অনেককে তারা সাবধান করে দিয়েছে যে ইটালিয়ানদের যাঁরা হেয় করবেন, তাঁদের বয়কট করা হবে। সমস্ত মার্কিন দেশে ইটালিয়ানদের ক্রয়ক্ষমতা নেহাৎ কম নয়—প্রতি মাসে তাঁরা কোটি কোটি ডলার খরচা করেন; সঙ্ঘ শুধু সভ্যদের জানিয়ে দেবে, অমুক কোম্পানির মাল কিনো না, অমুক টেলিভিশনে তোমাদের কোম্পানির বিজ্ঞাপন দিও না।

এতে ফল পাওয়া যাচ্ছে। চোর-জোচ্চোরদের ইটালিয়ান নাম দেওয়ার আগে লেখক এবং প্রযোজকরা ভেবে দেখছেন। কিছুদিন আগে এক টেলিভিশন কোম্পানি প্রচার করলেন, অমুক দিনে শিকাগোর গুণ্ডা সর্দারদের জীবনকে কেন্দ্র করে তৈরি এক আকর্ষণীয় ছবি দেখানো হবে। সঙ্ঘ আগাম খবর পেলো, এবারও ভিলেন একজন ইটালিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে তারা কর্তাদের জানিয়ে দিলো, এই ছবি দেখানো হলে আর্থিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে শিরে সংক্রান্তি—এখন আর নাটক ঢেলে সাজাবার সময় নেই। শেষ পর্যন্ত গোপনে রফা হলো, তাঁরা গল্পের

নায়ক ডিটেকটিভকেও একজন ইটালিয়ান করে দিচ্ছেন। আগে এঁর একটা স্কচ নাম ছিল। ডিটেকটিভ মিস্টার এঙ্গাস এখন চাপে পড়ে হয়ে গেলেন ইটালিয়ান মিস্টার স্কালিঙ্গি। এতে ইটালিয়ানদের রাগ একটু কম হলো—হাজার হোক একজন ইটালিয়ান বোম্বেটেকে একজন সৎ ইটালিয়ান প্রাণসংশয় করে ধরে দিয়েছেন।

গল্প শুনে আমার মুখে বোধহয় একটু চাপা হাসি ফুটে উঠেছিল। মিস্টার ফারপো তা লক্ষ্য করে কারণ জানতে চাইলেন। বললাম, "আমাদের দেশেও এই সমস্যা আছে। দুষ্ট, অসৎ ব্যবসাদার চরিত্রে পেটমোটা মাড়ওয়ারী দেখানো হয়ে থাকে প্রায়ই…এটা যে ন্যায়সঙ্গত নয় তা আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে।

মিস্টার ফারপো বললেন, "তোমাকে বলছি, ইটালিয়ানদের জনসমক্ষে হেয় করার চেষ্টা এবার বেশ কমে যাবে—কারণ পয়সার টানটা বড়ো টান। নাটক-নভেলে এক সময় ইহুদিদের ছোট করা হতো—এখন এদেশে কারও সাধ্য নেই ইহুদিদের পিছনে লাগে। তার কারণ ইহুদিদের পকেটে ডলার আছে, দেশের অনেক বড়ো বড়ো দৈনিক ও সাপ্তাহিকের মালিক তারা এবং নিজেদের ইমেজ সম্পর্কে প্রত্যেক ইহুদি সচেতন। তাই কেউ তাদের ঘাঁটাতে সাহস করে না। উল্টোদিকে কোনো লেখকের ইহুদি নাম থাকলে, তাঁর জাতের লোকেরা গাঁটের কড়ি খরচ করে বই কিনে তাঁকে সাপোর্ট করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে একটা চাপা রসিকতা আছে 'জুইশ বেস্টসেলার'। ইহুদি লেখকের বইয়ের বেস্টসেলার হবার সম্ভাবনা অন্য নামের লেখকদের থেকে বেশী।"

মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম—ভারতবর্ষে লেখক হিসেবে জন্ম নিয়েছি। আমরা অশিক্ষিত ও দরিদ্র, প্রাদেশিকতা, ভাষা, বর্ণ ও ধর্ম-সংক্রান্ত নানা সংকীর্ণতা সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্য এখনও কলুষিত হয়নি। বই কেনবার সময় কেউ বলেন না মুসলমান লেখকের বই দেবেন না, বা মাহিষ্য লেখকের বই দেখান। প্রাদেশিকতার নানা লক্ষণ সত্ত্বেও বাঙালী বিমল মিত্রের লেখা মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, গৌহাটি সর্বত্র সমাদৃত হয়। সব পাঠকই ভাল লেখা পেলে লেখককে নিয়ে মাতামাতি করেন, একবারও জিজ্ঞেস করেন না তিনি মাদ্রাজী না গুজরাতী, বাঙালী না

পাঞ্জাবী। সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে তাই সর্বপ্রান্তের শিক্ষিত ভারতীয় ভিড় করেন এবং বাঙালী প্রযোজিত, পরিচালিত এবং অভিনীত বোম্বাই-ছবির তীব্র সমালোচনা করতে কট্টর বাঙালীও দ্বিধা করেন না।

মিস্টার ফারপো বললেন, "নিউ ইয়র্কের লা-গার্ডিয়া বিমান-বন্দরে নামতে আমাদের বেশী দেরি নেই। তোমার কাছে অনুরোধ, এদেশের কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের দিকে নজর রাখবে, আপনজনদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক কী রকম নতুন রূপ নিচ্ছে লক্ষ্য করবে। কারণ আমার ধারণা, কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের দেশ আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। আমাদের অবস্থা দেখে এ-বিষয়ে সময় থাকতে সাবধান হতে হবে।

লা-গার্ডিয়া এয়ারপোর্টে নেমে আমরা আবার করমর্দন করেছিলাম। বৃদ্ধ ফারপো বললেন—"আমার স্ত্রী ও আমি এখান থেকে মাইল চল্লিশ দূরে এক শহরতলীতে থাকি। আমার ছেলে থাকে সানফ্রানসিসকোয়। মেয়ে বোস্টনে। আমার বড়ো নাতিটি এখন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। জন হপকিন্স, তুমি নিশ্চয় জানো। আমাদের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি-সির খুব কাছে বাল্টিমোর মেরিল্যাণ্ড স্টেটে। আমরা এখানে বেশীদিন নেই। নিউ ইয়র্ক রিটায়ার্ড লোকদের জায়গা নয়। আমরা এই বাড়ি করে শীঘ্রই ফ্লোরিডা চলে যাবো। তুমি যদি একদিন চলে আসো, খুব খুশী হবো।"

নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দেওয়া কার্ডটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ মিস্টার ফারপো এগিয়ে চললেন।

নিউ ইয়র্কে আমার ঘাঁটি অধ্যাপক মণি নাগের বাড়ি। পাণ্ডিত্য ও রসবোধের রাসায়নিক সংমিশ্রণ হলে যে বিরল জিনিসটি পাওয়া যায় তারই একটি নমুনা আমাদের ডক্টর নাগ।

মণিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় কলকাতায়—তিনি তখন অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে চাকরি করছেন। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে ডক্টরেট নিয়ে মণিবাবু স্বদেশে ফিরেছিলেন। কিছুদিন পরে গেঁয়ো যোগী বিদেশে আবার বিরাট সম্মান পেলেন—কলম্বিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদে আমন্ত্রণ জানানো হল তাঁকে। অ্যানথ্রপলজি বিষয়টি আমাদের দেশে এখনও তেমন কল্কে পায়নি। সাধারণ লোকের ধারণা, এঁরা কেবল কোল, ভীল, ওঁরাও ইত্যাদি আদিবাসীদের নিয়ে মাথা ঘামান এবং মাঝে মাঝে ঢাউস সাইজের অবোধ্য এবং অপাঠ্য রিপোর্ট প্রকাশ করেন। দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁদের কোনো আগ্রহ নেই। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। পশ্চিমের নানা দেশে এখন নৃতত্ত্বের প্রচণ্ড সমাদর। ইস্কুলে প্রত্যেক ছাত্রকে নৃতত্ত্ব পড়তে হচ্ছে। সরকারী বেসরকারী যে কোনো পরিকল্পনায় অ্যানথ্রপলজিস্টকে ডাকা হয় মন্ত্রণার জন্যে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করেন এবং রিপোর্ট লেখেন।

মণিবাবু বললেন, "এখন যে-জিনিসটার ওপর খুব নজর, সেটা হলো সোশ্যাল অ্যানথ্রপলজি।" মানবসম্পর্কের এমন কোনো দিক নেই যে বিষয়ে না তাঁরা সমীক্ষা করছেন। 'ফ্লোরিডার ভূমিহীন কৃষিকর্মী পরিবারে শিশুদের লজ্জাবোধের বিকাশ' থেকে আরম্ভ করে, 'বিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গণে প্রণয়পদ্ধতি' অথবা 'হারলেম অঞ্চলে দরিদ্র নিগ্রো পরিবারে দিদিমার প্রভাব' প্রভৃতি নানা বিচিত্র বিষয়ে নিরন্তর কাজ চলছে। মণিবাবুর সুপারিশক্রমে কয়েকটা রিপোর্ট পড়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি—যেমন 'উত্তর ভারতে গ্রাম্যজীবন', 'পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গ্রামে বধূদের প্রজনন সম্পর্কে ধারণা।'

মণিবাবু বললেন, "অনেকের ধারণা, আজকের আমেরিকাকে ভালভাবে জানবার সহজতম উপায় হলো, অ্যানথ্রপলজিস্টদের লেখা বই ও রিপোর্ট পড়া। এঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সমস্যা বা সম্পর্ক সম্বন্ধে সমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তার বিবরণ পণ্ডিত সমাজে পেশ করছেন। এঁরা কোনো *value 'judgement'* দেন না, শুধু যা দেখতে পান বা খবর পান তাই লিখে যান। মনে করুন, এঁরা স্কুলে-পড়া ছেলে-মেয়েদের যৌনবোধ সম্পর্কে সমীক্ষা করছেন—ওঁদের সামনে যে-সব খবর আসছে তার ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার নৃতত্ত্ববিদরা করেন না, শুধু ছবি এঁকে যান। তাই এক একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হলে

প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নানা বাক-বিতণ্ডা হয়, কংগ্রেসে ও সেনেটে প্রশ্ন ওঠে, এবং শেষ পর্যন্ত আইন পালটানোর দাবিও তোলা হয়।

মণিবাবু বললেন, "আন্দাজ বা গুলের ওপর আজকের কোনো প্রগতিশীল সমাজ নির্ভর করতে পারে না। তাই এখানে হিসেবের এবং উদাহরণের এত আদর।"

আর একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ আমাকে বললেন, "কলকাতায় এরকম কতো সমীক্ষা করা উচিত বলুন তো ? তাতে আমাদের চোখ খুলে যাবে—আমরা জানতে পারবো সমাজ কোন্ দিকে যাচ্ছে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কী চিন্তা করছে। বিভিন্ন পাড়ার রক্বাজ ছেলেদের কথা ধরুন না কেন। এদের নিয়ে সমীক্ষা হলে কত কথা জানতে পারা যায় এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা-সমাধানের একটা চেষ্টা চলতে পারে। অথবা যারা সামান্য সুযোগ পেলেই লুট করে, দাঙ্গা বাধায়, ট্রামে-বাসে আগুন দেয়—এরা কারা ? প্রায়ই শোনা যায় এই লুটের বা খুনোখুনির মধ্যে মানসিক বিকারগ্রস্ত কিছু লোক থাকে। রাজনৈতিক দল বা নেতা সরল মনে মিছিল করছেন বা প্রতিবাদ তুলছেন—কিন্তু এই মানসিক রোগীরা তাঁদের অসুস্থ কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে গোলমালের সুযোগ খুঁজছেন। যেখানে সমস্যাটা এতো গোলমেলে নয়, সেখানেও আমাদের জানবার উপায় নেই কেন এতো জিনিস থাকতে বাস ট্রামের ওপরই উন্মত্ত জনতার রাগ।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের দেশে সব বিষয়েই আমরা গভরমেণ্টের মুখ চেয়ে বসে আছি। নিজেদের সংগঠন বা সামর্থ্যের ওপর আমাদের একটুও বিশ্বাস নেই—সব কিছুই গভরমেণ্ট করুক এই পরনির্ভরতাবোধ আমাদের পঙ্গু করে তুলছে। একেও এক ধরনের মানসিক পরাধীনতা বলতে পারেন। আর আমাদের ধারণা, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ছাড়া আর কারুরই তদন্তের অধিকার নেই। পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা হাইকোর্ট জজের মতই নিরপেক্ষতার জন্য সম্মানিত। তাঁরা সমাজের নানা সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন—যার ফলাফল থেকে সকলেই উপকৃত হচ্ছেন। এ বিষয়ে আমরা কোথায় পড়ে রয়েছি ? স্বাধীনতার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বছরের পর বছর বেড়ে

চলেছে। ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুরী কমিশন থেকে আরও টাকা আদায়ের চেষ্টা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কিছু করবার আছে—তা খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়লে মনে হয় না।”

ভদ্রলোক বললেন, “আমাদের দেশে ইদানীং কতো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। গ্রামের চাষীর সামনে নতুন পৃথিবীর দরজা খুলছে। মেয়েরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করেছে—অথচ নবীন ও প্রাচীনের এক অপরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা করছে তারা। যৌথপরিবার ভেঙে পড়ছে—নতুন পরিবেশে গ্রামের মানুষ শিল্প-বিপ্লবের তপ্ত ফার্নেসের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। এসবের বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য বিবরণ কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান জ্ঞান-তপস্বীরা এবং তরুণ গবেষকরা কী করছেন? রাজনৈতিক দলগুলির ইতিহাসও তাঁরা লেখবার চেষ্টা করছেন না—এ বিষয়ে যে ক'টা ভাল বই বেরিয়েছে তা বিদেশীদের লেখা। একজন অধ্যাপক হিসেবে এর জন্যে আমি লজ্জাবোধ করি—কারণ আমি জানি আমাদের দেশে কাজ করবার লোক আছে, কিন্তু পরিবেশ নেই।

ভদ্রলোকের কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সত্যি, আমাদের উচ্চ-শিক্ষিত সমাজ দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁদের যতখানি করা উচিত তা করছেন কিনা তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। উচ্চবিত্ত হওয়াটা আজকে ভারতবর্ষে যেমন একটা প্রিভিলেজ, উচ্চশিক্ষিত হওয়াটা এক অর্থে তার থেকেও বড়ো প্রিভিলেজ। কিন্তু উচ্চশিক্ষিতরা কী করছেন? প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে দেশের ডাকে অনেকে সুখ বিসর্জন দিয়ে কারাবরণ করেছেন। আজকের যুগের তরুণ ডাক্তার, ব্যারিস্টার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এ-সবে জড়িয়ে পড়তে চান না। তাঁদের একটু-আধটু ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের স্ত্রী এবং শ্বশুরমহাশয়ের প্রবল আপত্তি। এঁদের একদল, ফরেনে গেলে কত আদর পেতেন এবং কত ডলার মাইনে পেতেন এবং তাকে সাড়ে সাত দিয়ে গুণ করলে কত টাকা হতো তাই ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করছেন। আর একদল যুবক 'কনভেন্ট-শিক্ষিতা, প্রকৃত সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, উচ্চপদস্থ পিতার একমাত্র কন্যার স্বামী হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিলিতী সওদাগরী অফিসের 'ম্যানেজমেন্ট কেরানী' হচ্ছেন। আর একদল দেশের সব অধঃপতনের দায়িত্ব হয়

টাটা-বিড়লা না হয় জ্যোতি বোস-অতুল্য ঘোষের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্তে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

মণিবাবু বললেন, "অত উত্তেজিত হবেন না। দেশের মানুষদের বিচার করবার অনেক সময় দেশে গিয়ে পাবেন। সামান্য কয়েক দিনের জন্য বিদেশে এসেছেন, সায়েবদের জীবনযাত্রা দেখে যান।"

কথায় কথায় ফারপো সায়েবের নাম উঠলো। মণিবাবু বললেন, আমেরিকায় ইটালিয়ান পরিবারের ওপর সম্প্রতি কিছু ভাল সমীক্ষা হয়েছে। কী করে তাঁরা তাঁদের ইটালিয়ান বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পুরোপুরি আমেরিকান হয়ে যাচ্ছেন, তার ছবি পাওয়া যাচ্ছে।"

এ-বিষয়ে জানবার লোভ সংবরণ করা গেল না। বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় দু'একটা লাইব্রেরি ঘুরে যা খবরাখবর পেলাম—তাতে আমার চোখ খুলে গেলো। ইটালিয়ান-আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারের অদ্ভুত মিল রয়েছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বাইরে আমাদের সংসারের ছবিটা কী রকম? আশাপূর্ণা দেবীর গল্প-উপন্যাসে এর চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বড়োদের অভিযোগ—আজকালকার ছেলেরা বাবা-মাকে তেমন ভক্তি করে না, মান্য করে না। পরিবারের মান-সম্মানটা এককালে খুব বড়ো কথা ছিল। এমন কিছু করা যায় না যাতে দর্জিপাড়ার মিত্তির-বংশের, অথবা পাঁজিয়ার বোসদের বা পাতিহালের রায়দের মাথা নীচু হয়। আর এখন যে যার প্রাণ সামলাতে ব্যস্ত! সবাই নিজের স্বার্থ গুছোচ্ছে।

মায়েদের অভিযোগ : "আমরা শাশুড়ীদের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতাম, যা বলতেন তাই মানতাম। এখনকার বৌদের লাজলজ্জা নেই—ঘোমটা দেয় না, আধগজী ছিটের ব্লাউজ পরে গুরুজনদের চোখের সামনে ধড়াস করে শোবার ঘরের খিল বন্ধ করে দেয়, বিয়ে হবার দশদিনের মধ্যে আলাদা হবার ফন্দি আঁটে। বিয়ে-থা'র ব্যাপারে বাবা-মা'রা এখন নিমিত্ত মাত্র—ছেলে হয় নিজেই মেয়ে পছন্দ করছে, না হয় ইয়ার-বন্ধু নিয়ে পাত্রী দেখতে যাচ্ছে। স্ত্রী-নির্বাচনে বাবা-মা-র মত থেকে বন্ধুর পরামর্শ অনেক বেশী মূল্যবান। অথচ 'ওঁরা' যখন বিয়ে করেছেন, তখন কোনো ছেলের সাধ্যি ছিল বলে, মেয়ে দেখবো! শ্বশুরমশায় যা কথা দিয়ে এলেন তাই হলো—

শুভদৃষ্টি একেবারে সেই ছাঁদনাতলায়। তা বাপু, তাতে সুখ কী কম পেয়েছি? কি বাপু, ডায়াবিটিস না ডাইভোর্স কী বলো ওসব তো আমাদের সময় ছিল না। এখন তো সোহাগের ছড়াছড়ি, তারপরই ছাড়াছাড়ি।"

এই পরিবর্তন কী শেষ হয়েছে? না আজকের বৌমা—যিনি শাশুড়ীর সামনে ঘোমটা দেন না, হুট-হুট করে একলা বাপের বাড়ি চলে যান, ছুটির দিনে স্বামীর সঙ্গে দুপুরবেলায় ঘুমোতে লজ্জা পান না—তিনি যখন, ছেলের বিয়ে দিয়ে বধূ আনবেন তখন দিন-কাল আরও পাল্টে যাবে। ইটালিয়ান পরিবারের তিন পুরুষের এক সমীক্ষার কথা বলবো—তাতে হয়তো আমাদের সংসারের একটা ছবি পাওয়া যাবে। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের অনেকেই এখনও দ্বিতীয় পুরুষে রয়েছেন।

পল ক্যামপিসির তৈরি তিন পুরুষের ইটালিয়ান পরিবারে বিবর্তনের এই বিবরণ পড়ে আমার চোখ খুলে গেলো।

পরিবারের এক একটা দিক ধরে বিচার করা যাক। প্রথম পর্বের ইটালিয়ানদের পরিবার-পরিকল্পনা নেই, আট-দশটা ছেলেমেয়ে খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পুরুষে চারটি পাঁচটি সন্তান। আর তৃতীয় পর্বে একেবারে ছোট্ট সংসার। প্রথম পর্বে বাবা বাড়ির দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্তা। দ্বিতীয় পুরুষে খাতায়-কলমে বাবা সর্বশক্তিমান হলেও, তাঁর ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে। তারপরের পুরুষে কর্তা, গিন্নী, ছেলেমেয়ে কেউই কম যান না—সবারই 'হাই স্ট্যাটাস্'।

প্রথম পর্বে, বাড়ির বড়োছেলের স্পেশাল খাতির, স্থাবর সম্পত্তি সে-ই পাবে। দ্বিতীয় পর্বে, বড়ো হলেই বেশী সম্মান এমন কোনো আইন নেই; যে লেখাপড়ায় ভাল, চাকরি বা ব্যবসায়ে কেষ্টবিষ্টু হয়েছে তার বেশী খাতির। নতুন অধ্যায়ে সবাই সমান। তুমি বড়ো বলে মাথা কিনে নাওনি।

প্রথম দিকে ইটালিয়ানরা ঘরসংসার, নড়াচাড়া পছন্দ করতেন না। যেখানে বাড়ি করা হলো বা ভাড়া নেওয়া হলো সেখানেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় পুরুষে অস্থিরতা দেখা গেলো। এই শহরেই বাবা ছিলেন বলে আমাকেও এখানে জীবন কাটাতে হবে তার মানে নেই। আর তৃতীয় পর্বে, অন্য আমেরিকানদের মত ভয়ঙ্কর অস্থিরতা। নিউ ইয়র্কে জন্ম, আইওয়াতে লেখাপড়া, তিনহাজার মাইল দূরে লস্ এঞ্জেলেস্-এ

চাকরি-জীবন কাটিয়ে, মহাসমুদ্রের অপর পারে হাওয়াইতে অবসর জীবন যাপন করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়!

প্রথম পর্বে, সন্তানদের কাছে মা-বাবা দেবতুল্য, তাঁদের সুখী করার জন্যেই সন্তানদের জীবনধারণ। দ্বিতীয় পর্বে, বাবা-মা মুখে সম্মান পান কিন্তু ছেলেমেয়েরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তৃতীয় পর্বে, চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছে। এখন ছেলেমেয়ের সেবা-যত্ন ও সুখের জন্যেই বাবা-মা জীবনধারণ করছেন! আমেরিকান পারিবারিক সংস্কৃতির এইটাই নিয়ম এখন—যা আমাদের তথাকথিত কনভেন্ট-শিক্ষিত হাই সোসাইটিতে বেশ চালু হয়ে যাচ্ছে এবং যার লক্ষণ সমাজের অন্যস্তরেও ফুটে উঠতে দেখে বিদগ্ধজনরা শঙ্কিত হচ্ছেন। নতুন পরিস্থিতিতে পিতৃমাতৃভক্তির কোনো দাম থাকবে না। বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের মাতৃভক্তির গল্প শুনে ছেলেমেয়েরা মুখ টিপে হাসবে, ভাববে সেকেলে লোকগুলো কত বোকা এবং সেন্টিমেন্টাল ছিল।

প্রথম পর্বের ইটালিয়ান ভাবতেন, যত ছেলে হয় ততই ভাল। বলদ ও লাঙলের মতই ছেলে-পুলে লক্ষ্মী, যত হয় চাষের কাজের তত সুবিধে। দ্বিতীয় পর্বে কর্তা বুঝলেন—ছেলে ততদিনই সম্পদ যতদিন না বিয়ে-থা করছে। বিয়ের আগে যে ক'বছর লাভ পাওয়া যায়—তারপরই লোকসানের অঙ্ক। আর আধুনিক অধ্যায়ে, ছেলে-পুলে মানেই খরচের ধাক্কা—তাকে খাওয়াও, জামাকাপড় পরাও, ইস্কুলে দাও, মানুষ করো—সম্পর্ক শুধু দেবার, পাবার কিছুই নেই।

প্রথম পর্বে ইতালীয় পরিবারে উৎসব লেগেই থাকতো—আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণের মত। দ্বিতীয় পর্বে আমাদের মত বিয়ে-থা, পুজো-পার্বণ আছে, কিন্তু সংখ্যা কমতির দিকে। আর এখন উৎসবটা আর পরিবার-কেন্দ্রিক নেই—একমাত্র বড়দিন ছাড়া, যেদিন বাবা-মা ছেলেপুলে নাতি-নাতনিকে একত্রে লাঞ্চ খেতে দেখা যায়।

সংসারের দৈনন্দিন জীবনে ঢোকা যাক এবার। প্রথম পর্বে সংসার বলতে মা। তিনি রান্নাবান্না, কাচাকাচি নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন, তাঁর চাকরির কথা চিন্তা করাও অশোভন। দ্বিতীয় পর্বে তিনি সংসারের কেন্দ্রমণি, কিন্তু প্রয়োজন হলে চাকরি করতে পারেন, অবসর বিনোদনের জন্যে এক-আধটা ক্লাবের মেম্বার হতে পারেন। বর্তমান পর্বে, মা সংসারের

দায়িত্ব অস্বীকার করেন না; কিন্তু তাই বলে সংসারের জন্যে নিজের ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিতে রাজী নন। ঝটপট বাড়ির কাজ গুছিয়ে তিনি অফিসেও যাবেন, নিজের সামাজিক সম্পর্কও রাখবেন।

প্রথম পর্বে, বাড়ির কর্তা রাগী মানুষ, ছেলেকে দরকার হলে উত্তম-মধ্যম দিতে তিনি কসুর করেন না। পরের পুরুষে, কর্তা মনে মনে খেয়াল রেখেছেন আমেরিকান আইনে নিজের ছেলেকেও ঠেঙিয়ে শাসন করা যায় না। আর এযুগের কর্তা বুঝে নিয়েছেন, আইন ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ছেলে ঠেঙিয়ে লাভ নেই, বরং ছেলে আরও বিগড়ে যেতে পারে।

মেয়েদের সম্বন্ধে প্রথম পুরুষের ধারণা ছিল—ইস্কুল-কলেজ মেয়েদের জন্যে নয়। তারা গৃহস্থালির কাজ শিখুক যাতে বিয়ের পরে সুগৃহিণী হতে পারে। দ্বিতীয় পুরুষে ধারণা—একটু আধটু লেখাপড়া শিখুক, তবে বিয়েটাই উদ্দেশ্য, সুতরাং রান্নাবান্নার দিকেই যেন প্রধান নজরটা থাকে। আর এ যুগে লেখাপড়ার আসল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিত্বের বিকাশ। (পাঠককে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত মহলে সম্প্রতি যেসব ভাবনা চলেছে তা মনে করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।)

বিয়ের পর কী হতো ? বধূকে স্বামীর বাবার সংসারে শাশুড়ির আদেশ মেনে চলতে হতো। দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় শাশুড়ি-বৌয়ের সংঘাত পেকে উঠছে। বৌমা এখন আর সবকথা মাথা নিচু করে হজম করতে রাজী নন। শাশুড়ির দুঃখ, ছেলে তাঁর কনট্রোলে নেই—বৌয়ের কথায় উঠছে-বসছে। আর এখন তো বৌমার স্বাধীনতা পর্ব। তিনিই এখন নিজের সংসারের সর্বেসর্বা, শাশুড়ি সেখানে ন'মাসে ছ'মাসে কয়েক ঘণ্টার জন্যে অতিথি হয়ে আসেন এবং বড়জোড় বড়দিনের লাঞ্চ ও ডিনারটা খেয়ে যান।

ছেলের কাছে বাপ-মায়ের প্রত্যাশার পরিবর্তন লক্ষ্য করুন। প্রথম পুরুষে বাবা আশা করেন, ছেলে খুব খাটবে এবং রোজগারের ডলার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেবে। দ্বিতীয় পর্বে খাতায় কলমে ঐ একই প্রত্যাশা আছে, কিন্তু বাবা-মা মনে মনে বুঝেছেন, কম ছেলেই পুরো রোজগারটা সংসারের কাজে তুলে দেয়। আর আধুনিক পর্বে, বাবা-মা শুধু আশা করেন ছেলে কৃতী হোক, অনেক টাকা রোজগার করুক, কিন্তু কেউ ভুলেও আশা করেন না যে ছেলে তাঁদের হাতে কিছু টাকা দেবে।

এইসব ব্যাপারে আরও জানবার জন্যে একদিন মিস্টার ফারপোর বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। বৃদ্ধ ফারপো-দম্পতি আমাকে খুব আদর-যত্ন করলেন—বাড়িতে তৈরি ইটালিয়ান পিস্তা খাওয়ালেন। বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বললেন, "শেষ পর্যন্ত এদেশে ইটালিয়ান কালচারের কিছুই থাকবে না—একমাত্র পিস্তা ছাড়া। এই খাবারটা প্রায় মার্কিন কালচারের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে।"

বৃদ্ধা মিসেস ফারপো বললেন, "তুমি তো শুনেছো, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। ফ্লোরিডাতে সংসার-খরচ কম, আবহাওয়া এতো চরম নয়—এখানকার শীতটা বুড়োদের পক্ষে মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। ভেবেছিলাম, আমার ছেলে এই বাংলোটা রাখবে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক স্টেট তার ভাল লাগে না—সে সাউথ ক্যারলিনা পছন্দ করে।"

মিসেস ফারপো বললেন, "যুগ কীভাবে পাল্টাচ্ছে। প্রথমদিকে যৌথ সংসারে নতুন-বিয়ে-হওয়া স্বামী-স্ত্রীর খুব মুশকিল ছিল। প্রকাশ্যে কোনোরকম প্রেম দেখাবার উপায় ছিল না—শাশুড়ী তাহলে হৈ-চৈ বাধাতেন। তার পরের জেনারেশনে শ্বশুর-শাশুড়ী একটু উদার হলেন, নিজের যৌবনে কীভাবে ভুগেছেন তা ভুলতে পারেননি, তাই ছেলে-বৌ প্রেম প্রকাশে একটু বেশরম হলেও তাঁরা ক্ষমা করতেন।"

মিসেস ফারপো বললেন, "বুঝলে ইয়ংম্যান, এই চাপা প্রেমটাই ছিল মধুর। আর আজকের জেনারেশনের স্ত্রী-পুরুষের প্রেমকার্য নিজের চোখেই দেখছো। ড্রইং-রুম, রাস্তা, স্টেশন, বিমান-বন্দর, ফুটপাথ যেখানে খুশী আলিঙ্গন, চুম্বন ও নানাবিধ আদর চলেছে। দেহমিলনের যে একটা রহস্যময় মাধুর্য ছিল—তা আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা জানতে পারলো না। তাই সেক্সটা এতো তাড়াতাড়ি তাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে ; নিত্যনতুন উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হচ্ছে ; তারপর কেউ ছুটছে মনের ডাক্তারের কাছে, কেউ ডাইভোর্স আদালতে।"

মিস্টার ফারপো স্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে হাসছিলেন। বললেন, "শুনেছি, আমার বাবার বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে। ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা মেয়ে পছন্দ করেছিলেন। আমার মা যে দেখতে খুব ভাল ছিলেন তা নয়—কিন্তু মায়ের বাবা এবং আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ইটালির এক

গাঁয়ের লোক, সেটা মস্ত কথা। বিয়েতে কিছু পণও পেয়েছিলেন বাবা—সেইটাই ছিল যুগের নিয়ম।"

"বলেন কী ?" আমার অবাক হবার পালা। "এদেশেও পণপ্রথা ছিল ?"

"নিশ্চয়," হাসলেন মিস্টার ফারপো। "তারপর আমাদের বিয়ের গল্প বলতে পারি—যদি না আমার গৃহিণীর কোনো আপত্তি থাকে।"

গৃহিণী সলজ্জভাবে বললেন, "যদি কোনো দুষ্টুমি না করে সোজাসুজি বলো তাহলে আপত্তি নেই। ডেভিড, তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বিবাহের স্বর্ণ-জয়ন্তীর পরও ডাইভোর্সের ঘটনা গত সপ্তাহে কাগজে বেরিয়েছে ; এবং আমাদের মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বিয়ে হয়েছে।"

মিস্টার ফারপো বললেন, "হে বিদেশী কবি, তুমি দেখে যাও এই দেশে আমরা কী ভাবে স্ত্রী-দ্বারা নিগৃহীত হয়ে থাকি।"

"আমি বিদেশী, কিন্তু কবি নই", ওঁদের মনে করিয়ে দিলাম।

মিস্টার ফারপো বললেন, "কবির মন ছাড়া কে সাহিত্যিক হতে পারে ? আমরা তোমাকে কবি বলবোই।"

মিসেস ফারপো বললেন, "ডেভিড, আমার মা তোমাকে দেখে ঠিকই বলেছিলেন, এ ছেলে আমার মেয়েকে ভোগাবে।"

"তাই নাকি প্রিয়া ? তাহলে ওঁরা কেন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের অনুমতি দিলেন ?" মিস্টার ফারপো জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমাকে বলে রাখি, আমরা যৌবনে অন্য আমেরিকানদের মত অতটা আধুনিক হয়ে উঠতে পারিনি। বাবা-মার কথার মূল্য দিতাম আমরা। আমাদের সময় প্রেম-টেম আরম্ভ হয়েছে—কিন্তু বাবা-মার মত ছাড়া আমরা বিয়ে করতাম না। এই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রণয় একটু দানা বাঁধতেই দু'পক্ষের বাপ মাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ওর বাড়িতে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে গিয়েছি ; ওকেও দেখেছেন আমার বাবা এবং মা। বাবা-মা বলেছিলেন, "দেখো, দিনকাল পাল্টাচ্ছে। তুমি আমাদের মত না নিয়েও বিয়ে করতে পারো জানি। কিন্তু বউ পছন্দের সময় দোহাই দেখো—সে যেন ক্যাথলিক হয় এবং ইটালিয়ান হয়। আর যদি আমার গাঁয়ের কোনো মেয়ে বিয়ে করো, তাহলে আমরা তো হাতে চাঁদ পাবো।"

মিসেস ফারপো বললেন, "তুমি পোয়েট, তোমাকে সব কথা বলা উচিত। আমার বাবা আমাকে বললেন, 'এই ছেলেকে যখন মনে ধরেছে আমাদের আপত্তি নেই।' মা বললেন, আমিও মত দিচ্ছি—হাজার হোক ছেলে লম্বা চওড়া, সুন্দর। তবে বলে রাখলুম, জামাই একটু জেদী হবে। মেয়েকে আমার কড়া শাসনে রাখবে।' বাবা বললেন, 'সে তো ভাল কথা। মেয়েদের আদর করতে হয়, কিন্তু মাথায় তুলতে নেই।"

মিস্টার ফারপো বললেন, "অবশেষে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু, বিয়ের আগে দেহের পবিত্রতায় আমাদের বিশ্বাস ছিল। বিয়ের আগে এক-আধ ডজন নিষ্পাপ চুম্বন ও আলিঙ্গন ছাড়া আমরা আর কোনো স্বাধীনতা নিইনি।"

"আর আজকালকার মেয়েরা ভাবে আমরা বোকা ছিলুম—কুমারিত্ব রক্ষে করতে গিয়ে কি জিনিস হারিয়েছি তা জানি না।" বললেন মিসেস ফারপো।

"যদি কোন আপত্তি না থাকে, আপনার ছেলেমেয়েদের বিয়ের কথা বলুন", আমি অনুরোধ জানাই।

"তারা যুগের সঙ্গে তাল ফেলে চলেছে। পনেরো বছর থেকে ডেট করেছে। আমার ছেলে কোরিয়ার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বিয়ে করল এক প্রোটেস্টান্টকে। বৌমার বাবা স্প্যানিশ-আমেরিকান, মা আইরিশ। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কোনো পরামর্শ চাওয়া হয়নি। তোমাকে না বলাটা অন্যায় হবে, বিয়ের ছ'মাস পরেই আমাদের একটি নাতি হয়।"

মিসেস ফারপোর সরলতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি বললেন, "মেয়ের সম্বন্ধেও আমার ঐরকম ভয় ছিল। রচেস্টারে কোডাক কোম্পানিতে সেক্রেটারির কাজ করতো—একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো। তা ভগবানের দয়ায় একটি ভাল ছেলেকে বিয়ে করেছে, ওখানকার স্কুলে মাস্টারি করতো। ওদের ছ'টি ছেলেমেয়ে—ওরা বড়ো ফ্যামিলি চায়—জন্ম নিয়ন্ত্রণ ওরা বিশ্বাস করে না। ছেলে হবার কিছুদিন আগে আমি একবার করে যাই। প্রসবের পরও মাসখানেক থাকতে হয়। শুনছি ওদের আবার ছেলেপুলে হবে।"

ফারপো সায়েব বললেন, "তার মানে আমাকে আবার একটি সোনার মেডেল করাতে হবে।"

"বেবি হলে, আপনারা মেয়েকে মেডেল দেন নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না না", হেসে বললেন ফারপো-গৃহিনী। "নাতি-নাতনী হলেই আমার খুব আনন্দ হয়। এই দেখো না আমার হাতের বালাটা। এই বালা থেকে ছোট ছোট মেডেল ঝুলছে। এক একটি নাতি-নাতনি হয়েছে আর আমার একটি মেডেল বেড়েছে। প্রত্যেক মেডেলে নতুন নাতি বা নাতনির নাম লেখা। মোট দশটা মেডেল হয়েছে।"

আমার মনের অবস্থা কর্তা বোধহয় আন্দাজ করলেন। বললেন, "এ আর কি! আমাদের প্রতিবেশিনী মিসেস ফ্রাপলির সাতচল্লিশটা মেডেল আছে। ওঁর নাতনির আবার মেয়ে হয়েছে।"

একটা পাইপ জ্বালিয়ে মনের সুখে ধোঁয়া ছাড়লেন মিস্টার ফারপো। তারপর বললেন, "তুমি হয়তো তোমার দেশের জনসমস্যার কথা ভাবছো। আমাদের এখানে পরিস্থিতি অন্যরকম। মেয়েরা স্বাধীন—কি করে সন্তানের জন্ম নিরোধ করা যায় সবাই জানে। কিন্তু খুব ছোট্ট সংসারের মধ্যে একটু স্বার্থপরতা জড়িয়ে আছে। বেশী সন্তান মানেই কম সুখ, বেশী খাটুনি। তা সত্ত্বেও অনেকে জেনে-শুনে বড়ো সংসার করছে। এই বিরাট দেশে এখনও কুড়ি কোটি লোক হয়নি। লোকের অভাবে কত কাজ হয় না, কত গম নষ্ট হয়, সুতরাং লোক বাড়লে ক্ষতি নেই। বেশী ছেলেপুলে হওয়াটা একটা হাই ফ্যাশন—যা খুব কম স্বামী-স্ত্রীই অ্যাফোর্ড করতে পারেন।"

মিসেস ফারপো বললেন, "আমার মা, ঠাকুমা ভূত-টুতে বিশ্বাস করতেন। পোয়াতি মেয়ে সম্বন্ধে ওঁদের কত রকমের সংস্কার ছিল। বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে আঁতুড়ের ব্যবস্থা হতো—সাহায্য করত দাই। আমার প্রথম ছেলে বাড়িতেই হয়েছিল, তবে দাইয়ের বদলে ডাক্তার এসেছিল। পরের মেয়ে হয়েছিল হাসপাতালে। আর এখন তো হাসপাতাল ছাড়া কথাই নেই। আমি তিনবছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়েছি। আমার ছেলে মেয়েও মায়ের দুধ খেয়েছে। এখন বোতলের যুগ—যত তাড়াতাড়ি পার বোতল ধরাও। স্তন্যপায়ী কথাটাই হয়তো কিছুদিন পরে এদেশের লোকদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাবে না।"

ফারপো-দম্পতির সঙ্গে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওদের আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠা আমায় স্পর্শ করেছিল। সাধারণ মার্কিন নাগরিক চরিত্রের এই দিকটা সত্যই সুন্দর। ম্যানেজারের ভড়ং ইংরেজদের তুলনায় অনেক কম, নিজের কোনো সাফল্য থাকলে গর্ব করে বলে ফেলেন—যাকে অনেক সময় ঔদ্ধত্য বলে ভুল হতে পারে। নিজের সুখ-দুঃখের কথা বিদেশীর কাছেও বলতে কোনো দ্বিধা নেই। সামান্য কিছু লোকের মধ্যে যেমন মার্কিন ডলারে আন্তর্জাতিক ঔদ্ধত্য আছে, তেমনি অনেকেই অতি বিনয়ী এবং ভদ্র। কিছু লোক যেমন ধরে বসে আছেন—আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর পাপী-তাপী দেশগুলোর মুক্তি নেই, তেমনি অনেকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেন তাঁদের পার্থিব ভোগলিপ্সার সঙ্গে আত্মিক উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার দিকে একশ্রেণীর মার্কিন তাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে আছেন।

ফারপো-দম্পতি আমাকে বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। বাসে চড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যদি আবার কখন এদেশে আসি তা হলে ফ্লোরিডায় যেন একবার খোঁজ করি। দেখা নিশ্চয় হবে, কারণ ওঁদের এখন অনেকদিন বাঁচবার ইচ্ছে। চাকরি-বাকরির যন্ত্রণা এবং সন্তান লালন পালনের ঝামেলা চুকিয়ে এতদিনে ওঁরা স্বাধীন হয়েছেন। এই স্বাধীনতাই তো বুড়োবুড়ি উপভোগ করতে চান—যার মধ্যে যৌবনের লালসা বা জ্বালা নেই—আছে ছোটবেলার অপার আনন্দ, গুরুজনদের শাসনটুকু ছাড়া।

বাস চলতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁরা হাত নাড়তে লাগলেন। কত অল্প সময়ের মধ্যে কত আপন হয়ে পড়েছিলাম ভেবে আমার চোখ ছলছল করতে লাগলো।

নিউ ইয়র্কে ফিরতেই মণিবাবুর স্ত্রী কল্পনা বললেন, "অ্যান রবিনস্ বলে একটি যুবতী মহিলা ফোনে বেশ কয়েকবার লেখকের খোঁজ নিয়েছে।"

কল্পনা বৌদির মুখে চাপা হাসি। বললেন, "একটু বুঝে-সুঝে! হাজার হোক বিদেশ।"

বললাম, "অ্যান রবিনস্ সশরীরে ফ্ল্যাটে হাজির হননি, আর নিউ ইয়র্কে এখনও টেলিভিশন-টেলিফোন চালু হয়নি যে ডায়াল তুললে অন্য-দিকের লোকটির ছবি দেখতে পাবেন। এমতাবস্থায় কি করে বুঝলেন অ্যান রবিনস্ যুবতী?"

সোস্থাল অ্যানথ্রপলজিস্টের গৃহিণী, তায় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপিকা—তাঁর সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা আমার মতো হাওড়ার নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নয়। বৌদি বললেন, "বৃদ্ধাদের গলা শুনলেই বোঝা যায়।"

এমতাবস্থায় পরাজয় স্বীকার করতে হলো—তাছাড়া রণকৌশলের দিক থেকেও বৌদিদের কাছে দেবরদের সারেণ্ডার করা লাভজনক, তাতে আদর-যত্ন ও খাওয়া-দাওয়াটা ভাল হয়। কে না জানে স্নেহ নিম্নমুখী? পরাজিত ও পতিতের প্রতি কোন্ নারী না দয়া বর্ষণ করেন?

বৌদি বললেন, "ওঁরা তোমাকে ডিনারে আহ্বান করেছেন আজ সন্ধ্যায়।"

অ্যান রবিনস্ একবার সামান্য কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিল—তখনও সে অবিবাহিতা। সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কি একটা বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল। সেই সূত্রে ছ'একদিন দেখা হয়েছিল—কারণ আমি ছিলাম তার অন্যতম গিনিপিগ। ফিরে এসে বিয়ে করেছে রবিনস্ সায়েবকে। ওয়াশিংটন থেকেই খবর পাঠিয়েছিলাম—যদি একবার দেখার সুযোগ হয়।

অ্যান ও জন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পরই অ্যান আমার 'লেগ্ পুল (সোজা বাংলায় ল্যাজ টানতে!) শুরু করলো। "তরুণ লেখকদের নিয়ে নানা সমস্যা।"

"ভদ্রে, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, একদা তরুণ বয়সে সাহিত্যযাত্রা করেছিলাম—কিন্তু এখন আর কোনো প্রকারেই আমাকে তরুণ বলা যায় না।"

অ্যান বললে, "মাস্ট বি হ্যাভিং এ গ্লোরিয়াস টাইম—ফোন করে কিছুতেই পাওয়া যায় না। লেখকদের এই সুবিধে—যা-ইচ্ছে-তাই করার স্বাধীনতা।"

বললুম, "এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে এক নির্জন শহরতলীতে সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে এলাম। এক বৃদ্ধদম্পতি—বয়স ৬৭-র ওপর।"

জন আঁতকে উঠলো। "বলেন কি! এই দেশে সামান্য কয়েক-দিনের জন্যে এসে আপনি বুড়োদের সঙ্গে সময় নষ্ট করছেন!"

জন বয়সে তরুণ—ওর কথাতেই মনে হলো বুড়োদের সম্বন্ধে ওর ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই।

জন বললো, "আপনি কিছু মনে করবেন না। আমাদের দেশ যে এতোখানি এগিয়ে গিয়েছে, তার কারণ কী জানেন? আমরা উৎপাদন দিয়ে মানুষের বিচার করি—যাদের কাজের ক্ষমতা কমে গিয়েছে এবং কথার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে তাদের ওপর নির্ভর করলে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার মান ঠিক রাখতে পারবো না।"

আমি বললাম, "যদি অনুমতি করো তাহলে বলি, যে-জিনিসটা আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে তা হল তোমাদের সমাজে বৃদ্ধরা অবহেলিত। এদেশে বৃদ্ধ কথাটাই যেন অশ্লীল।"

অ্যান বললো, "ঠিকই ধরেছেন, এখানে কেউ স্বীকার করতে চায় না সে বৃদ্ধ হচ্ছে।"

আমি বললাম, "মিস্টার রবিনস্, আমি এমন এক দেশ থেকে এসেছি যেখানে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ। তাই যখন দেখি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, সম্মান ও সৌজন্যও পাচ্ছেন না বৃদ্ধরা তখন অস্বস্তি বোধ করি।

জন বললো, আপনি বোধহয় একটু সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ছেন। এসব শুনতে ভাল—কিন্তু এতে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়ে না। মনে রাখবেন, যৌবনের পেশীশক্তিতেই আমাদের সমাজ এগিয়ে চলেছে।"

জন বুঝলো, "আমি কথাগুলো তেমন বরদাস্ত করতে পারছি না। সে এবার বললো, 'আপনি একজন পর্যবেক্ষক। আমেরিকার যৌবনকে সমালোচনা করার আগে আপনি দু'পক্ষের ছবি নিজের মনে এঁকে রাখুন।"

অ্যান এবার আমার হয়ে বললো, "কিন্তু জন, ভারতবর্ষে না গেলে তুমি বুঝবে না সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠদের আজও কি সম্মান দেওয়া হয়।"

জন বললো, "এক সময় ভেবে দেখবেন এই বৃদ্ধনির্ভরতা আপনাদের দেশের অনগ্রগতির কারণ কি না। রাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি সর্বত্র আপনারা বৃদ্ধদের এগিয়ে রেখেছেন—যারা দৌড়তে পারে না, যারা

নিজেদের স্বার্থের জালে জড়িয়ে আছে, যাদের চোখ সবসময় পিছনদিকে তাকিয়ে আছে তারাই আপনাদের ভাগ্যবিধাতা।"

অ্যান বললো, "জন, তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না।"

"ডার্লিং, নিষ্ঠুরতা নয়। ঈশ্বর এইভাবেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন—জোরটা যৌবনের ওপর। মধ্যগগনের সূর্যই বেশী উত্তাপ দেয়। তুমিই বলেছিলে না—ইণ্ডিয়ান ঋষিরা পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে বনে যাবার উপদেশ দিয়েছেন!"

আমি বললাম, "যতোই যুক্তি দেখাও, ভারতবর্ষের লোকেরা আজও ভাবতে পারে না তারা গুরুজনদের অবহেলা করবে।"

জন বললো, "এবার একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা বলছি। আপনাদের দেশে ক'টা লোক ষাটের বেশী বাঁচে? আর আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন—প্রতি বছরে মানুষের আয়ু বাড়ছে। ৬৫ বছরের কমবয়সী লোকদের আমরা বুড়ো বলি না—এদের সংখ্যা দু' কোটির ওপর, অর্থাৎ প্রতি একশো জনে দশ জন। তার ওপর প্রতি তিন বছরে দশ লক্ষ বুড়োবুড়ী বাড়ছে।"

বললাম, "এটা তো সৌভাগ্যের কথা—আমাদের বাবা-মা-রা যদি দীর্ঘায়ু হন।"

"কিন্তু জানেন তো আমরা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশ্বাস করি। আমার দাদু এবং দিদিমার ব্যক্তিত্ব ৮৫ বছরেও ঠিক আছে—তিনি নিজের ইচ্ছেমত জীবনযাপন করতে চান।"

রবিনস্-দম্পতির সঙ্গে ডিনারের শেষে এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। পশ্চিমী সভ্যতার গোড়ার কথাই হল ইনডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি। পরিবারটা যেন একটা ফ্যাক্টরি—যেখানে শিশুকে যুবকে পরিণত করা হয়। যৌবনই রাজেশ্বর। যৌবনসমাগমে ছেলেমেয়েরা বিবাহিত না হলেও বাবার সংসার ছেড়ে চলে যায়—অ্যাপার্টমেণ্টে তার নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী থাকে। তারপর বিয়ে হয়। সংসারের কেন্দ্রবিন্দু হলো স্বামী-স্ত্রী—যথাসময়ে সাময়িকভাবে সন্তানরা হাজির হয়। সাময়িকভাবে এইজন্যে যে, ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে বিয়ে করে সংসার ছেড়ে চলে যাবে—সংসারে পড়ে থাকবে স্বামী-স্ত্রী।

মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে যৌথ পরিবারের পক্ষে শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে

তাল রেখে চলা অসম্ভব। আগে যে ছেলেরা বাবার ওপর বেশী নির্ভর করতো তার কারণ বাবার জমিতে বা কারখানায় ছেলে কাজ করতো। অন্য কোথাও চাকরি যোগাড়ের জন্যেও বাবার ওপর নির্ভর করতে হতো। এখন বাজারে চাকরি অনেক, তার জন্যে বাবার সাহায্য-দরকার হয় না।

বিশেষজ্ঞদের আর একটি ধারণা, দরিদ্র সমাজে বুড়োদের সম্মান বেশী। দরিদ্র দেশে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি দ্রুত নয় বলে বুড়োরা কাজকর্মের ক্ষেত্রে রাতারাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু ইয়োরোপ-আমেরিকায় বিজ্ঞান ও শিল্পের এতো দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কারখানায় নতুন নতুন যন্ত্র আসছে—যাতে লোক কম লাগে। বুড়োবয়সে আবার এই মেশিন চালানো শেখা বেশ কষ্টকর। শুধু কারখানার কর্মী নয়—বিজ্ঞানী এবং এঞ্জিনীয়রদেরও একই অবস্থা। সারা জীবন ধরে তাঁরা যা শিখেছেন তা হয়তো একবছরের নতুন আবিষ্কারে পুরনো হয়ে গেলো। নতুন বিষয়ে একজন আঠাশ বছরের ছেলে হয়তো পঞ্চান্ন বছরের ম্যানেজারের থেকে অনেক বেশী জানে। প্রতিযোগিতার এই দৌড়ে বৃদ্ধকে পথ ছেড়ে দিতে হয়।

জন বললো, "অগ্রগতিটা দেখুন না—মাত্র পঁচাত্তর বছরে গোরুর গাড়ি থেকে মহাকাশচারী-রকেট। আমার ঠাকুর্দা ছোটবেলায় গরুর গাড়ি চড়ে ইস্কুলে গিয়েছেন। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার কী জানেন, নতুন যুগের ছেলেদের বুড়োদের সম্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধা নেই। কারণ বুড়োরা তাদের যুগের অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারেনি, বরং সমস্যাগুলো আরও জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আমাদের ঘাড়ে ঋণস্বরূপ চাপিয়ে দিয়ে এখন হাওয়াই বা ফ্লোরিডায় ঝিমোচ্ছেন।

বললাম, "আমাদের দেশে বলে, সব ভাল যার শেষ ভাল। আমার বাবা আমার ঘাড়ে অনেক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে মারা যান—ভারতবর্ষে বহুক্ষেত্রেই তা ঘটে—কিন্তু তা বলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা তো কমেনি। পিতৃঋণের বোঝা শোধ করা সন্তানের অন্যতম কাজ। এই ঋণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে—তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি, নাহি ভ্রষ্টে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি।"

জন বললো, "আমি কোনো মতামত দিতে চাই না। তবে এইটুকু বলতে পারি—আমাদের এই শিল্পসভ্যতায় এগিয়ে যাবার রেস এত কঠিন যে, অন্যের বোঝা নিজের মাথায় চাপালে জীবনে আনন্দ বলে কিছু থাকবে না। আপনারা পরজন্মে বিশ্বাস করেন—তাই কুড়ি বছরের স্বাধীনতায় দেশের একটু উন্নতি না হলেও আপনারা তেমন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন না। আমরা জানি আমাদের একটাই জীবন আছে—তার মধ্যেই আমি ফল পেতে চাই। আমাদের চরিত্রের এই অশান্ত ভাবটা ভাল কি মন্দ জানি না, তবে এটা সত্যি, আমেরিকা বলতে যে ঐশ্বর্যময় দেশ দেখছেন, তা কয়েকজন ঘর-পালানো অশান্ত লোকের পরিশ্রমের ফল।"

বললাম, "শুনেছি, তোমাদের দেশে বৃদ্ধরা ক্রমশঃই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এর কারণ কী?"

"কারণ সহজ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ নেই। তাঁরা যেন গত সপ্তাহের খবরের কাগজ—পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়ে পড়ে আছেন। এঁদের প্রধান কাজ আজকের ছেলেছোকরাদের দোষ দেখা।"

দেশের কথা মনে পড়ে গেলো। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা মাঝে-মাঝে দুঃখ করেন, নতুন যুগের ছেলেরা ঠিক আর তাঁদের মত নেই। তারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাদের উচ্চ আদর্শ নেই, গুরুজনে ভক্তি নেই; নিষ্ঠা নেই—আছে অনেক বেশী পরিমাণে ভোগলিপ্সা এবং বউকে খুশী করার তৎপরতা। কিন্তু তার মানে এই নয়—দুই প্রজন্মের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। দুই পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য প্রীতিবন্ধন রয়েছে যার মূল্য বিদেশে না এলে বোঝা যায় না।

রবিনস্-দম্পতির সঙ্গে কথাবার্তায় মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেলো। কারণ ওঁরা বললেন, "এই অনিবার্য পরিণতি নাকি পৃথিবীর সব সমাজের ভাগ্যেই লেখা আছে।" জন বললো, "টেকনলজির উন্নতির সঙ্গে এই সমস্যা আসবেই। জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই সামান্য ক'বছরের মধ্যে কিভাবে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে পড়লো। মেয়েরা কেমন স্বাধীন হয়ে উঠলো। কেমন করে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রীকেই বোঝাতে শুরু করছে—এই দুই পুরুষ কেমনভাবে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যদিও এখনও পুরনো দিনের মধুর স্মৃতি সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে যায়নি।"

ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরে এসে গম্ভীর হয়ে বসেছিলাম। গৃহস্বামী মণিবাবু বললেন, "ভাল-মন্দ মতামত দেবার এক্তিয়ার নেই আমাদের সায়েন্সে।"

মণিবাবু বলেছিলেন, "শুধু দেখে যান—কোনো কিছুতে অভিভূত হয়ে পড়বেন না। এখন খাওয়া-দাওয়া করুন, নিউইয়র্কের নাচ-গান থিয়েটার উপভোগ করুন—তারপর সুযোগ বুঝে ভ্রমণের মধ্যে কোথাও একটা বৃদ্ধনিবাস দেখে আসবেন, তীর্থদর্শনের কাজ হবে।"

মণিবাবুর পরামর্শটা ভুলিনি। নিউ ইয়র্ক থেকে বেরিয়ে সপ্তাহখানেক পরে মাঝ-আমেরিকায় দু'একটা ওল্ড এজ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

হোমের ম্যানেজার আমাকে সৌজন্যের সঙ্গে স্বাগতম্ জানালেন। হোমের পঞ্চাশ জন বাসিন্দা। "আসলে একটা বিশেষ ধরনের হোটেল বলতে পারেন। কেউ সিঙ্গেলরুমে থাকেন—কেউ বা দু'জনে একটা ঘরে থাকেন। মাথাপিছু খরচ মাসে অন্ততঃ ২২৫০ টাকা।" ম্যানেজার বললেন, "আমরা খুব কম খরচেই রাখি, বুঝতে পারছেন।"

বললাম, "একটু ঘুরে দেখতে পারি?"

ভদ্রলোক রাজী হলেন, কিন্তু মনের মধ্যে একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব লক্ষ্য করলাম।

বললাম, "আপনার মনে কোনো দ্বিধা আছে নাকি?"

"না। তবে কি জানেন, বার্ধক্য তো মানুষের সেরা সময় নয়। সুতরাং আপনি হতাশ হতে পারেন—এমনকি আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করতে পারেন।"

"ভদ্রমহোদয়, আপনার কাছে আমার নিবেদন—মানুষ বৃদ্ধ না হলে সুন্দর হয় না। আর আপনাকে আরও জানাতে চাই, আমি দোষ-সন্ধানী সংবাদ-লেখক নই। মাত্র আট সপ্তাহে আপনাদের এই বিরাট দেশের সব খবর সংগ্রহ করে স্বদেশে ফাঁস করবার রুচি বা আগ্রহ কোনোটাই

আমার নেই। আমি সমস্ত জীবন ধরে মানব-জীবনের আলো-আঁধারিকে মনের ক্যামেরায় ধরতে চাইছি—এবং কখনও কখনও তার এক-আধটা আমার পাঠকদের কাছে নিবেদন করি। আপনি বিশ্বাস করুন, মানুষকে হেয় করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সন্ধানে এখানে আসিনি।"

মিস্টার ল্যারি বেশ লজ্জা পেলেন। আমিও কথাগুলো হুড়-হুড় করে বলে ফেলে লজ্জাবোধ করলাম। এতই স্পর্শকাতর হওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়।

মিষ্টার ল্যারি বললেন, "এখন চায়ের সময়। ওঁদের অনেককে বাহিরে দেখতে পাওয়া যাবে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে হোমের বারান্দায় দেখলাম জনাপনেরো পুরুষ ও মহিলা অতিবৃদ্ধ পাখির মত জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সকলের দৃষ্টি গেটের দিকে। দু'একজন মোটা চশমার আড়াল থেকে খবরের কাগজ পড়ছেন।

একজন বৃদ্ধের সঙ্গে মিস্টার ল্যারি আলাপ করিয়ে দিলেন। "মিস্টার জান্‌টম্যান, আপনার সঙ্গে একজন ভারতীয় সাহিত্যিক বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিতে চাই। সরকারের আমন্ত্রণে ইনি আমাদের দেশ দেখে বেড়াচ্ছেন।"

মিস্টার জান্‌টম্যান কথাটা তেমন কানে নিলেন না। বললেন, "মিঃ ল্যারি, তোমার কি মনে হয় আমার ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে?"

"উনি তো পনেরো দিন আগেও একবার এসেছিলেন। আপনি নিজেই তো তাঁকে বললেন, ঘন-ঘন এখানে আমাকে দেখতে এসে তোমার উইক-এণ্ডগুলো নষ্ট করো না।"

বৃদ্ধ জান্‌টম্যান বিরক্ত হলেন। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "সেটা তো আর মন থেকে বলিনি। ওর স্ত্রীর গোমড়ামুখ দেখে বলেছিলাম।"

মিঃ ল্যারি আমাকে বললেন, "মিঃ জান্‌টম্যান অত্যন্ত পণ্ডিত লোক—আমাদের স্থানীয় কাগজ মিডওয়েস্ট ট্রিবিউনের সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন।"

"সে সব অনেকদিন আগেকার কথা। সম্পাদনার সঙ্গে কুড়ি বছর আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এক সময় হুড়মুড় করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

লিখতাম—আর বিশ্বাস করবেন এখন নিজের নামটাও ভাল করে লিখতে পারি না। হাত কাঁপে। *Such is god's will !*'

"না না, আপনার চেকগুলো তো সুন্দরভাবে সই করেন, একটাও তো ফিরে আসে না," ল্যারি ওঁকে আশ্বাস দিলেন।

জান্‌টম্যান বললেন, "আগে বই পড়তাম। তিনমাস হলো তাও পারছি না। চোখের দৃষ্টি কমে আসছে।"

"আপনি ইণ্ডিয়া থেকে এসেছেন? নেহরুর মেয়ে কেমন কাজ করছে? গ্যাণ্ডীকে আপনারা মনে রেখেছেন? জানেন, মিডওয়েস্ট ট্রিবিউনে আমার শেষ সম্পাদকীয় কার ওপর ছিল? সেদিন আমার চাকরির শেষ দিন, ভেবেছিলাম চুপচাপ বসে স্মৃতি-চারণ করে কাটিয়ে দেবো। এমন সময় টেলিপ্রিন্টারে খবর এল গ্যাণ্ডি নেই—তাঁকে খুন করা হয়েছে। আমি আর পারলাম না—আবার লিখতে শুরু করলাম। সেদিন সম্পাদকীয়ের নাম দিয়েছিলাম—যীশুর পদচিহ্ন। ক্রাইস্টের পদচিহ্ন ধরেই তো তিনি এসেছিলেন। পৃথিবীর মানুষ আমরা তাঁকে আবার হত্যা করলাম।"

মিঃ ল্যারি অধৈর্য হয়ে উঠলেন। বললেন, "মিঃ জান্‌টম্যান, আমাদের আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।"

আমি বললাম, "যাবার সময় আবার ঘুরে যাবো।"

"আচ্ছা, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।"

আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে আবার থামলাম। সেখানে এক ভদ্রলোক তাসের মত সাজিয়ে অনেকগুলো ফটো দেখছেন। "আপনার নাতি-নাতনীরা কেমন আছে, মিঃ সিডেনহাম?"

"গ্রেট। বড়ো নাতনী এই উইক-এণ্ডে ডেটিং শুরু করছে। আমি আশা করছি কালকেই ফোন পাবো। বাই-দি-বাই, আমার স্ত্রীর কোনো খবর পেলেন?"

"এখনও পাইনি। এলেই জানাবো।" মিস্টার ল্যারি এবার আমার কানে ফিস ফিস করে বললেন, "ওর স্ত্রীর ক্যানসার। যে কোনোদিন শেষ খবর আসবে।"

মিসেস ড্যাভেনপোর্ট একটা চেয়ারে বসে রুমালে ফুল তুলছেন।

পরিচয়ের চেষ্টা করতেই বললেন, "আই অ্যাম স্যরি জেন্টলম্যান, তোমার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারবো না—আমাকে এই সপ্তাহের মধ্যে আটখানা রুমাল শেষ করতেই হবে—অ্যাডভ্যান্স দাম নিয়ে নিয়েছি। আমি কাজ করি, তুমি ততক্ষণ বরং আমার ছেলে যে 'ভালো-হয়ে-ওঠো' কার্ড পাঠিয়েছে দেখো। কী সুন্দর কার্ডখানা। হীরের টুকরো ছেলে, তাই না? একদিন আমার একটু শরীর খারাপ হয়েছে অমনি 'গেট-ওয়েল কার্ড' পোষ্ট করেছে।"

"মহাশয়, সময় হলে এদিকেও একটু আসবেন।"

গলার আওয়াজ শুনে সেদিকেই গেলাম। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বয়সের চাপে কুঁজো হয়ে গিয়েছেন। চোখদুটো ধক ধক করে জ্বলছে। মিঃ ল্যারি জানালেন, ওঁর স্ত্রী দু'মাস হল দেহ রেখেছেন।"

"হাউ ডু ইউ ডু!" দু'জনের করমর্দন হলো।

মিস্টার ক্রসবি বললেন, "লেখক? আমার সময় আপনারা ক্রেডিট-ওয়ার্দি ছিলেন না। ব্যাংকে এসে একবার একজন বললেন, আমি লেখক। আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি জমা রেখে কিছু টাকা ধার দাও। আমি দিতে পারিনি।"

মিঃ ল্যারি জানালেন, উনি আমাদের ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন।"

"ওসব বলে এখন লাভ কি?" ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন।

"অবসর আপনার কেমন লাগছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বিনাশ্রম কারাদণ্ডের মত।"

"আপনার কী খারাপ লাগছে? আপনি তো যা-খুশী তাই করতে পারেন।"

হেসে ফেললেন মিঃ ক্রসবি। "আমাকে আর স্তোক বাক্য দেবেন না, ইয়ংম্যান। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, একদিন আমার মতো আপনারও সময়ের কোনো দাম থাকবে না। একজন আমেরিকানের পক্ষে এর থেকে দুঃখের কী হতে পারে—যেদিন সে বলে ওঠে, অ্যালাস্! মাই টাইম হ্যাজ নো ভ্যালু।"

মিঃ ল্যারি কানে কানে উপদেশ দিলেন, "এঁদের সঙ্গে বেশী কথা বলবেন না। এঁরা তাহলে আপনাকে ছাড়বেন না। বৃদ্ধরা বাইরের বিশ্বের

লোকের আশায় এখানে প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকেন। ওঁরা আমাদের সভ্যতা থেকে যেন অনেক দূরে নির্বাসিত হয়ে আছেন। এঁদের কেউ-কেউ ভাগ্যবান—ছেলেমেয়েরা নিয়মিত দেখে যায় বা ফোন করে। কেউ কেউ মাসের পর মাস একলা বসে থাকেন। বড়দিনের সময় আমরা চেষ্টা করি যাতে সবাই কোনো না কোনো পরিবারে নেমন্তন্ন পান।"

"এঁরা এখানে তাহলে কী করেন?" আমি প্রশ্ন করি।

মিঃ ল্যারি বললেন, "এঁরা সবাই মৃত্যুর ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন।"

আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। জানতে চাইলাম, "এঁরা দুঃখ পান না?"

"কেন কষ্ট পাবেন? জীবন যে এইভাবে শেষ হবে, তা তো আমরা প্রত্যেকেই জানি। এঁদের বাবা-মা তো এইভাবেই বিদায় নিয়েছেন, যৌবনে এঁরাও তাঁদের বাবা-মাকে এমনিভাবেই দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এই তো প্রকৃতির নিয়ম।"

মনে মনে বললাম, তাই বুঝি! একেই বলে সভ্যতা!

আমার মন এত খারাপ হয়ে গেলো যে আর তাকাতে পারছিলাম না। বললাম, "যথেষ্ট হয়েছে মিঃ ল্যারি—এবার ফিরে চলুন।"

মিঃ ল্যারি বললেন, "এঁদের ব্যস্ত রাখবার জন্যে আমরা নানা প্রোগ্রাম করেছি—আমাদের রিপোর্টে তার বিবরণ পাবেন।"

বললাম, "বাঃ, চমৎকার!"

মিঃ ল্যারির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোবার পরে দেখলাম, গেটের কাছে একটা ডেক-চেয়ারে মিডওয়েস্ট ট্রিবিউনের একটা-দুর্দান্ত সহযোগী-সম্পাদক মিঃ জানটম্যান আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বললেন, "আপনার জন্যে একটা পুরনো কাগজের কাটিং ফাইল থেকে নিয়ে এলাম। গ্যাণ্ডী সম্পর্কে আমার শেষ এডিটোরিয়াল। আমার এই সব জিনিষ-পত্তর কবে নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আপনি রেখে দিন। স্বদেশে গিয়ে আপনার মনে পড়ে যাবে আপনাদের মত আমরাও তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলাম।"

১৯৪৮ সালের সেই বিবর্ণ খবরের কাগজের টুকরোটা পকেটে পুরে

আমি হাঁটতে লাগলাম। আর মনে পড়ে গেলো, আমার এক দরদী মার্কিন বন্ধু আমাকে একটা লেখার উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলেন। *'The United States is too wealthy a nation, too prosperous as individuals to need the old person. He can do little for us that we cannot do ourselves.'* কথাগুলো আমার কানে বাজতে লাগলো : 'দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এতই সমৃদ্ধিশালী এবং ব্যক্তি হিসেবে আমরা এতোই সচ্ছল যে আমাদের জীবনে বৃদ্ধদের কোনো প্রয়োজন নেই। সংসারে এমন কোনো কাজ নেই যা বৃদ্ধরা পারে, অথচ আমরা পারি না।' সুতরাং কে তাদের মনে রাখবে!

লাইব্রেরী,
স্থাপিত-১৯৭৫
বাংলাদেশ

নিউ ইয়র্কের দুধ

মিসেস সুষমা চক্রবর্তীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কেই দেখা হয়ে গেলো। এবং বিদেশে বাঙালীদের যা বদভ্যাস, জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "জানি বড়ো হোটেলে অনেক আমেরিকান কেষ্টবিষ্টু তোমাকে লাঞ্চ ডিনার খাওয়াবে! কিন্তু মাঝে-মাঝে দেশের লোকদের জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আজকের রাতের খাওয়াটা আমাদের ওখানেই সারতে হবে!"

আমি তখনও গাঁই-গুঁই করছিলুম। মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "এটা মনে রেখো, সম্পর্কে আমি তোমার মাসীমা হই! বিদেশে তোমার গতি-বিধির ওপর নজর রাখার নৈতিক দায়িত্ব আমার রয়েছে। এখানে উড়ে বেড়াচ্ছো কিনা সেটা জেরা করে বার করে নিতে হবে; আর যদি না যাও তাহলে আমার যেরকম ইচ্ছে সেরকম একটা রিপোর্ট দিদির কাছে পাঠাতে হবে।"

অগত্যা রাজী হয়ে যেতে হলো। এই যুগে ব্ল্যাকমেলে কে না ভয় পায় বলুন? ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামেও কিছু রটলে তা বিশ্বাস করবার জন্যে বেশ কিছু লোক উঁচিয়ে আছে। আর আত্মীয়স্বজন? তাঁরা তো এক একটি বারুদের ঢিবি। একটি গুজবের স্ফুলিঙ্গ পেলেই হলো।

সম্পর্কে মাসীমা হলেও সুষমা চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক। দেশে যখন দেখা হতো তখন অনেক রসের কথা বলতেন। এই ধরনের রসিক মহিলা বাংলাদেশ থেকে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংসার এঁদের অভাবে এখন আরও নিরানন্দ হয়ে উঠছে। সৃষ্টির মূল কথা যেমন আনন্দ, তেমনি বেঁচে থাকার গোড়ার কথাই হলো মজা। জীবনে যদি মজাই না রইলো, তাহলে বেঁচে সুখ কী? বাংলার নবযুগের তরুণ-তরুণীরা, সংসারের চাপে পড়ে এই সার সত্যটি ভুলবেন না।

মিসেস চক্রবর্তী আমাকে ওঁদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন! বললাম, "বাঃ বেশ ভাল ফ্ল্যাটখানা যোগাড় করেছেন তো!"

"তোমার কিছু হবে না," ধমক লাগালেন মিসেস চক্রবর্তী। "ফ্ল্যাট নয়, অ্যাপার্টমেন্ট। বিলেতের তাঁবেদারিতে দুশো বছর থেকে তোমরা খাঁটি ইংরেজ হয়ে গেছো ?"

আমাকে মিসেস চক্রবর্তী মনে করিয়ে দিলেন, মার্কিন দেশে ফ্ল্যাটের ইংরিজী হলো অ্যাপার্টমেন্ট। পেট্রল হলো গ্যাস, সেডিউল হলো স্কেডিউল। আর গেরস্থ বাঙালীদের খুব সুবিধে। "ফার্স্ট ফ্লোর বলতে যে দোতলা বোঝায় তা না-জানার জন্যে বাবার কাছে বকুনি খেয়েছি! এখানে বিলিতী ভড়ং নেই, সেকেণ্ড ফ্লোর মানে দোতলা, তিনতলা নয়।"

আমি মনে মনে মিসেস চক্রবর্তীর পুরনো দিনের কথা ভাবছিলাম। মিসেস চক্রবর্তী বুঝলেন, আমার মনের মধ্যে কিছু একটা তোলপাড় খাচ্ছে। বললেন, "কি ভাবছো ? শিল্পী মানুষদের নিয়ে এই এক বিপদ ! দেখো বাপু, এখানকার রাস্তাঘাটে, যা গাড়ি, অন্যমনস্ক হয়ে বিপদ বাধিয়ে বোসো না।"

বললাম, "সুষমা মাসী, আপনার কথাই ভাবছি। মনে আছে, আপনি একা রাস্তায় বেরোতে সাহস করতেন না। হাওড়া থেকে আপনার বৌবাজারের বাপের বাড়ি যাবার দরকার হলে আমাকে এসকর্ট রাখতেন। কতবার আপনাকে বৌবাজারে পৌঁছে দিয়ে এসেছি এবং সিনেমা হাউসের দরজা থেকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছি।"

মিষ্টি হাসলেন সুষমা মাসী। বললেন, "দেখো বাপু দেশে গিয়ে যেন বদনাম ছড়িও না। এখন একা-একা নিউ ইয়র্ক সহর চষে বেড়াচ্ছি। মনের সুখে চড়বড় করে ইংরেজী চালিয়ে যাচ্ছি। কার সাধ্যি ভুল ধরে ? অথচ একবার তোমার মেসোকে পাবলিক ফোন থেকে কলকাতার অফিসে কল করতে গিয়ে ঘেমে উঠেছিলাম। ওদিক থেকে টেলিফোন অপারেটর মেমসায়েব যখন উত্তর দিলে, আমার মুখ থেকে একটা কথা বেরোল না!"

মিসেস চক্রবর্তী একটু থেমে বললেন, "এখানে বাপু শুধু শখের বাজার করতে যাই না, দরকার হলে ময়লার ড্রাম পর্যন্ত কাঁধে চড়িয়ে কর্পোরেশনের গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আগে হাওড়ার বাড়িতে দু'টো ঝি ছিল। একদিন মোক্ষদা না এলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতো। অথচ এখন কেউ নেই। একাই একশ হয়ে উঠেছি—আমিই

মোক্ষদা, আমিই বাউনদিদি, আমিই কালুয়া জমাদার, আমিই তোমার মেসোর সেক্রেটারি, গার্ল ফ্রেণ্ড, ওয়াইফ সবকিছু।”

মিসেস চক্রবর্তীর কথা আমি মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি। সত্যি, এই সামান্য কিছুদিনে সুষমা মাসী দশভূজা হয়ে উঠেছেন। রুচিও অনেক উন্নত হয়েছে। সুষমা মাসীর বাড়িতে আমি তো কতবার গিয়েছি—চারদিকে ধুলো থাকতো, দড়িতে আধময়লা গামছা, শাড়ি, ফ্রক, লুঙি ঝুলতো, চাতালে এঁটো বাসনে মাছি ভনভন করতো। এখন কেমন ঝকঝকে তকতকে সংসার পরিচালনা করছেন সুষমা মাসী।

সুষমা মাসী বললেন, “এ-জি অফিসের কর্মচারীর বউ হয়ে যে কোনোদিন আমেরিকায় আসতে পারবো তা তো কল্পনা করিনি। যখন আমার বিয়ে হলো তখন তো উনি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। মিঠু হওয়ার সময় আপার ডিভিশন হলেন। তারপর আমার খোঁচা-খোঁচিতে তিতবিরক্ত হয়ে এস-এ-এস পরীক্ষায় বসলেন। ও ছাই আবার এমন পরীক্ষা যে একবারে পাশ করে কার সাধ্যি? প্রথমবারে না পেরে উনি তো হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন। আমার চাপে পড়ে আবার দিয়ে কয়েকটা পার্ট পাশ করলেন। এবং শেষে সুপারিনটেনডেন্ট হলেন। আমরা তো জানতাম না, এইসব লোকও বিদেশে পোষ্টেড হতে পারে। এগুলো দিল্লীর স্টাফরাই এতোদিন ম্যানেজ করতো—ধরাধরি করে নিজেরাই চলে যেতো বিদেশে। এখন অন্য অন্য সরকারী অফিসেও মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিচ্ছে। আমি ওঁকে অ্যাপ্লাই করতে বললাম—ওঁর রেকর্ড ভাল। তাছাড়া ছোটবেলায় এক গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিল, তোমার সমূদ্রযাত্রা আছে।”

সুরসিকা সুষমা মাসী বললেন, “দেখো, ফললো তো?”

বললুম, “দিন না গণৎকারের ঠিকানাটা। আমিও ফিরে গিয়ে হাতটা দেখাবো।”

“তখন কি আর অত চালাক ছিলাম, তাহলে নিজেই টুকে রাখতাম। একবার মিঠুর হাতটাও দেখিয়ে নিতাম।”

“মিঠু কোথায়?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“মিঠু আর মিঠু নেই। এখন মিস লীনা চক্রবর্তী—এখানকার এক

অফিসে চাকরি করছে। জানো, মাইনে কত আমাদের মিস লীনা চক্রবর্তীর? আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছিলুম—ছ'সাত শ কিছু একটা পেলে বর্তে যাবো—দেশে তো উনিও অত টাকার মুখ দেখেননি। কিন্তু লীনাকেই দিচ্ছে ওরা ২২০০ টাকা! বারো দিয়ে গুণ করলে, বছরে ২৬৪০০ টাকা।"

আমি বললাম, "অত গুণটুন করবেন না, আমার মাথা ঘুরছে। আমাদের মিঠু ওই টাকা পাচ্ছে, আপনি না বললে আমি বিশ্বাস করতাম না।"

মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "এখানে প্রথমে এসে হাঘরের অবস্থা। আঙুর, আপেল আর মুরগী খেয়ে-খেয়ে ঘেন্না ধরে গেলো! জানো, এমন আজব দেশ যে মাছের মুড়ো কুকুরে খাবে বললে ফ্রি পাওয়া যায়। আপেলের থেকে অনেক বেশী দাম টমাটোর! মুরগী হলো গরীবের খাদ্য। যারা নিজেদের দারিদ্র্য বোঝাতে চায়, তারা বলে, জানো আমার এমন অবস্থা যে শুধু মুরগী খেয়ে পেট ভরাতে হয়েছে। আর দুধ তো ভেসে যাচ্ছে। একেবারে খাঁটি দুধ আমার বাড়িতে, সব সময় রসগোল্লা সন্দেশ তৈরী করে ফ্রিজে রাখি। ওই যে ফ্রিজ দেখছো, ভেবো না গাঁটের পয়সা খরচা করে কিনেছি। বাড়ি ভাড়ার সঙ্গেই ওভেন, ফ্রিজ এসব পাওয়া যায়। আর বাইরে যত শীতই হোক, গায়ে কম্বল চাপাবার দরকার নেই—ফাউ সেণ্ট্রাল হিটিং রয়েছে। রেগুলেটার ঘুরিয়ে নিজের ইচ্ছে মত গরম করে নাও। কল টিপলেই গরম জল। ঠাণ্ডা জলও রয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতেই টেলিফোন। আমরা টেলিভিশনও নিয়েছি। ওঁর গাড়ি হয়েছে একটা—যে গাড়ি দেশে রাজা মহারাজা এবং ফিল্মষ্টাররা চড়ে। সুতরাং সুখের শেষ নেই।"

বললাম, "কুষ্ঠিতে ছিল, ভোগ করছেন। মেসোকে বলুন, যাতে বেশীদিন থাকা যায় তার চেষ্টা করতে।

"আমাদের দু'বছর হলো, এই টার্মে আর এক-বছর। কিন্তু রক্ষে করো বাপু, আর একটি বছর নমোনমো করে কাটিয়ে ঘরে ফিরলে বাঁচি।"

সুষমা মাসীকে মৃদু বকুনি লাগালাম। "এটা কি অকৃতজ্ঞতা হলো না? এই সোনার দেশ, এখানে এতো সুখ পাচ্ছেন। তবু আপনারা সন্তুষ্ট নন!"

সুষমা মাসী বললেন, "দেশে খাবার নেই, জিনিসের দাম বাড়ছে। রেশন কার্ড হাতে করে প্রত্যেক সপ্তাহে লাইনে দাঁড়াতে হবে, দুধে ভেজাল—সব সত্যি। কিন্তু আমি ফিরতে পারলে বাঁচি।"

বললাম, "মাসী, ইস্কুলে পড়েছিলাম—স্বদেশের প্রেম যত সেই মাত্র অবগত বিদেশেতে অধিবাস যার।"

সুষমা মাসী বললেন, "আমি বাপু দেশপ্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি না। দেশের জন্যে দেশে ফিরতে চাই না। নিজের ঘরসংসারের কথা ভেবেই আমাকে দেশে ফিরতে হবে।

মদকে সুষমা মাসীর খুব ভয় জানতাম। বললাম, "কেন ? মেসো এই দারুণ শীতে একটু মদিরা পান করছেন নাকি ?"

দেখলুম, মাসীমা এই দু'বছরেই অনেক উদার মতাবলম্বিনী হয়েছেন ! বললেন, "ড্রিংকস তো আমরা বাড়িতে রেখেছি। যদিও উনি খান না—তবে বন্ধুবান্ধব এলে অফার করতে হয়। মদ খাওয়াটা এমন কিছু খারাপ নয়, খারাপ মাতাল হওয়াটা।"

"যেমন কাটলেট। খাওয়াটা খারাপ নয়, কিন্তু তা বলে বেশী খেয়ে পেট খারাপ করা ঠিক নয়," আমি মন্তব্য করলাম।

মাসী বললেন, "তোমরা তো আর্টিস্ট মানুষ ! তোমাদের লাইনে তো ওসব চলে। যদি খেতে চাও একটু নিতে পারো।"

বললাম, "মদ খেতে অতি বিশ্রী লাগে, তাই খাই না। আমি শিবরাম চক্রবর্তীর দলে। উনি বলেছিলেন, নেশা যদি করতেই হয় রাবড়ির নেশা করো।"

হেসে ফেললেন মাসীমা। "সত্যি, শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা আমার খুব ভাল লাগে। মিঠুও ওর খুব ভক্ত।"

শিবরাম চক্রবর্তীর খবরাখবর দিলাম মাসীমাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার এদেশে কেন অরুচি হলো ?"

একটু চিন্তা করলেন মাসীমা। তারপর বললেন, "হাজার হোক তুমি গল্প-টল্প লেখো, সুতরাং তোমাকে আর ছোট ভাবা ঠিক নয়। তোমাকে সব বলা যায়। আমার একটা ঘটনার কথা বলি, তার থেকেই ভয় পেয়ে গিয়েছি।"

মাসীমা আরম্ভ করলেন—।

এখানে একা থেকে-থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। টেলিফোনে দু'একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে গল্প-টল্প করি, ন'মাসে ছ'মাসে দেখাও হয়। কিন্তু তাতে দিন চলে না। তাই এই বাড়ির আমেরিকান গিন্নীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে হয়েছে।

লক্ষ্মী পুজোর দিনে আমাদের বাড়িতে কিছু রান্না করেছিলাম। সেগুলো নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে মিসেস ডসন-এর ওখানে হাজির হলাম। মিসেস ডসনকে বললাম, "আমাদের দেশে এই রীতি। পুজোর প্রসাদ প্রতিবেশীকে দিতে হয়।" উনি আনন্দ করে নিলেন। বললেন, "খুব খুশী হলাম।" সেই থেকে ভাব হয়ে গেলো। উনি সময় পেলে আমাদের এখানে আসেন। আমার কাছ থেকে ইণ্ডিয়ান কারি আর পরোটা করা শিখেছেন।

মিস্টার ডসন মোটামুটি ভাল কাজকর্ম করেন। দু'খানা গাড়ি আছে। তবু ছেলেটা সকালে খবরের কাগজ বিক্রি করে। বয়স এগারো বার বছর। এই দারুণ শীতেও ভোরবেলায় উঠে সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর আমেরিকার কাগজ দেখেছো তো—রবিবারে দুশো আড়াইশো পাতা থাকে। এখানে যদি পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি হতো তাহলে বড়লোক হয়ে যেতাম। এইগন্ধমাদন পর্বত বাড়ি-বাড়ি দিয়ে আসা সোজা কাজ নয়। একদিন ছেলেটার অসুখ হলো, মিস্টার ডসন নিজেই দেখলাম ছেলের কাগজ বিক্রি করতে চলে গেলেন। একটুও লজ্জা নেই। শুনলাম প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নাকি ছেলেবেলায় এমন কাগজের হকার ছিলেন। ভগবান জানেন!

ওদের মেয়ের নাম এলিজাবেথ। লিজা বলে ডাকে। বয়েস চৌদ্দ পনের। মেয়েটা দেখতে শুনতে বেশ। এরা ছোট বেলা থেকে খায় দায় ভাল—তাই কাঠামোটা খুব মজবুত। হুড় হুড় করে বেড়ে ওঠে। সমস্ত জাতটাই নাকি ক্রমশঃ লম্বা হচ্ছে।

লিজা প্রায়ই খুকুর কাছে আছে। বাড়িতে তার অবাধ স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশ, তাই ছেলেমেয়েরাও সংসারে অনেক স্বাধীন। তবে স্বাবলম্বীও বটে। আমাদের বাড়ির ছেলেরা যেমন এক গ্লাস জল গড়িয়ে খায় না, তাদের জামাকাপড়ের খোঁজও মাকে রাখতে হয়, এখানে

তা নয়! সবারই নিজের নিজের রুচি। ছোট ছেলেমেয়েকেও মায়েরা বলে, ইট ইজ ইয়োর ডল! সুতরাং পুতুলকে ঠিকভাবে রাখার দায়িত্ব তোমার। যত তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো তার চেষ্টা করো, এই হচ্ছে বক্তব্য।

লিজা একলা স্কুলে যায়। হৈ চৈ করে, সাইকেল চালিয়ে বেড়াতে বেরোয়। একেবারে স্বাধীন বলতে যা বোঝায়।

মিসেস চক্রবর্তীর গল্পে এবার বাধা পড়লো। বাহিরে বেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে দিতেই মিঠুর প্রবেশ। মিঠুকে অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। এখন অনেক পাল্টে গিয়েছে। মাসী বললেন, "এই হচ্ছে আমাদের কুমারী লীনা চক্রবর্তী।" মিঠুকে বললেন, "তোর শংকরদাকে মনে পড়ে? যখন হাওড়ার বাসায় থাকতিস তখন প্রায়ই আসতেন। তোকে শুঁটকী বলে রাগাতো।"

লীনা হেসে ফেললো। বললো, "সব মনে আছে। আমাকে যারা যারা ভুগিয়েছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবো!"

বললুম "দেখো বাবা, টেকো বলে এখন বদলা নিও না।"

"তোমার এমন কিছু টাক পড়েনি।" সান্ত্বনা দিলেন মাসী।

"আর তা ছাড়া লেখকের টাক হলে কদর বাড়বে। লোকে বলবে প্রবীণ অভিজ্ঞ লেখক।" লীনা মন্তব্য করলো।

বললুম, "মাসী, আপনার মেয়ে আপনার মতই সুরসিকা হচ্ছে। কথাবার্তায় আপনাকে একদিন হারিয়ে দেবে।"

"অনেক ব্যাপারেই হারিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে মোটর চালাবার লাইসেন্স নিয়েছে। আমার তো যা ভয় লাগে! আমি বলে দিয়েছি, লাইসেন্স করেছো করেছো, কিন্তু তা বলে গাড়ি চালাতে দিচ্ছি না।"

লীনা দেখলাম নাইলনের শাড়ি পরেছে। লম্বায় সে মাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। বেশ লাবণ্যময়ী। যদিও রংটা মায়ের তুলনায় সামান্য চাপা। কিন্তু টানা-টানা চোখে রূপসী বাংলার শ্যামশ্রী ছড়িয়ে রয়েছে। মার্কিন প্রাচুর্যের পরিবেশে শরীরটাও বেশ সুন্দর হয়েছে।

"কেমন লাগছে অফিসের চাকরি?" জিজ্ঞেস করি লীনাকে।

"বড্ড খাটিয়ে নেয়, কিন্তু মাসে ২২০০ টাকা ভাবলেই আর খারাপ লাগে না।"

"আজকে এলি কী করে?" মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন।

"টিউবেই চলে এলাম।"

"অফিসের সেই আমেরিকান ছেলেটা আবার লিফট দেবার কথা বলেনি তো?" মায়ের ব্যাকুল প্রশ্ন।

"বললেই শুনছে কে?" উত্তর দিল লীনা। লীনা বললো, "আজকে আপনার কাছে অনেক গল্প শুনবো, শংকরদা। পালাবেন না যেন। আমি স্নান সেরে আসি।"

লীনা চলে যেতেই মাসী বললেন, "মেয়ের আমার সব ভাল, শুধু যদি আর একটু ফর্সা হতো। তোমরা তো অনেককে চেনো—একটু ভাল ছেলেটেলের খোঁজ দিও।"

"পাত্রী আমেরিকায় চাকরি করছে শুনলে আই-সি-এস, কভেনেণ্টেড অফিসার, চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্ট সবাই সুড়সুড় করে এসে জড়ো হবে?" আমি আশ্বাস দিই।

"তুমি তো জানো আমাদের সাশ্রয় বলে কিছু ছিল না। এখানে এসে লীনা যা জমাচ্ছে তাতেই বিয়েটা হয়ে যাবে। কী বল্?"

"আলবৎ", আমি বলি।

আমার চাকরি-বাকরি করতে দেবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। যা কাঁচাখেগো ছোঁড়াদের দেশ। কিন্তু বাড়িতে বসে থেকেই বা করবে কী? এখানে সব মেয়েই তো বয় ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে ডেট করছে।"

মাসীমা জানালেন, "আমার মেয়েকে অন্যভাবে মানুষ করেছি। মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলতে পারে। আর ওর শাড়িই হয়েছে কাল! যেখানে যায় নজরে পড়ে যায়। শাড়ির জন্য এখানকার লোকরা পাগল!"

নতুন জামা কাপড় হাতে আমাদের সামনে দিয়েই লীনা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

মাসীমা বললেন, "মিঠু বেরোবার আগে তোমাকে মিসেস ডসনের ব্যাপারটা যা বলছিলাম শেষ করে ফেলি। ওঁর মেয়ের চুল সোনালী।

চোখগুলো কটা। ইস্কুল থেকে ফিরেই হৈ-হুল্লোড় করছে। ওর নিজের একটা ঘর আছে। সেখানে বসে বসে ছবি আঁকে।”

সেদিন বিকেলে ওদের ঘরে বসেই গল্প করছিলাম। মিষ্টার ডসন ট্যুরে গিয়েছেন। গিন্নী হাফ প্যান্ট পরে ঘরদোর পরিষ্কার করলেন। তারপর আমাকে টেবিলে বসিয়ে দু'কাপ কফি তৈরি করলেন। মেয়ে এদিকে ঘরের মধ্যে ড্রেস করছিল।

বললাম, “আজ লিজা যে ড্রেসে অনেক সময় নিচ্ছে?”

মিসেস ডসন বললেন, “আজ ওদের পার্টি আছে। ওদের এক বন্ধুর জন্মদিন। তাই অনেক রাত ধরে নাচগান হবে।” মিসেস ডসন আরও জানালেন, মেয়ে তাঁর নৃত্যপটিয়সী! খুব ভাল কথাও বলে। তাই ওর ডেট পাবার জন্য ছেলেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি।

আমি বললাম, “আমার মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা।” মিসেস ডসন আমার কথার উল্টো মানে বুঝলেন। বললেন, “চিন্তারই কথা। এতো বয়স হলো এখনও তোমার মেয়ের বয়ফ্রেণ্ড হলো না। ডেট নেই।” আমি বললাম, “আমাদের দেশে ডেটিং নেই। বিয়ে দেওয়াটা বাবা-মায়ের দায়িত্ব।” মিসেস ডসন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, বললেন, “আমার মেয়ে কাকে বিয়ে করবে তার মধ্যে আমি নাক গলাতে যাবো কেন?”

লিজা এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখের মেকআপটা ঠিক হয়েছে কিনা সেটা মাকে দেখিয়ে নেবার জন্যে। মা আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে অভিজ্ঞ জহুরীর মতো অনেকক্ষণ মেয়ের মুখ দেখলেন। তারপর বললেন, এয়ার ব্রাশটা একবার হাল্কাভাবে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে।

এরপর আঁটসাট জামা পরে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেশবাস করে কিশোরী কন্যা যখন বেরিয়ে এলো নিজের ঘর থেকে, তখন মায়ের বুক গর্বে ভরে উঠলো। বললেন, “তোমাকে ঠিক পরীর মতো দেখাচ্ছে, সোনা।”

কন্যার গণ্ড একটু রাঙা করলো। মেয়েকে এবার খাবার টেবিলে বসিয়ে বললেন, “যদি কিছু মনে না করো, আজকে কোন ছেলেটিকে ডেট দিয়েছো তুমি?”

“ডেভিডকে। খুব ভাল ছেলে। আমার থেকে একবছরের ছোট। খুব ভাল ফুটবল খেলে। সামনের বছর নিশ্চয় ইস্কুলটীমের ক্যাপ্টেন হবে।”

মা বললেন, "তাই নাকি? তাহলে খুবই গর্বের কথা। ওর বাবা মা তো মুদিখানার দোকানটা চালান। তাই না?"

"ঠিক ধরেছো মা। ডেভিড তো এখনই আসবে, দেখো কী রকম হ্যাণ্ডসাম। শুধু ওর সামনের দাঁত ক'টা এবড়ো-খেবড়ো। এবড়ো-খেবড়ো দাঁত আমার বিশ্রী লাগে। ডেভিড ওর মাকে বলেছে। সামনের সপ্তাহে ডেনটিস্টের কাছে যাবে। আজকাল ডেনটিস্টরা তো যে কোনো দাঁতকে সোজা করে দিচ্ছে।"

মেয়ের জন্যে সামান্য খাবার নিয়ে এলেন মিসেস ডসন। মেয়ে খেতে আরম্ভ করলে আলতো ভাবে। মা বললেন, "এখনও সময় রয়েছে। খাওয়া শেষ করে চোখের চুলগুলো পাল্টে ফেলো। ঠিক ম্যাচ করছে না। ঠোঁটে আর একটু লিপষ্টিক দিয়ে নাও।" মিসেস ডসন আমাকে বললেন, "এক মিনিট।"

ভিতরে গিয়ে দু' একমিনিট কী খুটখাট করলেন। তারপর এক গেলাস দুধ নিয়ে ফিরলেন। গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "বাছা, এইটা এবার খেয়ে নাও।"

"দুধ!" মেয়ে যেন আঁতকে উঠলো।

"তুমি পাগল হয়েছো মা, এখন আমি দুধ খাবো?" মেয়ে বেশ রেগে উঠলো।

"সোনা মেয়ে, সকালে আজ দুধ খেতে ভুলে গিয়েছো, এখন খাও।"

মেয়ে বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলো। "সকালে দুধ খাইনি বলে এখন খেতে হবে তেমন কোনো আইন নেই।"

"না বাছা, দুধ তোমাদের বয়সে খাওয়া উচিত।" মা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

মেয়ে বললে, "মা, তুমি কি চাও তোমার মেয়ে একটা কুমড়ীপটাস হয়? আমি এই মাত্র ওজন নিলাম। আমার একপাউণ্ড ওজন বেড়ে গেছে।"

"সে তো ভাল কথা, বাছা।"

"নিজে তো কেমন ছিপছিপে সুন্দরীটি রয়েছো। আমার জামাকাপড় সব এত টাইট হয়ে গিয়েছে যে বলবার নয়।"

মা আবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "দুধ খাও বাছা। তোমাদের তো এখন বাড়বারই বয়স। শরীর এখন ক্রমশঃ নারীত্বের সৌন্দর্যকে ডেকে আনবে।"

"ওসব বাজে কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না। এই বাড়তি একপাউণ্ডটা আমার হিপে জমা হয়েছে। এটা মোটেই ভাল নয়।"

মা বললেন, "বাছা, এই দুধে ক্যালরি তেমন নেই। তুমি লক্ষী মেয়ের মতো খেয়ে নাও।" মেয়ের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মা তখন বললেন, "ক্যালরির জন্যে যদি এতো চিন্তা, তাহলে পেষ্ট্রি থাক, তার বদলে দুধ খাও।"

মেয়ে পেষ্ট্রিটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, "দুধ আর পেষ্ট্রি এক জিনিস না মা। পেষ্ট্রি আমি খাবোই।"

মিসেস ডসন যে দুধ খাওয়াবার জন্যে কেন এতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন ভগবান জানেন। আর তেমনি হয়েছে মেয়েটা। মাকে পাত্তাই দিলো না।

ইতিমধ্যে ডেভিড নামক বালক স্যুট পরে হাজির হলো। মাথার চুলগুলো ছোট-ছোট করে ছাঁটা। এইটুকু ছেলে এই মেয়ের সঙ্গে ডেটিং-এ বেরোচ্ছে ভাবতে আমার হাসি লাগছিল। কিন্তু তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মিসেস ডসন জিজ্ঞেস করলেন, সে কিছু খাবে নাকি। ডেভিড রাজী হলো না।

লিজা এবার টেবিল থেকে উঠে ঘরে চলে গেলো আই ল্যাশ পাল্টাতে। যাবার আগে বললে, "ডেভিড, আমি এক মিনিটের বেশী সময় নেবো না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লিজা বেরিয়ে এলো। মিসেস ডসনের মাথায় তখন যেন ভূত চেপেছে। দরজা পর্যন্ত দুধটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'লিজা, আমার কথা শুনে দুধটা খেয়ে নাও।"

মেয়ে রাজী হলো না। তখন হতাশ হয়ে মা তাঁর আনুষ্ঠানিক কর্তব্য করলেন। বললেন, 'হ্যাভ এ গুড টাইম। সব কিছু এনজয় করো। আর যদি পারো রাত বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে এসো। তুমি না আসা পর্যন্ত আমার ঘুম আসবে না।"

"তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমার কাছে তো ফ্ল্যাটের চাবি রইলো।" এই কথা বলে লিজা বালকবন্ধু ডেভিডের হাত ধরে বেরিয়ে গেলো।

বিরস বদনে মিসেস ডসন তখন ছুধের গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি আর ওঁর ছুধ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারছিলাম না।

বললাম, "সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো বিব্রত হচ্ছেন কেন?"

"মোটেই সামান্য নয়।" একটা সিগারেট ধরালেন মিসেস ডসন। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, আপনার গ্রোন আপ মেয়ে রয়েছে। আজকাল ডেটিং-এ কি হয় কিছুই ঠিক নেই। ওদের এখনও বিচার-বুদ্ধি হয়নি। তাই প্রতিদিন লুকিয়ে ছুধের সঙ্গে একটা বার্থ কন্ট্রোল পিল গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিই। এই সব পিল জানেন তো নিয়মিত না খেলে কোনো কাজেই লাগে না। এই বয়সে একটা কেলেঙ্কারী হলে কী ফ্যাসাদ বলুন তো? জানাশোনা তিনটে মেয়ে পনেরো বছরের মধ্যে প্রেগনেণ্ট হয়েছে। তাদের বাপ-মায়ের অবস্থাটা ভাবুন।"

সুষমা মাসীমা এইবার থামলেন। আমাকে বললেন, "মিসেস ডসনের কথা শুনে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছে। রক্ষে করো বাপু। মাথায় থাকুন ডলার। আমি মেয়েটাকে নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

লীনা এবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, "শংকরদা আর পাঁচ মিনিট।"

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে তোর ছুধ গরম করি?"

মেয়ে বললে, "করো।"

লীনা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে মাসীমা বললেন, "মেয়ে আমার খুবই ভাল এখনও। দেশে গিয়ে জল মেশানো ভেজাল ছুধই খাবে। মাথায় থাকুক পিল মেশানো খাঁটি ছুধের দেশ।"

লাইব্রেরী, ... স্থাপিত-১৯৭২ বাংলাদেশ ... চিনা বাজার, ...

রবিশঙ্কর সম্পর্কে কথাগুলো এখানেই বলে রাখি।

রাজধানীর সর্বশক্তিমান রাজনীতিকগণ এবং বোম্বাই-এর সুদর্শন তারকাবৃন্দ যতই অস্বস্তিবোধ করুন, যদি প্রশ্ন করা হয় বিশ্বসভায় এখন সবচেয়ে খ্যাতনামা ভারতীয়র নাম কী? তাহলে সকলকে একবাক্যে উত্তর দিতে হবে: রবিশঙ্কর।

এমন একদিন ছিল যেদিন ভারতের বিখ্যাত নেতারা বিদেশেও সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতেন। আমাদের অর্থনৈতিক অ্যানিমিয়া ও নৈতিক অধঃপতন সেই স্বর্ণযুগের অবসান ঘটিয়েছে। ফলে স্বদেশে যেসব পরম শক্তিমানের স্তুতিতে আকাশবাণী মুখরিত হয়ে ওঠে, গড়ে তোপধ্বনি হয় এবং সরকারী শঙ্খঘণ্টা বাজে, বিদেশে তাঁরা কণামাত্র কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন না। বিদেশী সংবাদপত্রে ও টেলিভিশনে তাঁদের অবহেলা ভি-আই-পিদের মর্মবেদনার কারণ হয়, এবং 'মম অপমান ভারতের অপমান' বিড়বিড় করতে করতে তারা স্বদেশে ফিরে আসেন। বিদেশী প্রেস লর্ড, রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ এবং চীনা ও পাকিস্তানী কূটনীতিকদের যতই ষড়যন্ত্র থাকুক, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না—অগ্রসর ও অনগ্রসর সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আসন পাতবার মতো তেমন কোনো কাজ সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, চিত্রতারকা কেউ করে উঠতে পারছেন না। এই আপাত নৈরাশ্যের মধ্যে শিবরাত্রের সলতের মতো একটি মাত্র প্রদীপ পশ্চিমদেশের আকাশে জ্বলজ্বল করছে। তাঁর নাম আবার ঘোষণা করছি—রবিশঙ্কর।

এই যে রবিশঙ্কর কাহিনী নিবেদন করতে বসেছি তার কারণ তিনটি। প্রথম—আমার স্থির বিশ্বাস, সাম্প্রতিক কালে ভারতের সম্মানবৃদ্ধিতে রবিশঙ্কর এককভাবে যা করেছেন সে সম্পর্কে সরকার যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেননি। বাৎসরিক খেতাব তালিকার নির্বাচকমণ্ডলী এতই দৃষ্টিকৃপণ যে,

কয়েক ডজন যত্নু-মধুর সঙ্গে এই বিশ্ববিজয়ীকে একই লাইনে দাঁড় করিয়ে একটি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর সম্মান-প্রসাদ বিতরণ করেই তাঁরা সন্তুষ্ট।

আমার এক বন্ধু সন্দেহ করেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে 'ভারত রত্ন' বিবেচিত হতেন কিনা। বন্ধুর ধারণা মৃতদের সম্পর্কে দিল্লীর আমলাদের উৎসাহ জীবিতদের থেকে বেশী—কারণ মৃতরা নিরাপদ।

আমার লিখতে বসার দ্বিতীয় কারণ : শুধু সরকার নয়, দেশের জনগণ, যাঁরা কখনও দেশবাসীর কৃতিত্বে আনন্দপ্রদর্শনে কার্পণ্য করেন না, তাঁরাও রবিশঙ্করের অভাবনীয় সাফল্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত নন। বিশ্ববিজয় করে বিবেকানন্দ যখন শিয়ালদহ স্টেশনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন উৎসাহী যুবকরা তাঁর গাড়ি নিজেরা টেনেছিল। আজ শিয়ালদহ আছে, ঘোড়ার গাড়িও আছে কিন্তু যুবশক্তির মনে সব বিষয়ে ঠিক সেই উৎসাহ নেই। তৃতীয় কারণ : কবি সত্যেন্দ্রনাথ আজ জীবিত নেই। কবি বেঁচে থাকলে তাঁর "আমরা" কবিতায় আরও দুটি লাইন জুড়ে দিয়ে বাঙালী রবির বিশ্ববিজয়কে অভিনন্দিত করতেন। আমাদের যুগে কবি, সাহিত্যিকরা নানা কাজে ব্যস্ত—কোথায় কোন বাঙালী সেতারের সুরে নতুন এক দেশের হৃদয় জয় করলেন বলে কবিতা লিখতে বসতে হবে, এ কেমন কথা? আগের যুগের লেখক শিল্পীরা অনেক বোকা ছিলেন, তাই অন্যের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে লিখে বসতেন :

জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব
বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।

দেশের রাজশক্তিকে কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করার মতো শক্তি আমার নেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাজও আমার পক্ষে অসম্ভব—কারণ আমি গান বা কবিতা লিখি না। বাংলার সাহিত্যিকদের একজন হিসেবে আমি শুধু আমার আনন্দ প্রকাশ করছি।

রবিশঙ্করই প্রথম ভারতীয় যাঁর সঙ্গে আমেরিকায় আমার দেখা হয়। প্যারিসের অরলি বিমানবন্দর ত্যাগ করে, সাড়ে-সাতঘণ্টা একটানা আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে ট্রান্সওয়ার্ল্ড এয়ার লাইনস্-এর বোয়িং বিমান আমাদের নিউ ইয়র্কের কেনেডি বিমান বন্দরে নামিয়ে

দিল। নিউ ইয়র্ক আমার গন্তব্যস্থল নয়, আমি যাবো মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটনে। কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টে এক কাপ চা খাবার খোঁজখবর করছি, কারণ ওয়াশিংটনের প্লেন ছাড়তে ঘণ্টাখানেক দেরি। ঠিক সেইসময় দেখলাম আমার থেকেও দৈর্ঘ্যে ছোট সুদর্শন এক ভদ্রলোক ভারতীয় বেশে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিমানবন্দরের অনেক সাহেব তাঁর দিকে আড়চোখে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করে চলে যাচ্ছেন। এদেশে বিখ্যাত কাউকে দেখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়াটা বিশেষ শোভন নয় —কারণ গুণগ্রাহীরা এমন কিছু করতে চান না যাতে তাঁদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রাইভেসী নষ্ট হয়, বা তাঁর কোনো অসুবিধা হয়। যে-দোকান থেকে কফি কিনছিলাম, সেখানকার মহিলাটি আমার রং ও মুখ চোখের গড়ন দেখেই বুঝতে পারলেন—আমি হয় ভারতীয় না হয় পাকিস্তানী। ভদ্র-মহিলা আমার দিকে কফি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, ওই সুদর্শন ভদ্রলোকই কি আপনাদের উপমহাদেশের গর্ব রবিশঙ্কর ?"

রবিশঙ্কর ছাড়া উনি আর কে হতে পারেন ? কখনও পরিচয় না হলেও দূর থেকে গানের আসরে এক আধবার দেখেছি ওঁকে। মহিলাকে বললাম, "হ্যাঁ, উনিই রবিশঙ্কর।" কফি তৈরি বন্ধ করে ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ রবির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিদেশে বঙ্গসন্তান দেখলে আলাপ করার লোভ সামলানো শক্ত ব্যাপার। বিশেষ করে প্যারিসের অভিজ্ঞতাটা তেমন জমেনি। এগিয়ে গিয়ে তাই রবিশঙ্করের সঙ্গে কথা বললাম। রবিশঙ্কর যে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল তা জানতাম না। দেখলাম আমার লেখার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রবি দেশের খবরাখবর নিলেন। পাশেই শাড়িপরা এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। রবি ইংরিজীতে ওঁকে ডাকলেন, "কমলা, তোমার সঙ্গে একজন লেখকের আলাপ করিয়ে দিই।" আমাকে বললেন, "ইনিই কমলা চক্রবর্তী, আমার দলে আছেন। কমলা হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন, তারপর ভাঙাভাঙা মিষ্টি বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী দক্ষিণ ভারতের মেয়ে, পরে বিয়ে করেন বোম্বাই-এর এককালের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক স্বর্গীয় অমিয় চক্রবর্তীকে।

রবিশঙ্কর বললেন, "আমি এখন নিউ ইয়র্কে মাস্টারি করছি। চারদিন এখানে থাকি, তারপর উইক এণ্ডে বেরিয়ে পড়ি—নানা জায়গায় বাজাবার প্রোগ্রাম থাকে।"

কমলা জানালেন, "এখন আমরা চলেছি মন্ট্রিয়লে।"

"মন্ট্রিয়ল ? সে তো কানাডায় !"

"আজ্ঞে। তবে কানাডা আর কত দূর ? প্লেনে বেশী সময় লাগে না। আমরা সোমবার ভোরেই ফিরে আসবো। ফিরে এসেই রবি নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে ক্লাশ করতে যাবেন।"

রবি দেখলাম বেশ গল্পবাজ লোক। (যে-বাঙালী আড্ডা দিতে ভালবাসে না তাকে আমি সন্দেহের চোখে দেখি !)

রবি আমার ভ্রমণসূচির খবরাখবর নিলেন। বললাম, "এখনও পর্যন্ত কিছুই জানি না। সব ঠিক হবে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর। তবে এইটুকু জানি, ছ'মাস এই দেশে থাকছি।"

রবি আমার ঠিকানা-বইতে ওঁর বাড়ির নম্বর ও টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়ে বললেন, "যেখানেই থাকুন, নিউইয়র্কে নিশ্চয় আসবেন। তখন দেখা করার ইচ্ছে রইলো। শুধু যদি টেলিফোনে আপনার প্রোগ্রামটা একটু আগে জানিয়ে দেন। কারণ কোথায় কখন যে আছি নিজেই জানি না।"

রবিশঙ্করের প্লেন ছাড়বার সময় হলো। নিজেদের লাগেজ সামলাবার জন্যে আমরাও স্বস্থানে ফিরে এলাম।

ওয়াশিংটনের মাটিতে পা ফেলেই রবিশঙ্করের জনপ্রিয়তার নজির পেলাম। পররাষ্ট্র দপ্তরের যে-ভদ্রলোক আমাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন, তিনি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবার পথে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, রাভিশঙ্কর আমার কেউ হয় কিনা। আমাকে বলতে হলো, আমার নামের সঙ্গে একটি শংকর থাকলেও বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই।

এরপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে গিয়েছিলাম। এখানকার রেকর্ডের দোকানে খরিদ্দারদের অবাধ স্বাধীনতা। একের পর এক শেলফ রয়েছে, সেখানে আপনার পছন্দমতো রেকর্ড

নিজেই বার করে নিন। তারপর যে কোনো রেকর্ড-প্লেয়ারে লাগিয়ে রেকর্ড শুনে পছন্দ করুন। অনেক জায়গায় আবার হেডফোনের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ এই যন্ত্রে কান লাগিয়ে যত ইচ্ছে গান শুনুন—গান একমাত্র আপনিই শুনতে পাবেন, অন্য কারও অসুবিধা হবে না। এরোপ্লেনে এই কায়দায় সবাক চলচ্চিত্র দেখানো হয়—যাঁদের ছবি দেখার ইচ্ছে নেই, এতে তাঁদের বিরক্তি উদ্রেক হয় না। রেকর্ডের দোকানে নানা জনপ্রিয় শিল্পীর ছবি সাজানো, তার মধ্যে রবিশঙ্করকে উপস্থিত দেখে খুব আনন্দ হলো। আরও গর্ব হলো যখন দেখলাম একটা শেলফ আলাদা রয়েছে যেখানে কেবল তাঁর রেকর্ড। রবিশঙ্কর-শেলফ থেকে, মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ দুজন লোককে রেকর্ড টেনে বার করতে দেখলাম।

ওয়াশিংটনের এক পার্কে হিপিদের ভিড় হয়। সেখানে রবিশঙ্কর তো আধা-দেবতা। বীরপূজা বা ব্যক্তিপূজা কোনোটাই মার্কিনদেশে প্রচলিত নয়। কিন্তু এদেশের একশ্রেণীর যুবক-যুবতীর কাছে রবিশঙ্কর পরম পূজনীয় —তাই তাঁর ছবির পোষ্টার এদের ঘরে ঘরে শোভা পায়, ওঁর ছবিওয়ালা স্পেশাল বোতাম এরা বুকে এঁটে বেড়ায়। পকেটেও রবিশঙ্করের ছবি। আর মনের ইচ্ছা, হাজারখানেক টাকা জমিয়ে একটা সেতার কিনবে।

হিপিদের রবিপ্রীতি দেখেও আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, যতক্ষণ না চ্যাপেল হিলে নর্থ-ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হয়েছি। এইখানেই এক চায়ের দোকানে পনেরো বছরের ইহুদি ছোকরা ডেভিড ফ্রিডম্যানের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো।

ইউনিভার্সিটির চায়ের দোকানে মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই ; কফি সংগ্রহ করে আমি গাছের তলায় একটা টেবিলের সামনে বসেছিলাম। সেই সময় আর এক কাপ কফি হাতে ডেভিড ফ্রিডম্যান এসে আমার অনুমতি চাইলো চেয়ারে বসবার। একটু পরেই আলাপ জমে উঠলো। ডেভিড ফ্রিডম্যান নিউ ইয়র্ক থেকে মাইল পনেরো দূরে শহরতলীতে থাকে। বাবা কোনো ব্যাংকের কর্তাব্যক্তি। দাদা চ্যাপেল হিলে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। মা ও সে মাঝে-মাঝে চ্যাপেল হিলে চলে আসে। উঠেছে হোটেলে। ভারী বুদ্ধিমান ছেলেটি।

আমার নাম শুনেই ডেভিড ফ্রিডম্যান প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠলো।

"শংকর! আমার কতবড়ো সৌভাগ্য, আপনি নিশ্চয় ইণ্ডিয়ার গ্রেট রাভি-শংকরের কেউ হন!"

আমি জানালাম, "তিনি আমার কেউ হন না।"

ডেভিড ছোকরা কথাটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারলো না। বললো, "আমরা আরও কয়েকজন ইণ্ডিয়ানকে চিনি। কিন্তু শংকর টাইটেল তো বেশী দেখিনি।"

আমি বললাম, "হিন্দুদের তিনজন প্রধান দেবতার একজন শংকর। তিনি ধ্বংসের দেবতা আবার নটরাজও বটে। তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ভারতের সর্বত্র শংকর নামটি খুব সাধারণ, যদিও উপাধি হিসেবে এটি মোটেই সাধারণ নয়।"

বয়সে বালক হলে কী হয়, ডেভিড প্রখর বুদ্ধিমান। ওর টানা টানা চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বললো, "মানে?"

বললুম, "যতদূর জানি, শংকর ওঁদের পারিবারিক উপাধি নয়। তার পরে একটা চৌধুরী ছিল, যেটা ওঁর পূর্বপুরুষ ত্যাগ করেন।"

ডেভিড ফ্রিডম্যানকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, "রবিশঙ্কর আমার আত্মীয় না হলেও আমি তাঁকে চিনি। এই তো কয়েকদিন আগে নিউইয়র্কে ওঁর সঙ্গে দেখা হলো। উনি নিজের হাতে ওঁর ঠিকানা আমার ডাইরিতে লিখে দিলেন।"

ডেভিড বিশ্বাসই করতে পারছে না। বললো, "উনি নিজের হাতে লিখে দিলেন!"

বললাম, "হ্যাঁ। এতে আর আশ্চর্য কী!"

"তোমার কত বড়ো সৌভাগ্য! আচ্ছা, তুমি ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারো?"

"কেন পারবো না? তিনি নিজেই তো ফোন নম্বর দিয়ে খবর করতে বললেন।" আমি ডেভিডকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

ডেভিড বললো, "ওঁর সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু অতবড়ো ব্যস্ত শিল্পী, উনি কেন আমার মতো একজন সাধারণ ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন? আর ফোন নম্বরটাও তো গোপন! না হলে, লোকে যে ওঁকে সব সময় জ্বালাতন করবে।"

রবিশঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, এতেই আমার দাম বেশ বেড়ে গেলো। ডেভিড বললো, "আপনি যদি খুব ব্যস্ত না থাকেন তাহলে আসুন দু'জনে একটু ঘুরে বেড়াই। আপনার কাছে আমার কত কি শেখবার আছে।"

সঙ্গীতে আমার বিদ্যা যে ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত এগোয়নি, একথা ডেভিডকে বলতে সাহস হচ্ছিল না। ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে ওর মনে এক বিচিত্র রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ডেভিড পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললো, "ভারতীয় সঙ্গীতের রেকর্ড পেলেই আমি কিনে ফেলি। জানেন, আপনাদের সঙ্গীত আমাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।"

আমি গুঁইগাঁই করি। কারণ যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করে রস গ্রহণের শক্তি অর্জন করিনি। যখন এসব শেখার সময় তখন নিদারুণ দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছি। অন্নসংস্থানের জন্য প্রতিমুহূর্ত ব্যয় করেছি—শখের অবসর তখন ছিল না। আর এখন মনে হয়, বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে।

ডেভিডকে অবশ্য এসব কথা বলিনি। কিন্তু ডেভিডের কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। ডেভিডের প্রশ্ন "বোম্বাইতে রবির বাড়ি দেখেছেন আপনি? উনি তো বাড়ির নাম দিয়েছেন পাভলোভা।"

আমি জানতাম না। তাই ওর মুখের দিকে তাকালাম। ডেভিড বললো, "বিখ্যাত নর্তকী আনা পাভলোভা, যিনি ওঁর বড়ো ভাই উদয়শঙ্করকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।"

আমার আবার অবাক হবার পালা। বললুম, "এসব জানলে কী করে?"

বেচারা ডেভিড লজ্জা পেলো। বললো, "আমি আর কতটুকু জানি? তবে ওঁর জীবন সম্বন্ধে আমার এবং আমার বোনের খুব আগ্রহ, আমরা সংবাদপত্র থেকে ওঁর সম্বন্ধে খবর কেটে রেখে দিই। একটা সেতার কেনবার ইচ্ছেও আছে।"

"তোমার দেশের গান তোমার ভাল লাগে না?" আমি ডেভিডকে জিজ্ঞেস করি।

"নিশ্চয়ই। আমি সারাদিন বসে বসে পপ মিউজিক শুনতে পারি এবং আপনাদের দেশের সঙ্গীত আমাদের পপ মিউজিকে নতুন প্রাণের স্পর্শ আনবে।"

এইটুকু ছেলের সঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করে তোলে। সেতার সম্পর্কে যে অনেক খবরাখবর রেখেছে। "দুদিকে দুটো লাউ-এর খোলা থাকে। আর মধ্যিখানে আছে উনিশটা তার, যার চারটেয় সুর এবং দুটোয় তাল—বাকি তেরোটায় কেবল ঝঙ্কার ওঠে।" একটু থেমে ডেভিড বললে, "আমার দিদি ওদের কলেজের কমপিউটরে হিসেব করে দেখেছে আপনাদের বাহাত্তরটা স্কেলে মোট ৬৪,৮৪৮ রকম রাগ সম্ভব।"

রাগ-রাগিণীর অঙ্ক কষতে কমপিউটরের প্রয়োগ পশ্চিমী বুদ্ধিতেই সম্ভব—৬৪,৮৪৮ রাগের কথা শুনে তাই তাজ্জব বনে গেলাম। এরা আমাদের সঙ্গীতে আগ্রহী হয়ে উঠলে নিজেদের নিষ্ঠায় একদিন আমাদের পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে।

ডেভিডকে বললাম, "তোমার যখন এতই সেতার সম্পর্কে আগ্রহ, তখন সেতার শিখছো না কেন ?"

ডেভিড এবার বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। "আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার সেতারে ওস্তাদ হবার খুব লোভ ছিল। কিন্তু একদিন টেলিভিশনে রবিশঙ্করকে দেখে আশা ছেড়ে দিয়েছি। রবি বললেন, ১৮ থেকে ২৫, এই সাত বছর গুরুর বাড়িতে তিনি প্রতিদিন বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা সেতার অভ্যাস করেছেন। গানটা ওঁদের কাছে শখ নয়, জীবনের ধর্ম। এতেও আমি আশা ছাড়িনি। কিন্তু রবির আঙুলটা টিভিতে ক্লোজ আপে দেখানো হলো। আমি দেখলাম, অভ্যাস করে-করে ওঁর ডান হাতের আঙুলে বিরাট কড়া পড়েছে। কত বছর তারের সঙ্গে ঘর্ষণ হলে এটা সম্ভব হয়! বাঁ হাতের আঙুলের মাংসগুলো ক্ষতবিক্ষত—শুনলাম প্রায় সব সময় আয়োডিন লাগিয়ে রাখতে হয়। এরপর ওস্তাদ হবার আশা ছেড়ে দিয়েছি।"

বিদেশের রাস্তায় একটা পনেরো বছরের ছেলে আমাকে স্বদেশের সঙ্গীত সম্পর্কে যে শিক্ষা দিলো তাতে মনে মনে লজ্জা অনুভব করছিলাম। কিন্তু ডেভিডের উৎসাহে ভাঁটা পড়বার লক্ষণ নেই। সে বললো, "আমরা

তো একই হোটেলে আছি; যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হন, ডিনারের পরে আপনার ঘরে গিয়ে দেখা করবো।"

আমি রাজী হয়েছিলাম। কারণ এই বয়সের আমেরিকান ছেলেদের সম্পর্কে আমার আরও জানবার আগ্রহ ছিল। আর এরা যে এমন সঙ্গীত পাগল তাও জানা ছিল না।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই ডেভিড আমার ঘরে এসে হাজির। সঙ্গে তার দিদিকেও এনেছে। দিদি নমস্কার জানিয়ে বললো, "ডেভিডের কাছে শুনলাম, আপনি রাভিকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তাই আলাপ করতে এলাম।"

আমি ওদের বসতে বললাম। দিদির নাম রোজ। রোজ বললো, "রবিশঙ্করের কনসার্ট আমি সাতবার শুনেছি। ওঁর কনসার্টে গেলে মনে হয় যেন কোনো স্বর্গীয় পরিবেশে এসেছি। সবচেয়ে ভাল লাগে আপনাদের দেশের ধূপের গন্ধ। গান শুরু হবার আগে, শাড়ি পরে একটি মহিলা স্টেজের ওপর এসে ধূপ জ্বেলে দেন। কি সুন্দর দেখতে এই মহিলাকে, আর ভারি মিষ্টি নামটি—কমলা। আচ্ছা কমলা মানে কি? একজন ইণ্ডিয়ান বললে, নরম। ওই নরম soft চেহারা বলেই ওঁর নাম কমলা। আর একজন বললেন, অরেঞ্জ রং।"

আমি বললাম, "কমলা হচ্ছেন আমাদের দেবী লক্ষ্মী।"

"সত্যিই ওঁকে স্টেজে দেবীর মতো দেখায়। তাই না? ডেভিড এবার বলে উঠলো।

আমি বললাম, "কেবল তোমরাই রবিশঙ্করের সঙ্গীত ভালবাসো, না তোমাদের বাবা-মায়েরও এতে আগ্রহ আছে?"

রোজ হেসে ফেললো। "বাবার একটুও আগ্রহ ছিল না। প্রথমবার যখন ওঁদের জোর করে রবির বাজনা শুনতে নিয়ে গিয়েছিলাম, বাবা বললেন, এ কি বাজনা! ঘণ্টাখানেক ধরে একটা বিড়াল মিউমিউ করে গেল। আর তাছাড়া, এরা বড়ো সময় নষ্ট করে। রবিশঙ্কর সেতার রেডি করতেই স্টেজের ওপর অনেক সময় নিলেন। সেতার তৈরি করেই স্টেজে এলে হয়, তা হলে শ্রোতাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না।"

ডেভিড বললো, "বুঝুন! আমার বাবা এবং মায়ের ইণ্ডিয়ান মিউজিক সম্বন্ধে কী রকম জ্ঞান ছিল। এখন কিন্তু আমার এবং দিদির পাল্লায়

পড়ে ওঁদের কান তৈরি হয়েছে। হাজার হোক সাতশো বছর যে-যন্ত্রটা আপনাদের দেশে ব্যবহার হচ্ছে, এবং যার পিছনে আরও তেরশো বছরের সঙ্গীত ঐতিহ্য রয়েছে, আমরা তাকে কেমন করে রাতারাতি আয়ত্ত করে ফেলবো?"

রোজ এবার মুখ খুললো। "আপনার সঙ্গে দেখা করবার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার ভাই আপনাকে বলতে সঙ্কোচ করছে। রবিশঙ্করের একটা সই সংগ্রহ করার ইচ্ছে বহুদিনের। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার ডাইরিতে রবিশঙ্করের যে হাতের লেখা রয়েছে ওটা কেটে দিলে আপনার কাছে ডেভিড বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবে।"

ডেভিড ও তার দিদির আগ্রহ দেখে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। বললাম, "মোটেই আপত্তি নেই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সইটা তোমাদের দিচ্ছি।"

সইটা কেটে ডেভিডের হাতে দিতেই আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এবার ওর দিদি যা করে বসলো, তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। রোজ বললো, "শংকর, আপনি আমাদের যে ভালবাসা দেখালেন তার জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ভালবাসার সামান্য নিদর্শন হিসেবে, আপনার জন্যে একখানা লংপ্লেয়িং রেকর্ড এনেছি —ইহুদি মেনুহিন এবং রবিশঙ্করের *East Meets the West*—পূর্ব ও পশ্চিমের সাক্ষাৎ।"

আমি বেশ বিব্রত হয়ে পড়লাম, "আমাদের দেশে একটা নিয়ম আছে —বড়োরা ছোটদের দেয়, প্রতিদানে কিছু নেয় না। ছোটরা কিছু দিতে গেলে বড়োরা রেগে যায়। আমিও তোমাদের ওপর রেগে যাচ্ছি। তোমাদের রেকর্ডটা আমি নিচ্ছি না। তবে আমি রেকর্ডটা একবার শুনতে চাই।"

রোজ লজ্জা পেয়ে গেলো, কিছু বললো না। ডেভিড তড়াক করে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো, "আমার পোর্টেবল রেকর্ড-প্লেয়ারটা এখনই নিয়ে আসছি।"

রোজ বললো, "আমার ভাই এতোই গানপাগল যে সঙ্গে রেকর্ড-প্লেয়ার রাখে। লেক বা বনের মধ্যে গিয়ে মাঝে-মাঝে গান শোনে।"

"মেনুহিন রবিকে খুব শ্রদ্ধা করেন," রোজ বললো। "জানেন, এই

রেকর্ড তৈরি করবার আগে মেনহুইন দু'দিন রবির কাছে তালিম নিয়েছিলেন, আমি নিজে টাইম ম্যাগাজিনে পড়েছি।"

বললাম, "মেনহুইনের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার পিছনে এই বিশ্ববিদিত বেহালা-বাদকের যে-দান রয়েছে তা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।"

রোজ সঙ্গীতের ইতিহাস পড়ছে। ওকে বললাম, "ইদানীং কালের ভারতবর্ষে একটা আশ্চর্য জিনিস ঘটেছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের বাণী নিয়ে আমাদের কোনো মনীষী যখনই পশ্চিমের দ্বারপ্রান্তে এসেছেন তখনই তিনি একজন পশ্চিমী বন্ধু লাভ করেছেন এবং তিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমী সভ্যতার এই উদারতা আমাকে মুগ্ধ করে। ধরুন, আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গুণগ্রাহী শিল্প রোদেনস্টাইনের কথা। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা মিস মার্গারেট নোবলের কথা, পরে যিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে আমাদের হৃদয় জয় করেছিলেন। এবং এই কিছুদিন আগের উদয়শঙ্কর ও নর্তকী পাভলোভার কথা।"

রোজ আমার থেকে অনেক বেশী খবরাখবর রাখে। সে বললো, "রবির দাদা উদয় সম্পর্কে কয়েকদিন আগেই একটা প্রবন্ধ পড়লাম। অনেকেই জানেন না, উদয়শঙ্কর চিত্রশিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি লণ্ডনের রয়াল কলেজ অফ আর্টসের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি যখন বৃটিশ মিউজিয়মে পড়াশোনা করছেন সেই সময় একদিন পাভলোভার নাচ দেখলেন। দুই শিল্পীর সেই সাক্ষাৎ দু'জনের গভীর পরিবর্তন নিয়ে এলো।"

রোজ বললো, "রবিশঙ্করের জীবন সম্পর্কে তাঁর পশ্চিমী ভক্তদের গভীর আগ্রহ। তাই আজকাল কাগজে নানা খবরাখবর বেরোয়। যেমন সেদিন পড়লাম, রবিশঙ্কর জীবন শুরু করেছিলেন নাচিয়ে হিসেবে। ১৯২০ সালে ওঁর জন্ম। দশবছর বয়স থেকে দাদার সঙ্গে নাচের দলে ইউরোপে ভ্রমণ করছেন। প্যারিসে রবিশঙ্কর ফরাসী ভাষা শেখেন। রবিশঙ্কর তখন বেজায় শৌখিন বাবু। একেবারে চোস্ত সায়েবদের মতো স্যুট পরেন, গলার এক একটা টাইয়ের দাম পাঁচ ডলার।"

বললুম, "বিশ্বাস করো রোজ, শঙ্কর পরিবার সম্পর্কে তুমি আমার থেকে অনেক বেশী জানো।"

হেসে ফেললে রোজ। "আমার বিদ্যে ম্যাগাজিন পর্যন্ত। তবে পত্রপত্রিকা পড়ে জ্ঞান আহরণ করা যায় না যারা বলে আমি তাদের দলে নই। এই ম্যাগাজিনেই পড়লাম, ১৯৩৬ সালে উদয়শঙ্কর তাঁর দলে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে আমন্ত্রণ জানালেন—পশ্চিমে প্রাচ্য-সঙ্গীতের পরিচয় দেবার জন্যে। ইউরোপে খাঁ সাহেবের এক সঙ্গীতের আসরেই হঠাৎ রবিশঙ্করের বোধোদয় হলো। তিনি ঠিক করলেন, নৃত্য নয় সঙ্গীতের মধ্যেই তিনি জীবনের সত্যকে খুঁজে বার করবেন। বারাণসী ফিরে এলেন রবি, প্যারিতে তৈরি স্যুট ছেড়ে খাদি ধরলেন, মাথার অমন মনোমোহন চুল কামিয়ে ফেলে মুণ্ডিতমস্তক হলেন এবং গুরুর আশ্রম মাইহারে চললেন সাতবছরের একাগ্র সাধনায় মগ্ন হতে।"

ডেভিড ইতিমধ্যে মেনহুইন ও রবিশঙ্করের দ্বৈত সঙ্গীত শোনাবার জন্যে তার পোর্টেবল রেকর্ড-প্লেয়ার নিয়ে এসেছে। রোজ বললো, "মেনহুইনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—ভারতীয় সঙ্গীতের রত্নশালার সংবাদ তিনি পশ্চিমের কাছে নিয়ে এলেন। ভাগ্যে তিনি ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে বাজাতে গিয়েছিলেন এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মেনহুইনের চেষ্টায় রবি বাথ ফেষ্টিভ্যালে আমন্ত্রিত হন এবং সেখানেই দু'জনে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে সঙ্গীতের সেতুবন্ধনের প্রথম চেষ্টা করলেন। সেই চেষ্টার অভাবনীয় ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন।"

ডেভিডের প্লেয়ার এবার বেজে উঠলো। পূর্ব পশ্চিমের দুই দিক্‌পাল তাঁদের সেতার ও ভায়োলিনের মিলন-গীতি শুরু করলেন। রোজ ফিস ফিস করে বললো, "আপনাদের কাছে এর কোনো দাম আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে এঁরা সুরজগতের কলম্বাস, নতুন দিগন্তের সন্ধানে বেরিয়েছেন এঁরা।"

নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে পরিচিত ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা সবাই একমত, সাম্প্রতিক কালে রবিশঙ্কর ভারতবর্ষের জন্যে যা করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। রবিশঙ্করের নামে চাঞ্চল্য পড়ে

যায়। যেখানেই তিনি বাজান, কয়েকঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। কখনও কখনও এমন অবস্থা হয়, স্টেজের ওপর অনেককে বসতে হয়। তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে শুধু হিপিরাই থাকেন না—অনেক কেষ্টবিষ্টুকেও দেখা যায়। যেখানে রবি সেখানেই টিভি ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফারের হুড়োহুড়ি। আর বাইরে ঝড় বৃষ্টি বরফ উপেক্ষা করে হাজারখানেক যুবক দাঁড়িয়ে থাকে যারা ভিতরে যাবার টিকিট সংগ্রহ করতে পারেনি। তাদের অনেকে ফুল ছোড়ে, ঘণ্টা বাজায় এবং রব তোলে হরে কৃষ্ণ। হিপিদের গালাগালি করাটা শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার নিবেদন, এই উল্টোপুরাণের সবটাই পাগলামি নয়। এর পিছনে অনেক কিছু ভাববার আছে। পশ্চিমের এই যুবকযুবতীদের প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি আছে।

রবিবারের এক ভোরবেলায় রবিশঙ্করের নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেণ্টে বসে গল্প হচ্ছিল। ঘরে ছিলেন রবি, কমলা চক্রবর্তী, ওঁদের হাউসকিপার এক বর্ষীয়সী মার্কিন মহিলা এবং রবির সেক্রেটারি। আমার সঙ্গে ছিলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বের খ্যাতনামা ভারতীয় অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় মিত্র। তার আগের দিনে জ্যোতির্ময়বাবুর অ্যাপার্টমেণ্টে গল্প করতে-করতে কখন আমরা সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যে জ্যোতির্ময়বাবু তখনও বিয়ে করেননি। না হলে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হতো।

রবিশঙ্করের মধ্যে যে জিনিসটা লক্ষ্য করা যায় সেটা হলো বিশ্বব্যাপী সাফল্য ওঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। আর নিউ নিয়র্কের বিশাল বৈভবের মধ্যে বসে থেকেও তিনি স্বদেশকে ভুলে যাননি। অথচ দেশে কত লোকের ধারণা, ডলার ও পাউণ্ডের লোভেই তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জাত নষ্ট করছেন।

বললাম, "এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। জানেন তো, কালাপানি পেরোবার জন্যে রামমোহন রায়কে কত নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল। ভারতের সঙ্গীত সরস্বতীকে আপনিই তো সপ্তসমুদ্রের এপারে নিয়ে এলেন।"

রবিশঙ্কর মৃদু হাসলেন। না, কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তাঁর। বললেন, "আমার একটা গোঁ ছিল। এখনও বোধ হয় সেই গোঁ-এর জোরে এগিয়ে চলেছি।"

রবির তখন বছর পঁচিশ বয়স, ইউরোপ-প্রবাসী রবি তখনই শপথ

নিয়েছিলেন পশ্চিমের কাছে প্রাচ্যের সঙ্গীতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তরুণ বয়সে পশ্চিমের অনেক দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ—তোসচানিনি, সেগোভিয়া, ক্যাসেলস—এবং আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। সবার অভিযোগ ভারতীয় সঙ্গীত বড্ড একঘেয়ে, শুধুই পুনরাবৃত্তি।

"আমি বুঝতাম ওঁদের কথা, আমাদের সঙ্গীতে *key* চেঞ্জ হয় না, পশ্চিমী সঙ্গীতের মতো আমাদের সঙ্গীতে স্টাকাটো নোট নেই—তবু মনে দুঃখ হতো, ভাবতাম কেমন করে আমাদের অপার সঙ্গীত ঐশ্বর্য ওদের বোধগম্য করা যায়?"

রবি বললেন, "পশ্চিমীদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভারতীয় সঙ্গীতকে আমরা অবশ্যই অধঃপতনে নিয়ে যাবো না, কিন্তু ওঁদের সুবিধের জন্যে সিঁড়ি দিতে দোষ কী?"

"মেনহুইন প্রথম সুযোগ করে দিলেন। তারপর বহুদিন ধরে পশ্চিমের দরজা খুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। এগারো বছর ধরে সুযোগ পেলেই ছুটে এসেছি ইউরোপ-আমেরিকায়। তখন ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে কারও আগ্রহ ছিল না, বাজনা শোনাবার সুযোগও পাওয়া যেত না। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বছরের পর বছর বাজিয়ে অবশেষে লোকের উৎসাহ সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তখনও অনেকের ধারণা, সেতারের সুর ও অসুস্থ বেড়ালের মিউ মিউ-এর মধ্যে তফাৎ নেই।"

"তারপর একদিন অসম্ভব সম্ভব হলো। পশ্চিমের যৌবন একদিন পূর্বদেশের সঙ্গীতের জন্যে তাদের দ্বার খুলে দিলো। এই আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হলো পপ মিউজিকের রাজকুমার বিট্‌লদের জর্জ হ্যারিসনের জন্যে। জর্জ হ্যারিসনের কোটি কোটি ভক্ত। যেখানে তিনি যান সেখানে জন-সমুদ্র ভেঙে পড়ে। সেই বিট্‌ল হ্যারিসন, পৃথিবীতে এতো জিনিস থাকতে আকৃষ্ট হলেন ভারতীয় সেতারে। সেতার শেখার আগ্রহে তিনি রবিশঙ্করকে গুরু মনোনীত করলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম, সবটাই একটা স্টান্ট। ওকে সেতার শেখানো সম্পর্কে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু পরিচয় করে দেখলাম হ্যারিসনের নিষ্ঠায় কোনো ফাঁকি নেই। তখন ওকে শেখাতে আরম্ভ করলাম।" রবি বললেন।

যা করতে হয়তো একশ বছর লাগতো তা রাতারাতি সম্ভব

হলো। পপ সঙ্গীতের ভক্ত ইংলণ্ড আমেরিকার তরুণ সমাজ গ্রহণ করলেন রবিশঙ্করকে। ভারতের রবি অকস্মাৎ বিশ্বের রাভি হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে মাথায় তুলে নিলেন হিপির দল।

"এরা সবাই যে আমাদের সঙ্গীত বোঝে, তা মোটেই নয়—এদের অনেক ঘাটতি আছে—কিন্তু দরজা যখন খুলেছে তখন ঢুকে পড়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো। এর থেকেই একদিন আমরা আরও অনেক বড়ো সুযোগ পাবো।"

"নিশ্চয়ই।" আমি রবিশঙ্করের কথায় সায় দিই।

"হিপিরা যে আমাকে হঠাৎ গুরু করে তুললো তার পিছনে আমার কোনো হাত নেই। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ব্যাপারটা ঘটেছে। ফলে এ-দেশে অনেকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করলেন। অনেকের ধারণা, গাঁজা এবং এল-এস-ডির সাইকেডেলিক আনন্দের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।"

রবিশঙ্কর কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "এই জন্যেই আরও কিছু দিন এদেশে আমার থাকার প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গীত সম্পর্কে বিদগ্ধ ইংরেজ ও আমেরিকানদের কৌতূহল বাড়াতে হবে—সেই উদ্দেশ্যেই লস এঞ্জেলেসে কিন্নর ইস্কুল খুলেছি। সেই উদ্দেশ্যেই নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে এসেছি। এখানে আমার চল্লিশজন ছাত্র, কিন্তু আরও শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে, যারা অন্য বিষয়ে পড়াশুনা করে, তারাও ক্লাশ শুনতে আসে। এদের নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা যদি দেখেন! আমি ওদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের কথা বলি, ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা শোনাই। আমার সঙ্গে ওরাও ক্লাশ শুরু হবার আগে গুরু বন্দনা করে।"

রবিশঙ্কর বললেন, "হিপিদের নিয়েই আমার বিপদ। আমার বাজনার আসরে ওরা দলে দলে আসে। ওদের আমি ভালবাসি, আবার ওদের বিপথগামিতার জন্যে দুঃখও হয়। যখনই সুযোগ পাই, আমি প্রকাশ্যে জানিয়ে দিই, ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মদ ভাঙ গাঁজা আফিমের সম্পর্ক নেই। শুদ্ধ দেহ ও মনে আমরা সুরসরস্বতীর আরাধনা করি এবং সুরের পবিত্র স্রোতে অবগাহন করে আমরা যে আনন্দ পাই তার সঙ্গে রাসায়নিক সাইকেডেলিক আনন্দের অনেক তফাৎ। আমি বার বার ঘোষণা করি, আপনারা যেমন কোনো মাতালকে সিমফনি অর্কেষ্ট্রায় স্বাগত

জানান না, আমার সঙ্গীতের আসরেও তেমনি মারিজুয়ানা বা এল-এস-ডি প্রেমিকের অভিপ্রেত নয়।"

রবির বড়ো বড়ো চোখ দুটো এবার গভীর বিশ্বাসে জ্বলে উঠলো। "আমি জানি, আমার পক্ষেই এসব অপ্রিয় কাজ করা সম্ভব। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যে পপ সঙ্গীত নয় একথা আমি যদি না বোঝাই তাহলে ভারতীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বলে এদেশে কিছু থাকবে না। একটা সাময়িক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে, তা আবার উধাও হয়ে যাবে।"

কথাবার্তায় বোঝা গেলো, এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার জন্যে আমাদের দূতাবাসের কেষ্টবিষ্টু সাংস্কৃতিক এটাসিরা কিছুই করেন না। রবিশঙ্কর মস্কো ও লেনিনগ্রাদে বাজাতে গেলেন। সেখানে সঙ্গীতের আগে ঘোষণা করা হলো ঃ ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ—ভারতের প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতজ্ঞ রবিশঙ্করের সঙ্গে পরিচিত হোন। অনিল বিশ্বাস এবং শংকর জয়কিষণের মতো ইনিও ভারতীয় জনগণের হৃদয় জয় করেছেন···

বোম্বাই-এর ফিল্মী সুরসম্রাটদের সঙ্গে একাসনে বসানোর জন্যে অভিযোগ নয়—দুঃখ, আমাদের দূতরা ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিত করতে পারেন না। ফলে রবিকে বাজনা শুরু করবার আগে বলতে হলো, তিনি লোকসঙ্গীতজ্ঞ নন, তিনি ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সাধক। এই সঙ্গীতের ধারা আমাদের দেশে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে চলে আসছে।

বহুজনের মুখে রবির সঙ্গীত সম্পর্কে ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। উপস্থাপনের এই প্রতিভা তিনি সম্ভবত তাঁর দাদা উদয়শঙ্করের কাছে পেয়েছিলেন। বাজনা শুরু করবার আগে তিনি প্রায়ই ছোট্ট বক্তৃতা দেন, বুঝিয়ে দেন, ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কি, পশ্চিমী সঙ্গীতের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়, কেমন করে এর রসগ্রহণ করতে হয়।

রবি বললেন, "স্বীকার করি, আমাদের সঙ্গীতের রসগ্রহণ করতে হলে কিছুটা সঙ্গীত শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে দরজা বন্ধ করে বসে থাকাটাও আমার ভাল লাগে না। শ্রোতাদের সঙ্গে যতখানি সম্ভব ভাবের আদান-প্রদান প্রয়োজন।"

রবির কাছে শুনলাম, এই উদ্দেশ্যে তিনি একখানি বই লিখেছেন, নাম

'*My Music My Life*'—আমার সঙ্গীত আমার জীবন। রবির আত্মজীবনী ছাড়াও এতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে অনেক কথা রয়েছে যা অভারতীয়দের সাহায্য করবে।

বললাম, "অভারতীয় কেন, আমার মতো অনেক ভারতীয় এ-বিষয়ে জানতে আগ্রহী। অহেতুক পণ্ডিত সেজে থেকে নিজের অজ্ঞতাকে চেপে রাখার প্রয়োজন কী?"

কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। রবি ও আমি নানা বিষয়ে কথা বলে চলেছি। শ্রীমতী কমলা চক্রবর্তী শান্ত ভাবে শুনে যাচ্ছেন—আমাদের বাংলা উনি বেশ বুঝতে পারছেন মনে হলো।

রবি বললেন, "আমার বড়ো আনন্দ যে পশ্চিমের বন্ধ দরজা খুলতে পেরেছি। এবার আমাদের দেশের সঙ্গীত-সাধকদের কাজ হবে আমাদের যা শ্রেষ্ঠ তা এঁদের কাছে হাজির করা। কয়েকজন গুণী সেই কাজ করছেন, আবার কিছু বাজে লোকও এই সুযোগে ঢুকে পড়ছেন। এইটাই দুশ্চিন্তার কারণ। ভেজালে ঠকলে এরা আমাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে।"

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি ভারতবর্ষের মস্ত বড়ো কাজ করছেন—যে কাজ একদিন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ করবার চেষ্টা করেছিলেন। দু'চারজন পরশ্রীকাতর লোক যা-ই গুজব রটাক, দেশের সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছা রয়েছে আপনার পিছনে। আপনি জয়যুক্ত হয়ে বিজয়রথে দেশে ফিরুন।"

রবি আবার স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন।

আমি বললাম, "দেশের লোকদের কাছে আপনি কিছু জানাতে চান?"

রবি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "বিদেশে বসে প্রায় রোজই দেশের কথা ভাবি। একটা কথা আমাকে বড়ো বেদনা দেয়, আপনি তো বিদেশ দেখছেন, আপনাকেও দেবে। আমি যা বলছি আপনারও যদি তাই মনে হয়, তাহলে দেশের মানুষদের বলবেন, যে-ভারতবর্ষকে এখন পৃথিবীর মানুষরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সে অতীতের ভারতবর্ষ। আমাদের যুগে আমরা যে-ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছি সে সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষের কোনো উৎসাহ নেই। বিশ্ববাসীর সম্মান পেতে হলে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।"

লাইব্রেরী ... স্থাপিত-১৯৭২ বাংলাদেশ

দার্শনিকদের ওপর সব ব্যাপারে আমি যে তেমন সুপ্রসন্ন নই তার অন্যতম কারণ জনৈক চীনা দার্শনিকের ঐতিহাসিক উক্তিঃ নার্ভাস লোকদের জন্য ঈশ্বর রাস্তা সৃষ্টি করেননি—তাদের জন্যে রয়েছে দোলনা ও বিছানা।

প্রাচীন যুগের চৈনিক ঋষিরা অতি সামান্য কথায় নির্ভেজাল সত্যকে জনগণের কাছে উপস্থিত করতে পারতেন এ-কথা জেনেও, চীনা কথামৃতের এই অংশ আমার বিশেষ মনোকষ্টের কারণ হয়েছে। কারণ আমি নার্ভাস লোক এবং পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে পথে বেরুবার কথা উঠলেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কিন্তু তা বলে আমাদের মতো পুরুষদের পক্ষে দোলনা ও বিছানাই প্রশস্ত স্থান, এটা মুখের ওপর শুনিয়ে দেওয়াটা খুবই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নয় কি ?

সত্যি কথা বলতে কি, পথ চলতে অন্য সবার মতো আমারও ভাল লাগে। ঘুরে ঘুরে নানা দেশ দেখতে, নানা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং বিশেষ করে নানা জাতীয় রন্ধনশিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে রসনার মাধ্যমে যোগসম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহে আমি হিউ এন সান, ফা-হিয়েন, ইবনবতুতা থেকে কম যাই না। কিন্তু আমার অভিযোগ—মানুষকে যন্ত্রণা দেবার জন্যে ঈশ্বর যতরকম ক্লেশের সৃষ্টি করেছেন তার সবগুলোই পথের দু'ধারে অপেক্ষা করে আছে নিরীহ পথিকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। ঠাণ্ডা মাথায় পথক্লেশের কথা চিন্তা করলে দোলনা এবং বিছানার পক্ষেই সমস্ত ভোট পড়তো।

মানুষের রক্তের মধ্যে লোভ নামক এক সর্বনাশা জীবাণু সর্বদা খেলা করছে। এই লোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ পথে বেরিয়ে পড়ে ; যেমন এই মুহূর্তে আমি উড়ন্ত অবস্থায় রয়েছি। প্রায় একঘন্টা আকাশ বিহারের পর আমাদের প্লেনটা এখন পশ্চিম আমেরিকার এক বিমান বন্দরের মাথায় পাক খাচ্ছে। সহযাত্রীদের কেউ কেউ প্রাণ ভরে জানলা দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখছেন, দু' একজন জাপানী ফটাফট ক্যামেরায়

ছবি তুলছেন। (কিংবা কে জানে, কায়দা করে জাপানী ক্যামেরার বিজ্ঞাপন প্রচার করছেন—ওঁদের ব্যবসাবুদ্ধির ক্ষুরে নমস্কার।) কেউ কেউ অসমাপ্ত চিঠির শেষ ক'টা লাইন হুড় হুড় করে লিখে ফেলছেন। অথচ আমি ওসব কিছু না করে কেবল আমার লাগেজের কথাই ভাবছি। সপ্তাহখানেক ধরে ট্যুরিস্ট বেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোষ্ঠীটা বিচার করলে রাহুর প্রাবল্য দেখা যাবে নিশ্চয়। রাহুই তো শুনেছি মানুষকে বন বন করে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, এবং রাহুর খপ্পরেই ম্লেচ্ছ সংসর্গ হয়। এই কয়েক সপ্তাহে সায়েব দর্শন কম হয়নি—উপায় কী? সায়েবদেরই তো দেশ, কালাপানি যখন পেরিয়েছি তখন ম্লেচ্ছ সান্নিধ্যে ভোজন এবং ম্লেচ্ছ সংসর্গ এড়াবো কী করে?

রাহুর কাছে আমার করুণ আবেদন জানাচ্ছিলাম: শুনেছি, আমার জন্মপত্র অনুযায়ী আপনি আমার মঙ্গলকারক গ্রহ, আপনার হাতে আমার মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল কিছুই হবে না—এমন কি ম্লেচ্ছরাও আমার প্রতি বিরূপ হবেন না। সে ক্ষেত্রে আমাকে বিদেশের দু' একটি জায়গাতেই কয়েক সপ্তাহ রেখে স্বদেশে ফেরত পাঠালেই তো ভাল হতো। দু' একদিন ছাড়া-ছাড়া বালিশ-বিছানা গোটানো করিয়ে আমাকে আবার আকাশে তোলা কেন?

মার্কিন দেশে ইতিমধ্যে আমি ছ'সাতবার জায়গা পাল্টেছি—এবং এতোবার বিমান বন্দর থেকে লাইমুজিন চড়ে শহরে এসে, ট্যাক্সি যোগাড় করে হোটেল খুঁজে বার করে, নিজের বাক্সপত্তর খুলে সংসার পেতে ফেলে আবার সেসব গুছিয়ে ট্যাক্সি কিংবা বাসে চড়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্লেনের জন্যে ছোটাছুটি করেও আমি ঠিক ভ্রমণশিল্পে অভ্যস্ত হতে পারিনি। এই জিমন্যাষ্টিকে এখনও পর্যন্ত আমি এগারোটা জিনিস হারিয়েছি। এবং তিনটে জিনিস লাভ করেছি। লাভের মধ্যে দুটি হোটেলের চাবি—যা মনের ভুলে জমা না দিয়েই পকেটে নিয়ে চলে এসেছি। আর তৃতীয় বস্তুটি তো বুঝতেই পারছেন: অভিজ্ঞতা।

আমেরিকান হোটেলের চাবি নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আবিষ্কার করলাম—চাবির রিঙে খোদাই করা রয়েছে, 'যদি এই চাবি আপনি লইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক নিকটস্থ

ডাকবাক্সে ফেলুন। মার্কিন ডাক বিভাগের সহিত বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী চাবির ডাক খরচ আমাদের কাছেই সংগ্রহ করা হইবে।' মার্কিন হোটেল ইনডাসট্রিকে মনে মনে নমস্কার জানিয়েছি—কারণ ওই আধসেরী চাবি নিজ খরচে বিমান ডাকযোগে হোটেলে ফেরত পাঠাতে হলে আমাকে দেউলিয়া অফিসে খোঁজখবর নিতে হতো!

দেশ দেখানোর নাম করে মার্কিন ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ লীডারস্ অ্যাণ্ড স্পেশালিস্টস্ সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার কার্নাহান সাহেব ইতিপূর্বে আমাকে আধডজন অজানা জায়গায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু এবারের লক্ষ্যস্থান নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

দেশ ছাড়বার আগে তাজুদি আমাকে মাথার দিব্য দিয়েছিলেন—বল, তুই একবার যে করেই হোক খুকুর ওখানে যাবি। শুধু কি দিব্য! রাত দু'টোর সময় যখন দমদম ছাড়ছি তখনও তাজুদি কানে কানে বলেছিলেন, —খুকুমণির কথাটা ভুলিস না।" ওয়াশিংটনে পৌছে দেখলাম স্টেট ডিপার্টমেণ্টের ঠিকানায় তাজুদির চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দমদমে তুলে দেবার আগেই তাজুদি বুদ্ধি খাটিয়ে বিমান ডাকে চিঠি ছেড়েছেন, "ভাই শংকর, তোকে খুকুর কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি—দরকার হলে সাহিত্যিকদের সঙ্গে কম দেখা করবি, তুই না করলেও দেশোদ্ধার হবে। কিন্তু আমার মেয়ের কথা তোকে ভাবতেই হবে।"

তাজুদি সম্পর্কে আরও কথা পরে বলা যাবে, এখন এয়ারপোর্টে নামার ব্যবস্থা করা যাক। জেট প্লেনের যা প্রচণ্ড গতি, তাতে না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। এক একটি ল্যাণ্ডিং মানেই এক একটি ফাঁড়া।

প্লেন নিরাপদেই ভূমি স্পর্শ করলো। বিমান থেকে নেমে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে প্রবেশ করতেই, এক ঝলক ছেলে-মানুষী মাখা কণ্ঠস্বর কানে এলো: "শংকর মামা!"

হ্যাঁ, আমার ভাগিনেয়ী তাজুদিকন্যা কুমারী সুচরিতা চ্যাটার্জি মামাকে ডেলিভারী নেবার জন্যে সশরীরে বিমানবন্দরে হাজির হয়েছে।

সুচরিতার মুখের দিকে যে একটু তাকাবো তার উপায় নেই—ছোটবেলায় যা করতো তেমনিভাবেই আমার কাঁধে হাত দিয়ে একটু

লাফিয়ে নিলো। তারপর ওই পাবলিক প্লেসে মেঝেতে বসে পড়ে ঢিপ করে প্রণাম করলো। ওকে টেনে তুলে বললাম, "খুকুমণি, তুই সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছিস।"

নিজের চুলগুলো সামলে নিয়ে সুচরিতা বললো, "এসব কী বলছো মামা? না-হয় তুমি গল্প-উপন্যাস লেখো, না-হয় তোমার নবেল সিনেমা হচ্ছে; তা বলে মেয়েমানুষকে ছেলেমানুষ বলছো।"

বললাম, "শিবরাম চক্রবর্তী তোর কথাটা শুনলে আনন্দ পেতেন। তোর চান্স আছে আমাদের লাইনে।"

সুচরিতার মুখের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, ওর চেহারায় বেশ লাবণ্য এসেছে। ওর চুলগুলো যেন আরও ঘন কালো হয়েছে, ওর চোখ ছুটো আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, মুখ নাক গ্রীবা নতুন-বাড়া পেন্সিলের মতো ধারালো মনে হচ্ছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জানালাম, "তোদের বাড়ির সব খবর ভাল।"

"মার ছুটো দাঁত পড়ে গেছে শুনলাম।"

"দাঁতের আর দোষ কি বল? র‍্যাশনের চালে যা কাঁকর। তা তুই চিন্তা করিস না। ভাস্কর ডেনটিস্টের কাছে ছু দিন নিয়ে যাওয়া হয়েছে—নকল দাঁত এই সপ্তাহে পাবার কথা।"

মায়ের দাঁতের খবর পেয়ে সুচরিতা একটু আশ্বস্ত হলো। আমি ওর আপাদমস্তক একটা অনুসন্ধানী নজর দিয়ে ফেললাম। সুচরিতা বললো, "অত খুঁটিয়ে কী দেখছো মামা?"

"দেখছি খুঁটিয়ে এই জন্যে যে তাজুদিকে পুরো রিপোর্ট পাঠাতে হবে। তাছাড়া ছু'সপ্তাহ পরে যখন সশরীরে কলকাতায় ফিরবো তখন তোর মায়ের জেরায় আমার জীবন ওষ্ঠাগত হবে। মনে নেই তোর, সেই যেবার তোর দাদার জন্যে মেয়ে দেখতে গেলাম। তাজুদি হুকুম করলেন, এখনই ছু' পাতার একটা ডেসক্রিপসন লিখে ফেলো—খোকার কাছে পাঠাবো।' আমি বললাম, মেয়েমানুষের ওই রকম ডেসক্রিপসন কালিদাস দিতে পারতেন, আমার মত চুনোপুঁটি লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা আধুনিক সাহিত্যিক, মানুষের বাইরেটা নিয়ে অত মাথা ঘামাই না—আমরা ভিতরটা খুঁড়ি।"

সুচরিতা হেসে ফেললো। "শেষ পর্যন্ত মা তো ফটো পাঠাতে রাজী হয়েছিল তাই না—তার সঙ্গে তোমার দশ লাইন বর্ণনা।"

"তাজুদির মতো দিদির পাল্লায় তো তোদের পড়তে হলো না", বলে আমি হাসতে আরম্ভ করলাম। হাসিতে সুচরিতাকে একটু ভিজিয়ে বললাম, "হ্যাঁরে খুকু, তোর হাইট এখন কত ?"

"তুমি কি পাগল মামা ? জেট প্লেনে অনেকক্ষণ উড়লে মাথার বুদ্ধি গোলমাল হয়ে যায়—এ সম্বন্ধে আমাদের মেডিক্যাল সেন্টারে গবেষণা চলছে।"

"মানে, তুই আমাকে বিদেশ বিভূঁই-এ পাগল বলছিস !"

"না না, পাগল বলবো কেন ? বলতে চাইছি, আমার হাইট আর তোমার হাইট একই—পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। তোমার ভাগনী তো ! বেঁটে হতেই হবে ! নারীনাম্ মাতুলাক্রমঃ !"

"তুই বিদেশে এসে বেশ দুষ্টু হয়ে গিয়েছিস—শাসন করবার কেউ তো নেই। তা তোর উচ্চতা সেন্টিমিটারে বল—ইণ্ডিয়াতে এখন সব দশমিক হয়েছে—ইঞ্চিতে মাপজোক লিখলে পুলিশে ধরছে।"

সুচরিতা ওখানে দাঁড়িয়েই আরও কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে লাগেজ আসতে আরম্ভ করেছে। আমি ওই দিকে ছুটে গেলাম। আগে বাবা লাগেজ তার পরে ভাগ্নে-ভাগ্নী !

টিকিট দেখিয়ে লাগেজ জড়ো করে গুণতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেলো।

"মামা, এই শীতে ঘামছো কেন ?" সুচরিতা জানতে চাইলো।

"দাঁড়া বাপু, আমার হিসেব মিলছে না—মাল কম হচ্ছে।"

সুচরিতা এবার আমার স্থানীয় গার্জেনের দায়িত্ব নিলো। একটু মৃদু বকুনি দিয়ে বললো "হারানো স্বভাব তোমার এখনও গেলো না। আমি দেখছি। বলো, ক'টা আইটেম হবে।"

বললুম, "রাস্তায় হারানো বন্ধ করার অব্যর্থ ওষুধ তাজুদি নিজে শিখিয়ে দিয়েছেন—ক'দফা মাল আছে সেটা বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে নিবি, তারপর যেখানে স্থান পরিবর্তন সেখানেই একবার দফা মিলিয়ে নিবি। এখন মেলাতে পারছি না।"

সুচরিতা আমার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা কেড়ে নিলো "দেখি ক'দফা ছিল তোমার।"

আমার উত্তর : "ছ'দফা, তার মধ্যে আমি নিজে এক দফা।"

"পারোও বটে তুমি, মামা। দেখছি দুটো সুটকেশ, একটা ক্যামেরা, আর একটা হাওয়াই কোম্পানির দেওয়া কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ—মোট তোমাকে নিয়ে পাঁচ দফা। একটা কম পড়ছে—কী ছিল ?"

বিদেশে কোনো কিছু হারালে নার্ভাস হয়ে যাই। কপালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলাম যষ্ঠ দফার কথা। "না পেলে কী হবে বল দিকিনি ?" খুকুর কাছে করুণভাবে আবেদন করলাম।

"কী আর হবে! এরোপ্লেন কোম্পানিকে একখানা চিঠি দিয়ে যাবো —ওরা মাল পেলে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগে জিনিসটা কী বলো!"

এবার মনে পড়েছে "যষ্ঠ দফা হলো ওভারকোট। পরের জিনিস ধার করে এনেছি শীতের ভয়ে। কলকাতায় গিয়ে সুপ্রিয়র মার কাছে কী করে মুখ দেখাবো, খুকু ?"

সুচরিতা এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে গেলো। তারপর ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "ওঃ, পারোও বটে তুমি মামা—ওভারকোট তোমার গায়ে।"

আমি লজ্জায় মরে যাই। নিজের পক্ষে সওয়াল করলাম, "বেরোবার সময় ওটা হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম—তাই দফা বেড়ে গিয়েছিল। এখানে প্লেন থেকে নামবার সময় কখন পরে ফেলেছি। দোষটা ঠিক আমার নয়। এয়ারপোর্টে একটা ইয়া লম্বা-চাওড়া সায়েব ওভারকোট হাতে করে আমাকে হাঁপাতে দেখে বললো—ওভারকোট বইবার সবচেয়ে সোজা উপায় ওটা পরে ফেলা।"

সুচরিতা মুচকি হাসতে লাগলো। "মামা, তুমি এখনও খুব মজা করতো পারো।"

মনে মনে একটু হাসলাম। সারাক্ষণই গম্ভীর হয়ে থাকি। মনের মধ্যে একজন উদাসী সারাক্ষণ বসে আছে, যে আমার সাহিত্যকে করুণ রসে ভরিয়ে দেয়। ভাগ্নে-ভাগ্নীদের কাছে আমি কিন্তু হাল্কা হবার

চেষ্টা করি। সুচরিতার ছোটবেলা থেকেই ওদের শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা গল্প শুনিয়েছি, হাসিয়েছি, এবং সেই সঙ্গে নিজেও হেসেছি।

ঘোড়া দেখলে যে মানুষ খোঁড়া হয় তা আর একবার প্রমাণিত হলো। লাগেজের তদারকী খুকুর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। সে কোথা থেকে একটা মিনি-ঠেলা যোগাড় করে নিয়ে এলো। সমস্ত মালপত্র ওই যন্ত্রের ওপর তুলে ফোন-বুথে গিয়ে কাকে ফোন করলো। জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে, এখন আবার কাকে ফোন করতে গেলি?"

"পার্কিং কোম্পানিকে ফোন করে দিলাম—গাড়িটার জন্য।"

"শুনেছিলাম গাড়ি কিনেছিস। তা ড্রাইভার রেখেছিস বুঝি? খুব ভাল।" ভাগ্নীর কৃতিত্বে আমি আনন্দ প্রকাশ করি।

"তুমি কি পাগল হলে মামা? এটা তোমার ইণ্ডিয়া নয়—খোদ প্রেসিডেন্ট ছাড়া এদেশে আর কারও ড্রাইভার আছে বলে শুনিনি। এটা আরেকজনের গাড়ি—এখানে কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে তার ঠিক নেই, তাই গাড়ির মালিক পার্কিং সেন্টারে আমার ফোনের জন্যে বসেছিল।"

বিদেশে সবাইকে প্রাণ খুলে প্রশ্ন করা যায় না—তাই সব সন্দেহ নিরসন হয় না। অনেক ব্যাপারে খটকা লেগে থাকে। নিজের ভাগ্নীর কাছে সৌজন্যের চিন্তা নেই। তাই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, "যারা ড্রাইভিং জানে না—তাহলে তাদের গাড়ি চড়ার উপায়?"

খুকু এবার হাসলো এবং তারপর যা উত্তর ছাড়লো তার জন্যে আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না। খুকু বললো, "উপায় একটা আছে—সেটা হলো, কোনো ড্রাইভারকে বিয়ে করা!"

খুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বললুম, "হ্যাঁরে, মনে পড়ে যখন তোর বিদেশে আসবার কথা হলো, তুই ও তোর মা দু'জনেই কী রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছিলি!"

"খুব মনে আছে মামা। তুমিই তো তখন আমাকে ভরসা দিলে—বললে, আজকাল ফরেন যাওয়াটা কিছু নয়। অন্ধরা পর্যন্ত বুক ফুলিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে আসছে। তুমি কী করে বিদেশ ভ্রমণ করতে হবে সে সম্বন্ধে কত উপদেশ দিলে। তারপর বিলেত যাবার পথে তুমিই তো

আমাকে বোম্বাইতে ব্যালার্ড পীয়ারে তুলে দিয়ে গেলে—সেবার তোমার কী কাজ ছিল বোম্বাইতে।”

খুকু তাহলে কিছুই ভোলেনি। চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে বললে, “মামা, তুমি কাউকে বলোনি তো ব্যালার্ড পীয়ারে আমার কান্নার কথা? বলেছিলাম, দরকার নেই মামা, ফিরে চলো।”

“পাগল হয়েছিস, সে সব গোপন কথা কাউকে ফাঁস করা চলে! তাছাড়া তাজুদি তোর কান্নার কথা শুনলে আবার শয্যা নিতেন। একে একটু মোটা মানুষ—ব্লাডপ্রেসার ছাদে ওঠার জন্যে উঁচিয়ে আছে।

সেই দিনের সুচরিতা আর আজকের সুচরিতার কত তফাৎ ভাবছিলাম। কান্নায় চোখ-লাল-করা সেদিনের সেই ভীরু মেয়েটা বিলেত থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকায় এসেছে; পরম আত্মনির্ভরতায় বিমান বন্দরে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর বই-পড়া বিদ্যে থেকে বিদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে যে বড়ো-বড়ো লেকচার দিয়েছিল সে-ই এখন শিষ্যাকে গার্জেনের দায়িত্ব দিতে পথ পাচ্ছি না।

তাজুদির কথা মনে পড়ছে। মেয়েদের একা-একা ঘোরা দিদি মোটেই পছন্দ করতেন না। সব সময় ভয়, কী হয়। কী হয়। কলকাতায় থাকবার সময় সুচরিতা একবার গানের অডিশনের জন্যে একলা অল ইণ্ডিয়া রেডিও অফিসে গিয়েছিল বলে কী কাণ্ডটাই তাজুদি বাধিয়েছিলেন। মেয়ে যতক্ষণ না নিরাপদে বাড়ি ফেরে ততক্ষণ অন্নজল বন্ধ। সেই তাজুদিও শেষ পর্যন্ত আইবুড়ো মেয়েকে একা একা আমেরিকায় পাঠালেন।

আমার লাগেজের ঠেলাগাড়িটা সুচরিতাই রাস্তার ধারে নিয়ে এলো। বিরাট একটা ফোর্ড গাড়ি এবার আমাদের সামনে দাঁড়ালো। গাড়ির চালক ছোকরা আমেরিকানটি পোলো কলারের শার্ট পরেছে। বয়স খুকুর মতই হবে—বড়ো জোর এক বছরের বড়ো।

খুকু বললো, “বিল, মিট মাই শংকর মামা, যাঁর সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা শুনেছো।” আর আমাকে বললো, “মামা, মিট উইলিয়ম কলিনস—আমার বন্ধু ও সহপাঠী।”

উইলিয়ম এক সঙ্গে গাড়ির দুটো দরজাই খুলে দিয়েছে। নতুন যুগের

ছেলেমেয়েদের নিয়মকানুন এখনও রপ্ত হয়নি—তাই কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে পিছনের সীটে বসলাম। খুকু বললো, "তুমি পিছনে বসলে কেন?" কিন্তু প্রতিবাদটা নিতান্তই মৃদু মনে হলো। এবার সে কলিনস-এর পাশে গিয়ে বসলো।

গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। উইলিয়ম ছোকরার দিকে এবার আড় চোখে তাকালাম। হাজার হোক দিদিকে সমস্ত রিপোর্ট তো দিতে হবে।

উইলিয়ম নিজেই বললো, "মামা—এর মানে কী?"

"মানে মায়ের ভাই", সুচরিতা ওকে বোঝালো।

"আপনাকে আমিও তাহলে মামা বলে ডাকবো—ভেরি সুইট নেম।"

সর্বনাশ! বিলের কথা শুনে আমার গা ঠাণ্ডা হবার অবস্থা। মামাশ্বশুরকেও মামা বলে ডাকাটা আজকাল কলকাতায় ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিল একটু পরে আমাকে সিগারেট অফার করলো। আমি সিগারেট খাই না, তাই প্রত্যাখান করলাম। কিন্তু খুকুর কাণ্ডটা বুঝুন, সে নিজে লাইটার জ্বেলে বিলের মুখাগ্নি করলো।

ছবির মতো রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি রাজহংসের মতো ভেসে চলেছে। বাইরে দুধারে শ্যামল বনশ্রী। চোখ জুড়িয়ে যায়। বিরাট অঞ্চল ধরে তেমন কোনো লোকবসতি নেই। তবু কি পরিষ্কার—কে যেন সমস্ত দেশটাকে নিজের লনের মতো পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে।

উইলিয়ম প্রশ্ন করলো, "মামা, আপনার আমেরিকা কেমন লাগছে?"

"তোমাদের দেশকে ঈশ্বর অকৃপণভাবে ঐশ্বর্যে মুড়ে দিয়েছেন—আর তোমরাও তার পরিপূর্ণ সুযোগ নেবার জন্যে পরিশ্রমের কার্পণ্য করো না। পরশ্রীকাতর ছাড়া সবাই বলবে, খুব সুন্দর দেশ। কিন্তু দেখো, তোমাদের দেশ যে বৃহৎ, শক্তিমান, ঐশ্বর্যশালী ও সুন্দর—একথা তো আমার মতো একজন ট্যুরিস্টের বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি নিজেও দাঁড়িপাল্লা, গজ-ফিতে নিয়ে মাপজোক করতে ব্যস্ত নই—আমি মানুষ দেখে বেড়াচ্ছি, ওই কাজটাই আমার কাছে লোভনীয়। যখন হাতে একটু সময় থাকে, তখন স্বদেশের চিন্তা এসে যায়—মাথায়

নানা মতলব ঘুরতে থাকে, কী করে নিজের জাতভাইদের একটু উন্নতি, মঙ্গল হতে পারে তাই ভাবি।"

খুকু দেখলো ব্যাপারটা একটু গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। সে বললো, "বিল, তুমি কি কিছু মনে করবে যদি মামাকে আমার ফ্যামিলির খবর জিজ্ঞেস করি?"

"মোটেই নয়। সেইটাই তো স্বাভাবিক।"

আমি বললাম, "খুকু, তোর বাবার শরীর এখন ভাল। মধ্যিখানে সর্দিজ্বরে একটু ভুগেছিলেন। তোর দাদা বৌদি ভালই আছেন। ওদের বড়ো ছেলেটা খুব দুষ্টু হয়েছে—আমার লেখা দু'খানা বই ইতিমধ্যেই চিবিয়ে খেয়েছে। তোদের ঝি জ্ঞানদা আমাকে বার বার বলে দিয়েছে, তুই যখন ফিরবি তখন ওর জন্যে একখানা ভাল মাছ কাটার বঁটি নিয়ে যাবি। ওর ধারণা, এখানে ভাল শিল নোড়া আর বঁটি পাওয়া যায়।"

"খুকু" কথাটা বিলের কানে গিয়েছে। সে বললে, "মামা, তুমি চ্যারিটাকে কি 'কোক' বলে ডাকছো? বেশ সুন্দর নাম দিয়েছো তো।"

কোক ওরফে খুকুমণির কান লাল হয়ে ওঠার অবস্থা! বেশ রেগে-মেগে বাংলায় সে আমাকে বললো, "তুমি ওই নামে আমাকে কেন ডাকলে! এখানে আমাকে সবাই চ্যারিটা বলে।" বিলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, "তুমি কিছুই বোঝোনি। মামা কোন দুঃখে আমাকে কোকাকোলার অপভ্রংশ নামে ডাকতে যাবে। কথাটা খুকু, হুইচ মিনস, ছোট্ট মেয়ে। ইন ফ্যাক্ট প্রত্যেকটি ছোট্ট মেয়েই খুকুমণি। আত্মীয়-স্বজনদের পুরনো অভ্যাস থেকে যায়—মেয়ে বড়ো হলেও তারা ওই নাম ধরে ডেকে চলে, যদিও তা ঠিক নিয়ম অনুযায়ী অচল।"

বিল বললো, "তুমি কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, একজন অ্যাভারেজ আমেরিকানের পক্ষে 'চ্যারিটা' থেকে কোক উচ্চারণ করা অনেক সহজ।"

"তোমরা তো দুটো জিনিস চেনো—হয় কোক না হয় হুইস্কি। এই দুটো বাদ দিলে, অ্যাভারেজ আমেরিকানের আর কী থাকে!" খুকুর উত্তরে বেশ ঝাল আছে।

আমরা অন্তত চল্লিশ মাইল পেরিয়ে এসেছি—কিন্তু চল্লিশ মিনিট সময় বোধ হয় লাগেনি। মোটর গাড়ির গতিই সমস্ত জাতটাকে গতিশীল করে তুলেছে।

আমরা এবার গন্তব্যস্থানের কাছে এসে গিয়েছি। ডাউন টাউনে গাড়ির গতি কমে এলো। দু'ধারে বিরাট-বিরাট দোকান—রাস্তায় সুবেশ নরনারীর ভিড়। সবার হাতেই প্রায় একটা দুটো করে প্যাকেট।

ডাউন টাউন ছাড়িয়ে গাড়ি এবার দক্ষিণে মোড় নিল। ছোট্ট একটা ব্রীজ পেরিয়ে আমরা শহরের আর এক প্রান্তে এসে পড়লাম। উইলিয়মের গাড়িটা এবার একটা ইন-এর সামনে এসে দাঁড়ালো। সুচরিতা বললো, "এই সরাইখানায় তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি মামা। আমাদের ইউনিভার্সিটির বিশিষ্ট অতিথিরা এখানে ওঠেন। শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দও এখানে দু'দিন ছিলেন।"

আমাকে ঘরে তুলে দিয়ে সুচরিতা ঘড়ির দিকে তাকালো। বললো, "আমাকে মামা এক ঘণ্টা সময় দাও। ততক্ষণে তুমি স্নানটান সেরে নাও —আমি একবার হোস্টেল থেকে আসছি।"

"কি করে যাবি?"

"বিল নিচে দাঁড়িয়ে আছে।"

আমি বললাম, "বিলকে আমার ধন্যবাদ দিস। বেচারা আমার জন্যে অনেক খেটেছে।"

স্নান সেরে নিজের বিছানায় এসে চুপচাপ বসলাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সময় এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মার্কিন দেশে এটা বিরাট বাবুগিরি। খুব কম হোটেলেই রুম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে, এবং থাকলেও এক কাপ চায়ের দাম পনেরো টাকা পড়ে যেতে পারে। বেড-টি জিনিসটাই লোকাভাবে অচল। আমাদের দেশের হোটেল বেয়ারা এখানে এলে হৈ হৈ ফেলে দিতো। লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক যাই বলুন আমাদের কলকাতার কিছু হোটেল-বেয়ারা ওদের গুরুগিরি করতে পারে।

লোকের অভাব এ-দেশে যন্ত্র দিয়ে মেটানোর চেষ্টা চলেছে। যা যন্ত্র দিয়ে হয় তাই সস্তা। যেখানে মানুষ লাগে সেখানেই চতুর্গুণ দাম—সে চুল ছাঁটা বা চা দেওয়া যাই হোক। প্রত্যেকটি মানুষও তাই যথাসম্ভব নিজের ওপর নির্ভরশীল—নিজে গাড়ি চালায়, নিজে ঘর পরিষ্কার করে, নিজে কাপড় কাচে, নিজে চা বানায়। নিজের হাত দু'টো খাটিয়ে যত পার সুখ ভোগ

কর, অপরের হাত অপরের জন্য। আমাদের দেশের কিছু মানুষ চির-নাবালক থেকে যান—প্রথম জীবনে মা, পরে স্ত্রী এবং বার্ধক্যে বৌমার ঘাড়েই সব দায়িত্ব চাপিয়ে এবং ঝি চাকর ঠাকুরের ওপর হুকুম চালিয়ে সমস্ত জীবনটা পরম সুখে কাটিয়ে যান। আমাদের দেশে যদি কখনও মানুষের দাম হয়, কলকারখানায় ক্ষেতে খামারে সব মানুষ যদি কাজকর্ম যোগাড় করতে পারে, তাহলে মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

বাথরুমে দেখলাম 'সৌজন্য কফির' ব্যবস্থা রয়েছে। সৌজন্য কফি আর কিছু নয়—একটা হিটারের ওপর একটা কাঁচের পাত্র রয়েছে। কাঁচের পাত্র জলে পূর্ণ করলেই হিটার আপনা আপনি জ্বলে উঠবে। পাশে রয়েছে কাগজের ছোট ছোট প্যাকেটে কফি, চিনি, গুঁড়ো দুধ এবং টী ব্যাগ। টী ব্যাগ কাগজের ছোট্ট একটা প্যাকেট তার থেকে একটা লম্বা সুতো ঝোলানো আছে। এই প্যাকেটটা গরম জলের কাপে সামান্যক্ষণ ডুবিয়ে রাখলেই চা হয়ে গেলো। নিজের ইচ্ছামতো পাতলা বা কড়া করা যায়—তারপর ব্যাগটা তুলে ফেললেই হলো।

'নিমেষ চা' বানিয়ে বিছানার পাশে রেখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রকৃতির প্রাঙ্গণে ঝরাপাতার বিচিত্র খেলার প্রস্তুতি চলেছে। গাছের পাতা নানা রঙে রঙিন হয়ে ওঠে এই সময়; ওরা বলে "fall"—আমাদের শরৎকালের মতো! যাবার আগে ওরা পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়—এ এক অপূর্ব দৃশ্য। না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

এই পাতা ঝরার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জীবন-বসন্তের আবির্ভাব হয়। দীর্ঘ ছুটির শেষে নতুন ক্লাশ আরম্ভ হয়। ক্যামপাসে অপরিচিত মুখের আবির্ভাব হয়—নতুন বছরের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জীবন শুরু করে, সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন প্রাণের স্পন্দন।

মার্কিন দেশে বিশ্ববিদ্যালয় না দেখলে কিছুই দেখা হলো না। এ দেশের যা কিছু সেরা, যা কিছু আদর্শ তাকে দৈনন্দিন সংকীর্ণতার কলুষ থেকে মুক্ত রাখার জন্যেই যেন এক একটা ক্যামপাসের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এক একটি শহরের মতো—হাজার হাজার একর

জমি—পথ ঘাট, বিদ্যুৎ, দোকানপাট, হোটেল সব কিছুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অধীন। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর লেখাপড়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ শুনেছি—ইথাকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন এবং কয়েকটি স্মরণীয় কবিতা এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যামপাসে বসেই রচনা করেছিলেন।

মার্কিন মুলুকে ঘুরতে এসে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছি—ক্যামপাস ঘুরে দেখবার সুযোগ পেলে আর কিছুই ভাল লাগে না।

এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল নানা রকমের আন্দোলন হয়—ক্যামপাসের শান্তি নানা সমস্যায় বিঘ্নিত। তবু অ্যাসফল্ট ও কংক্রিটের জঙ্গল থেকে দূরে, প্রকৃতির শান্তিনিকেতনে জ্ঞানের যে বিচিত্র সাধনা এদেশে নীরবে চলেছে—তা দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। এর পেছনে বহু মানুষের ত্যাগ রয়েছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় যেমন সরকারী অর্থে চলে—তেমন বহু প্রতিষ্ঠান বেসরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল! বহু প্রাক্তন ছাত্র নিয়মিতভাবে তাঁদের 'আলমা মেটার'কে অর্থসাহায্য করেন। অনেকে তাঁদের উইলে সম্পত্তির এক অংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যান।

মনে পড়লো, একবার প্লেনে আমার পাশে এক বৃদ্ধার সীট পড়েছিল। বৃদ্ধা অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "দু'বছর বিধবা হয়েছি। কিছুই ভাল লাগে না। নিজের ইচ্ছেমত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই—আর ছ'মাস অন্তর একবার করে স্বামীর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যানফোর্ডে ঘুরে আসি।"

বৃদ্ধা বললেন "আমার হাতের এই নিকেলের অংটিটা দেখছেন—এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। আমার স্বামীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটি দেওয়া হয়। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিশেষ ব্যবস্থা করে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি বিধবা হিসেবে পাঁচশ ডলার মাসোহারা পাই। তেমন যদি আটকে যায় তাহলে বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে—আমার মৃত্যুর পরে সবটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের।"

"আপনি বা আপনার ছেলেরা এতে আপত্তি করেননি?" আমি জানতে চেয়েছিলাম।

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বৃদ্ধা বললেন, "আমার দুই ছেলে কৃতী, আমার মেয়েদের ভাল বিয়ে হয়েছে। তাদের আরও টাকা দিয়ে কী হবে? আর আমার দিনও তো শেষ হয়ে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই সব যাওয়া ভাল নয়? মানুষের উপকার হবে।"

ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, "ট্রামে-বাসে একটা পোস্টার পড়েছে —দেখেননি? "বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের নেতাদের তৈরি করে, আপনি অর্থ সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে তৈরি করুন।" আমরা তো সামান্য মানুষ—কত লোক আরও কত কি দিয়ে যান। ভারতবর্ষেও নিশ্চয় আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাসম্ভব দেন।"

আমরা কাকে যে কি দিই, সে তো ঈশ্বরই জানেন। এককালে ধর্মের নামে কিছু দান হতো। এখন তাও কমে আসছে। বিদ্যামন্দিরের জন্য আমরা কানাকড়ি খরচ করতে রাজী নই। যে কথা আগেও উল্লেখ করেছি, আবার বলছি,—হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা দেবার সামর্থ্য হয়তো অনেকের নেই, কিন্তু এই দেশের লক্ষ গ্র্যাজুয়েটদের ক'জন তাঁদের ইস্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে পাঁচ টাকা রেখে যাবার কথা চিন্তা করেন?

বড়ো বড়ো কোম্পানির শেয়ারের মোটা অংশের মালিক—আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। নানা পরিকল্পনার জন্যে নানা জন টাকা রেখে যান। কেউ চান তাঁর টাকায় ক্যানসারের গবেষণা হোক, কেউ চান তাঁর টাকায় কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপককে বই লেখবার জন্যে ছুটি দেওয়া হোক, কেউ চান তাঁর টাকায় বিখ্যাত কোনো বক্তাকে সামান্য কয়েক দিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হোক, কেউ চান তাঁরা টাকায় মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হোক।

আর শুনেছিলাম, "মনে রাখবেন, বিদ্যালয়ের সঙ্গে 'বিশ্ব' কথাটাও যুক্ত আছে—সমগ্র বিশ্বের দিকে নজর রাখতে হবে। তাই নানা দেশের গুণী-জ্ঞানীদের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক হিসেবে দেখা যায়। এঁদের কেউ কেউ যে ভারতবর্ষ থেকেও আসেন তা সবাই জানে। আর

আসে ছাত্ররা দেশ বিদেশ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভারতীয় ছাত্র এবং অধ্যাপকদের খুব সম্মান।"

খুকুর কথা মনে পড়ে গেলো। খুকু পড়াশোনায় খুব ভাল—বি-এ এবং এম-এ দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। তারপর চিঠিপত্তর লিখে নিজেই ক্যামপাসে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। গবেষণা করছে—এখান থেকে পি-এইচ-ডি নিয়ে যাবে। পয়সা-কড়ি লাগে না। বরং পড়িয়ে বেশ কিছু রোজগার করে।

সুচরিতা আমার ভাগ্নী বলে বলছি না—ওর প্রতিভা সম্পর্কে আমার অনেকদিন ধরে বিশ্বাস ছিল। ওর স্মরণশক্তি খাসা, বেশী তালগোল না পাকিয়ে সহজেই যে কোনো জিনিস বুঝে ফেলে, নিজের মধ্যে দোনোমোনো ভাব নেই—নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে। অথচ এই পুরুষালী গুণের সঙ্গে ওর স্নেহপ্রবণ মেয়েলী মন চমৎকার মিশে গিয়েছে। খুকু একটু আদুরে, বাবা-মার চিঠি প্রতি সপ্তাহে না পেলে ভেবে আকুল হয়। আর আগে যা ছিল—এখন কী হয়েছে জানি না—একটুতে অভিমান হয়, চোখ ছলছল করে ওঠে। সুচরিতা বেশী কথা বলে না, রসিকতা বোঝে—এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করলেই যে ছেলেমানুষী বিসর্জন দিতে হবে তা বিশ্বাস করে না।

ঘরে টোকা পড়তেই বললাম, "ভিতরে আসুন।"

সুচরিতা হৈ-হৈ করে ঘরে ঢুকে পড়লো। বিরাট একটা ওভারকোট চাপিয়েছে সে। বললাম, "এ-রকম ভাল্লুক সাজে?"

"বাইরে যা ঠাণ্ডা! আর তুমি তো জানো আমার টনসিলটার কোনো গতি করা গেলো না। সারাজীবন আইসক্রিম থেকে দূরে থাকতে হলো—আইসক্রিম খেলেই গলায় ব্যথা, জর।"

বললাম, "আয়, এখানে বোস।"

আনন্দে উচ্ছল হয়ে সুচরিতা বললো, "দেশবিদেশ ঘুরেও তুমি আধুনিক হলে না।"

"বলিস কী? আমি সেকেলে? তোর ছোট ভাই মণ্টু পর্যন্ত আমার সামনে সিগারেট খাবার পারমিশন পেয়েছে।"

"মামা, কোনো লেডি ঘরে ঢুকলেই—সে তোমার নাতনীর বয়সী

হলেও তোমার প্রথম কাজ তাঁকে ওভারকোটমুক্ত করা। সুচরিতা আমাকে শুনিয়ে দিলো।

"এই বললি খুব ঠাণ্ডা পড়েছে," আমি নিজেকে সামলাই।

"ঠাণ্ডার সঙ্গে বাড়ীর কি সম্পর্ক ? তুমি তো জানো, এ-দেশে ইণ্টারন্যাল হিটিং ছাড়া বাড়ির প্ল্যান পাশ হয় না। বাইরে বরফ পড়ছে—আর ভিতরে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে তুমি আইসক্রিম খেতে পারো।"

খুকুকে বললাম, "দাঁড়া আমার কাজগুলো সেরে নিই। তোর সঙ্গে কী কী করতে হবে তা নোট করে রেখেছি।"

ব্যাগ খুলে, অতি সাবধানে এক কোণ থেকে গোটা তিনেক পুরিয়া বার করলাম।

"এক নম্বর—এটা হলো কালীঘাটের প্রসাদী ফুল। মাথায় ঠেকিয়ে ব্যাগে রেখে দে, তাজুদির নির্দেশ। দু'নম্বর—এই নে, জগন্নাথের প্রসাদ। মুখে একটু ঠেকা। তিন নম্বর, এইটি সম্বন্ধে তাজুদি হাতে ধরে বলেছেন—এই সোনার মাদুলি লকেট করে গলার হার থেকে ঝোলাতে হবে।

"তুমিও কি পাগল হলে, মামা ?"

আমার উত্তর, "এক নম্বর দু' নম্বর সম্বন্ধে তোর প্রাণ যা যায় তাই করতে পারিস—কিন্তু তিন নম্বর সম্বন্ধে কোনো উপায় নেই। পুরো একদিন উপবাসী থেকে তাজুদি ওটি তারকেশ্বর থেকে আনিয়েছেন। এর বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে—সেটি যথাসময়ে জানতে পারবি ; এখন জানবার চেষ্টা করিস না, খুবই কনফিডেনসিয়াল।"

এবার ব্যাগের গভীরে হাত ঢোকালাম। "তাজুদির এই অনুরোধটি রক্ষে করতে গিয়ে আমাকে মার্কিন কাস্টমসের খপ্পরে পড়তে হচ্ছিল। তোর জন্যে যত্ন করে আচারের শিশিটি দিলেন—তুই তো টক খেতে ভালবাসতিস। আর এখানে যেমনি কাস্টম্‌সে ঢুকলুম অমনি জিজ্ঞেস করে বসলো—আমার কাছে গাঁজা ইত্যাদি কোনো 'ড্রাগ', কোনো ফল বা খাদ্যদ্রব্য আছে কিনা। কী করে জানবো বিদেশের ফলফুলুরি সম্বন্ধে এদেশে এতো-হুঁশিয়ারি—পাছে কোনো পোকা ঢুকে পড়ে। তা শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থামা হত ইতি গজ করতে হলো। বললাম, গাঁজা, আফিম

ইত্যাদি নেই, ফলও নেই, খাদ্যদ্রব্যও নেই। মিথ্যে বলিনি, কারণ লেবুর আচারটা আমি অখাদ্য বলেই মনে করি।"

সুচরিতা আচারের শিশিটা হাতে নিয়ে খুশী হয়ে বললো, "মামা, প্রত্যেক বছর তুমি ওয়ার্লড-ট্যুর করো—আর আমার জন্যে আচার নিয়ে এসো।"

"তৃতীয় অধ্যায়, তোর বেশবাস সম্পর্কে। ছ'খানা শাড়ি আর তেরোখানা ব্লাউজ!"

"ব্লাউজগুলোর কথা আমি ভাবছিলাম," সুচরিতা জানালো।

বললাম, "বাছা, এ-দেশে কি দর্জি নেই?"

"দর্জি থাকবে না কেন মামা? কিন্তু নিজের মাপ দিয়ে আলাদাভাবে জামাকাপড় করানো স্বপ্নের ব্যাপার—খুব বড়োলোক ছাড়া কেউ পেরে ওঠে না। সবাই তাই দোকানে তৈরি ফ্রক কিংবা স্যুট কিনতে ছোটে। কলকাতায় আমরা যে সমস্ত ব্লাউজ নিজের মাপ দিয়ে দর্জিকে বাড়িতে ডেকে এনে করাই, তা শুনে আমার বান্ধবীরা ভেবেছে আমি নিশ্চয় কোন রাজকুমারী বা মিঃ বিড়লার আত্মীয়া।"

খুকু বললো, "মামা, আজকে ডরমিটরিতে নো-মিল করে এসেছি। তোমার সঙ্গে খাবো!"

বললাম, "খুব ভাল করেছিস। তা এখানকার খাওয়া-দাওয়া তো এতো ভালো শুনি—কিন্তু তুই তো মোটা হলি না।"

"রক্ষে কর। তুমি আমাকে ধুমসি হতে বলো নাকি? এতেই কাজ করতে গেলে হাঁপিয়ে উঠি!"

বললাম, "দেখ পূর্ব ও পশ্চিমের সৌন্দর্যবোধের তফাৎ আছে। এদেশে যাদের স্লিম বলে—অর্থাৎ গাঁজার ছিলিমের মতো রোগা লম্বা—তাদের আমরা তারিফ করি না। নারীসৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের দেশে স্নেহের সম্পর্ক রয়েছে—স্নেহজাত পদার্থ দেহে থাকলে তাই ভাল হয়।"

"তোমাদের সব সেকেলে ধারণা। আমার বান্ধবীরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসছে—এদেশের মেয়েদের দেখবে কীরকম রোগা থাকবার চেষ্টা করছে। পরীক্ষা পাশ থেকে ওটা কম দুশ্চিন্তার কারণ নয়।"

আমি বললাম, "তা এদেশের খাবার-দাবারের অন্য গুণও রয়েছে—তোর তো চোখে চশমা ছিল, এখন দেখছি চোখ ভাল হয়ে গিয়েছে।"

"না মামা, চোখ ভাল হয়নি মোটেই এখানে এখন বেশীর ভাগ মেয়ে কনট্যাক্ট লেন্স পরছে—চোখের মণির সঙ্গে কাঁচ আটকে দেয়—আর ফ্রেম লাগে না। চশমার দাগ পড়ে না নাকের ওপর। এখানে কারও দাঁত এবড়োখেবড়ো দেখবে না—সব মেয়েরই মুক্তোর মতো দাঁত। কারণ ছেলেবেলায় ডেন্টিস্টদের কাছে গেলেই তাঁরা এবড়োখেবড়ো দাঁত সোজা করে দেন।"

খুকু আমাকে ইউনিভারসিটি কাফেতে নিয়ে গেলো। থালা হাতে লাইনে দাঁড়াতে হয় সবাইকে। বিরাট জায়গা—অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে ডিনার কিনে এক-একটা টেবিলে বসছেন এবং খাওয়া শেষ করে এঁটো থালাটা কনভয়ের বেল্টের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন!

কতকগুলো ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে টেবিলগুলো মুছে দিচ্ছে। খাবার নিয়ে আমরাও একটা ছোট্ট টেবিলে এসে বসলাম। একটি মেয়ে আমাদের টেবিল মুছছিল। খুকুকে দেখে সে বললো, "হাই, চ্যারিটা।" খুকু বললে, "মামা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আমাদের সহপাঠিনী অনিতা গ্রান।"

বান্ধবী বিদায় নিলে খুকু বললো "অনিতা এখানে ঝিয়ের কাজ করে —কিন্তু ওর বাবা একটা বড়ো কোম্পানির ম্যানেজার। নিজেদের তিনখানা গাড়ি। তবু সে কাজ করে নিজের খরচা অনেকখানি তুলে ফেলে। এইটাই এদেশের নিয়ম। ছেলেমেয়েরাও বাপমায়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে চায় না। যে যার নিজের চেষ্টায় রোজগার করতে এবং নিজের খুশী মতো জীবন উপভোগ করতে চায়। যতক্ষণ আমি কারও কাছে হাত পাতছি না ততক্ষণ আমার ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার নেই কারও।"

"তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা জিনিষটা শুধু খাতায় লেখা থাকে না। দৈনন্দিন জীবনেও এর মূল্য রয়েছে।"

"যথেষ্ট। সেইটাই এই সভ্যতার শক্তি। আবার সেইটাই এদের যত কষ্টের কারণ বলতে পারো।"

সুচরিতার মুখের দিকে তাকালাম। বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট হলেও সমাজতত্ত্বে সে পণ্ডিত। খুকু নৃতত্ত্বে রিসার্চ করছে এবং

দুদিন পরে নামের আগে ডক্টরেট জুড়বে, ওর কথা আমাকে মন দিয়ে শুনতেই হবে। সুচরিতা বললো, "মামা, লেখকরা তো মানুষের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তোমাকে অনেক জিনিস এখানে কয়েকদিনের মধ্যে দেখিয়ে দেবো। আমাদের তো পরীক্ষা-পাশের স্বার্থ রয়েছে—তোমার ওসব চিন্তা নেই—তুমি এদের আরও ভাল করে বুঝতে পারবে।"

আমি বললাম, "সভ্যতাটা ভাল কি মন্দ সেটা বড়ো কথা নয়—কিন্তু আমাদের থেকে যে পৃথক তাতে সন্দেহ নেই। সাধে স্বামী বিবেকানন্দ এদের কর্মনিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করতেন! কে কী কাজ করে তা দিয়ে এরা মানুষের বিচার করে না—যা খুশী করবার স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। কোনো কাজই এখানে ছোট নয়।"

"বরং ছোট কাজগুলোই ক্রমশঃ বড়ো হয়ে উঠছে! নাপিত, ধোপা, রাস্তার ঝাড়ুদার এখন ছোকরা অধ্যাপকদের থেকে বেশী রোজগার করছে। রাজমিস্ত্রীরা তো রীতিমত বড়ো লোক—ঘণ্টায় পঁচাত্তর টাকা রোজগার করে।" খুকুর কথা শুনে আমি তো তাজ্জব।

হঠাৎ মাথায় প্রশ্ন এলো "হ্যাঁরে, এরা কি করে এতো এগিয়ে যাচ্ছে? অথচ আমরা ক্রমশঃ পিছু হটে যাচ্ছি। খাতায়-কলমে প্রমাণ করা না গেলেও আমাদের দেশের সব লোকের ধারণা দিনকাল ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে।"

খুকু বললো, "আমার একটা থিওরি আছে। তুমি যে উইলিয়মকে দেখলে তারও একটা থিওরি আছে। আমার ধারণা, এরা যে বড়ো হচ্ছে তার কারণ সন্ধ্যে সাড়ে-ছ'টার মধ্যে এরা ডিনারের পাট চুকিয়ে ফেলে। নারীজাতির মুক্তির পথে এটাই প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের বাড়িতে মনে আছে—রাত সাড়ে-আটটা পর্যন্ত দফে-দফে চায়ের পাট চলেছে। মা, বৌদি, ফুচু, দুটো চাকর ও একটা রাঁধুনি চা সাপ্লাই করতে হিমসিম খাচ্ছে। তারপর খাওয়ার পালা। ন'টা থেকে আরম্ভ করে সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে ডিনার করছে। যে-জাতের বারো আনা জীবনীশক্তি বাজার করা, তরকারি কোটা, আঁচ দেওয়া, রান্না করা, পরিবেশন করা এবং বাসনমাজায় বেরিয়ে যাচ্ছে সে-জাতের উন্নতি কী করে হবে মামা? ভোর সাড়ে-পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারে যে ভোজনকেন্দ্রিক নাটক চলেছে তার সংস্কার না হলে আমরা পৃথিবীর অন্য লোকদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবো না।"

"মন্দ বলিসনি, খুকু! এ-বিষয়ে কেউ ডক্টরেট করলে আরও অনেক কিছু জানা যেতো।"

খুকু বললো, "মামা, এখানে সাতটার মধ্যে সবাই ঝাড়া-হাত-পা হয়ে গেলো, তারপর অজস্র কাজ করবার সুযোগ। যে যার পছন্দমতো কিছু না কিছু নিয়ে মেতে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো কথাই নেই—কেউ লাইব্রেরিতে যাচ্ছে রেকর্ড শুনতে বা বই পড়তে, কেউ গবেষণা করছে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে, আবার বিরাট একদল টি-ভি'র সামনে বসে নাটক দেখছে এবং বিজ্ঞাপন কোম্পানির অত্যাচার সহ্য করছে।"

উইলিয়মের মতামতটা জানতে চাইলাম। খুকু বললো, "বিলের ধারণা আমাদের অনগ্রসরতার পিছনে রয়েছে প্রোটিনের অভাব। বহু প্রজন্ম ধরে প্রোটিনের অভাবে গরীবদেশের মানুষরা পরিশ্রমের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং সস্তায় কৃত্রিম প্রোটিন আবিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন। তারপর নাকি পৃথিবীর রূপ পাল্টে যাবে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুকু বললো, "মামা, এবার ওঠা যাক। হাতে বেশী সময় নেই, তোমাকে সব দেখিয়ে দিতে হবে।"

"এখন চলো আমাদের ডর্মে। মেয়েরা কীভাবে থাকে তা তোমার দেখা দরকার।"

"মেয়ে হোস্টেলের ভিতর! সর্বনাশ! সেখানে তুই আমাকে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলবি নাকি?"

"আঃ মামা, কী করে তুমি এদেশের প্রাণের কথা লিখবে যদি মেয়েদের না দেখো? কলকাতার মেয়ে হোস্টেল আর এখানকার হোস্টেলের অনেক তফাৎ। আমার দু'একজন্ বান্ধবীকে তোমার কথা বলে রেখেছি।"

ওদের ডর্মটা বিশাল এক সাততলা বাড়ি। বললাম, "হ্যাঁরে, মেয়েদের হোস্টেলে দারোয়ান কই?"

"আমরা নিজেরাই এক-একটি দারোয়ান।"

"তাহলে ছেলেরা ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে।"

"একটু-আধটু বিধিনিষেধ আছে—কিন্তু সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আজ ওপেন হাউস—রাত এগারোটা পর্যন্ত সবার জন্যে দরজা খোলা।"

মধ্যরাতে স্বাধীনতার এই খবরটা পেলে তাজুদির মুখের অবস্থা কীরকম হবে ভাবছিলাম।

সুচরিতা বললো, "বাইরের শাসনে এরা তেমন বিশ্বাস করে না। এরা মনে করে, বাইরে প্রলোভন থাকবেই—চব্বিশ ঘণ্টা কে তোমার গার্জেনি করবে? তুমি নিজেকে সামলাতে শেখো। সেই শিক্ষাই সারাজীবন কাজে লাগবে।"

মেয়ে হোস্টেলের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। সুচরিতা ঘাড় ফিরিয়ে বললো, "কি হলো মামা?"

"মানে, লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর পারমিশন নিয়েছিস তো?" আমি আমতা-আমতা করি।

"তোমায় বললুম না, রাত্তির দশটা পর্যন্ত কোনো অনুমতি দরকার হয় না; তারপর কোনো কোনোদিন গেট বন্ধ হয়ে যায়।"

একতলায় ঢুকেই ডানদিকে বিরাট হল ঘর। "এইটা আমাদের কমন-রুম বলতে পারো," সুচরিতা জানালো।

কমনরুমে কয়েকটি ছোকরা সিগারেট ফুঁকছে। খুকুর টীকা—"এরা বোধ হয় কোনো বান্ধবীর জন্যে অপেক্ষা করছে। কিংবা মেয়েরা হয়তো ওদের বসিয়ে রেখে গিয়েছে—সবাইকে তো আর নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় না।"

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। দু'চারজন ছাত্রী বেশ খুশী মেজাজে গুণ গুণ করতে করতে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। এদের দু'জন খুকুকে দেখে "হাই, হাই" করলো।

খুকু বললো "জানো মামা, এই কথাটা প্রথম-প্রথম কেমন কানে লাগতো। এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—আমি নিজেও দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার হাই বলছি।"

"যস্মিন দেশে যদাচার," আমি সমর্থন জানাই।

"এদের সমস্ত ব্যাপারে যদাচার করা অবশ্য বাঙালী মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব," খুকু উত্তর দেয়।

আমরা এবার তিনতলায় উঠে এসেছি। খুকুর রুম নম্বর ৩১৪—অর্থাৎ তিনতলায় চৌদ্দ নম্বর ঘর। এই একটা ব্যাপারে ইংরেজদের থেকে আমেরিকানরা বুদ্ধিমান। থার্ড ফ্লোর মানে এখানে তিন তলা, চার তলা নয়। গ্রাউণ্ড ফ্লোর বাদ দিয়ে তলা গুনবার দুর্বুদ্ধি ইংলণ্ডেশ্বরীর মাথায় কী করে এসেছিল তা ভগবানও জানেন না!

ল্যাণ্ডিং থেকে ডানদিকে মোড় ফিরতেই দুটো জিনিস নজরে পড়লো—টেলিফোন ও বেশবাস।

লম্বা করিডরে সারি সারি টেলিফোন বুথ—অন্ততঃ পঁচিশ-তিরিশটা হবে। প্রতি ফোনের সামনেই একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টেলিফোন ধরে বিচিত্রভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে এক-একজন। আর্টিস্ট ও ভাস্করা এখানে এলে মানবদেহের লীলা সম্পর্কে নতুন আইডিয়া পেতেন। কেউ সোজাসুজি দাঁড়িয়ে ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে টেলিফোনটা কানের কাছে চেপে রেখেছে—হাতটা মুক্ত। কথার ফাঁকে-ফাঁকে হাতের নোখগুলো খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। কেউ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কোমরটা একটু খেলিয়ে একটা পা দেওয়ালে তুলে দিয়েছে। নারীদেহের আরও কত ভঙ্গী ও ছন্দ—যার কয়েকটা নমুনা যেন অজন্তা এবং খাজুরাহের সুন্দরীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

সবাই কিন্তু সাধনামগ্ন! কোনোদিকে দৃকপাত না করে ফোনমাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদান করছে।

সুচরিতা দ্রুত এগিয়ে যেতে-যেতে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "কিছু বলবে নাকি?"

আমি বললাম, "এতো টেলিফোন!" সুচরিতা বললো, "এ আর ক'টা। এ-ছাড়াও প্রত্যেক ঘরে ফোন আছে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় দু'জন রুমমেটের একটা ফোনে চলে না, তাই বারান্দায় বাড়তি ফোনের ব্যবস্থা।"

বললাম, "কলকাতার শেয়ারবাজার লায়নস রেঞ্জ ছাড়া আর কোথাও এতো লোককে এক সঙ্গে ফোন করতে দেখিনি। আর নিষ্ঠা দু' জায়গাতেই সমান।"

সুচরিতা হেসে ফেললো। "নিষ্ঠা এখানে আরও বেশী। ওখানকার বেচু-কিনুতে লাভ লোকসান, এখানকার বেচু-কিনুতে জীবনমরণ।"

নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে চাবি বার করে খুকু বললো, "আমার রুমমেট এখনও ফেরেনি মনে হচ্ছে।"

ঘর খুলে ফেললো সুচরিতা। "দাঁড়াও, একটা ধূপ জ্বালিয়ে দিই।"

ধূপ জ্বালিয়ে সুচরিতা বললো, "দু'খানা বিছানায় আমরা দুজনে থাকি। মার্থা এখনও ডিনার সেরে ফেরেনি।"

আমাকে ও পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসতে দিলো। বেশ বড়ো ঘরখানা। ছবির মতো সাজানো। বললাম, "ছেলেদের হোস্টেল থেকে মেয়েদের হোস্টেল অনেক পরিষ্কার হয়। তোর দাদার বি-ই কলেজ হোস্টেলে একবার গিয়েছিলাম। সবকিছু অগোছালো—একটু আগেই যেন ভূতের নৃত্য হয়ে গিয়েছে। তোদের এখানে বিছানার চাদর এমন ভাবে মোড়া যেন হিলটন হোটেলের ডবল রুম স্যুইট।"

দু'দিকে দু'খানা পড়ার টেবিল। সেখানে গাদাগাদা বই ও খাতা। এককোণে দুটো টাইপরাইটার।

"তুই কি আজকাল টাইপ করিস?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

সুচরিতা বললো, "মামা, আধুনিক সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো—টেলিফোন, টাইপরাইটার ও ট্রান্সপোর্ট। এই তিনটে ছাড়া জীবনের কথা এরা ভাবতে পারে না। বস্তিতে পর্যন্ত টেলিফোন দেখতে পাবে। কুড়ি কোটি লোকের জন্যে এদেশে দশ কোটি ফোন চালু রয়েছে। আর ইস্কুল কলেজ সর্বত্র টাইপরাইটার। হাতে লেখা কোন খাতা অধ্যাপকরা দেখতে চান না। সব কিছু টাইপ করে দিতে হবে। অধ্যাপকরাও ক্লাশে ডিকটেশন দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। তেমন কিছু প্রয়োজনীয় বুঝলে তাঁরা নিজেরাই স্টেনসিল কাগজে টাইপ করে ফেলেন এবং ছেলেদের জন্যে কপি নিয়ে আসেন।"

"বলিস কী!" আমার চোখ কপালে বেরিয়ে আসবার মতো অবস্থা।

"হ্যাঁ মামা। তুমি তো জানো, আমি জুনিয়র ক্লাশ দু'একটা নিই। সেখানে সকলের টাইপরাইটার আছে—যেমন আমাদের দেশে মাষ্টার-মশায়রা আশা করেন প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী লেখবার জন্যে পেন্সিল নিয়ে আসবে।"

"তা হলে ক্লাশে কী হয়? আমাদের সময় কলেজে অনেক মাস্টার-

মশায় তো সারাক্ষণই পুরনো খাতা থেকে নোট দিতেন। নোটবই আনতে ভুলে গেলে ক্লাশ বন্ধ থাকতো।"

সুচরিতা বললো, "এখানে সবারই সময় দামী। যে-লোকের সময়ের দাম নেই সমাজেও তার কোনো দাম নেই। অথচ গরীব-বড়োলোক শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই প্রতিদিন মাত্র চব্বিশঘণ্টা সময় পায়, সুতরাং রেশনের জিনিস সবাই বুঝেসুঝে খরচ করে। ক্লাশেও নোট দিয়ে সময় নষ্ট হয় না। মাষ্টারমশায়রা ছেলেদের ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানোতে বিশ্বাস করেন না। ওঁরা বলেন, আজকের ক্লাশে যা পড়ানো হবে সে সম্পর্কে কি কি ভাল বই আছে তার নাম ও চ্যাপ্টার আগেই লিখে জানিয়ে দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা এগুলো পড়ে ক্লাসে আসবে—তারপর আলোচনা শুরু হবে।"

"মানে, মাস্টারমশায়রা একঘণ্টা ধরে একতরফা লেকচার দিয়ে যাবেন, আর ছাত্ররা হাঁ করে শুনবে বা ঘাড়গুঁজে ডিকটেশন তা কেউ চায় না। এখানে ভাবের আদান-প্রদান হবে। এবং ছাত্ররা সীটে বসে বসে বিড়ি-সিগারেট খেতে-খেতেই আলোচনায় যোগ দেবে।"

বললুম, "বুঝেছি বাপু। এসব বড্ড বাড়াবাড়ি—আমাদের দেশে ছাত্র বা মাষ্টারমশায় কারুরই সহ্য হবে না।"

খুকুর ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট বক্সরুমে রেফ্রিজারেটর রয়েছে, আর একদিকে ড্রেসিং-টেবিল। বৈদ্যুতিক হিটার আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। খুকু বললো, "মামা, কফির ব্যবস্থা করি?"

"এখন আবার কফি আনাবার হাঙ্গামা করবি কেন?"

"আনাতে হবে না, এখানেই তৈরি করবো। রান্নার ব্যবস্থা নেই—কিন্তু ছোট্ট হিটার আর ফ্রিজের দয়ায় অনশনে না-মরার ব্যবস্থা আছে। একটা ফ্রিজের দুটো তাকে আমাদের দু'জনের জিনিসপত্তর থাকে। সকালের জলখাবার, রাতের সাপার, এমন কি মাঝে-মাঝে ডিনারের ব্যবস্থা ওই সব খাবার থেকেই হয়ে যায়।"

"মানে, তুই ঠিকমতো খাস না—দিদিকে বলতে হবে।"

"সপ্তাহে একদিন মুদির দোকান থেকে খাবার, ফলের রস, ডিম কিনে আনি। এখানকার মুদির দোকানে একবার নিজের চোখে দেখো মামা।

মুদির দোকান ভিজিট না করলে আমেরিকা দেখা হলো না। দোকান আছে—অথচ দোকানি অনুপস্থিত। দোকান থেকে বেরুবার পথে একজন ক্যাশিয়ার পয়সা নিচ্ছেন। সমস্ত দোকানেই তোমার অবাধ গতিবিধি। একটা ছোট্ট ঠেলা নিয়ে নিজের পছন্দমতো মাল সংগ্রহ করো। আলু থেকে মাংস, মদ থেকে মিঠাই সব পাবে। সব জিনিসই ছোট ছোট প্যাকেটে রয়েছে—প্যাকেটের গায়ে ওজন এবং দাম লেখা আছে।

"আলুও প্যাকেটে কিনতে হবে? কলকাতার লোকদের তাহলে মন খারাপ হয়ে যাবে। আধঘণ্টা ধরে টিপে টিপে নিজের পছন্দমতো যদি আলু না কেনা হলো এবং আলুওয়ালা যদি দাঁড়ি ঝুলিয়ে তার থেকে দু' এক টা টপাটপ না ফেলে দিলো তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কী?" আমি জানতে চাই।

"আলু কি বলছো মামা—বরফ পর্যন্ত এখানে প্যাকেটে বিক্রি হয়। এখানে বাজার করাটা কলকাতার তুলনায় নিতান্ত অহিংস ব্যাপার—দরাদরি নেই, কথা কাটাকাটি নেই, চিৎকার করে লোক জড়ো করা নেই। আছে শুধু রঙিন প্যাকেট—যা সেলফ থেকে তোমার অনুগ্রহ পাবার জন্যে হাতছানি দিচ্ছে, আর আছে পোষ্টার। এক ডলারের মাল যে এই সপ্তাহে পঁচাশি সেন্টে দেওয়া হচ্ছে তার সগর্ব ঘোষণা। এখানে বাজার করার মুস্কিল কি জানো—এতোরকম জিনিস পাওয়া যায় যে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের। যাদের হাতে কাঁচা-পয়সা নেই অথচ যথেষ্ট রুচি আছে, তারা বাজারে গেলেই মনোকষ্ট পায়।"

দরজায় এবার টোকা পড়লো। খুকু বললে, "মার্থা বোধ হয় এসে পড়েছে।"

বলতে-বলতেই মার্থার প্রবেশ। বয়স একুশ-বাইশ। লম্বায় খুকুর থেকে বেশ খানিকটা উঁচু; একমাথা কোঁকড়া চুল। খুকু কানে-কানে বললো, "একেই বলে হনি ব্লণ্ড।" কত রকমের যে ব্লণ্ড আছে ভগবান জানেন।

মার্থার বেশবাসটি অদ্ভুত। হাফ শার্টের মতো ঢিলা ব্লাউজ পরেছে—আর তলায় টাইট হাফপ্যান্টের মতো, যা হাঁটু থেকে তিন ইঞ্চি ওপরে আটকে আছে। পায়ে কোনো হোস বা মোজার বালাই নেই।

একটা রঙিন স্লিপার পরেছে। বান্ধবীকে খুকু বললো, "মামাকে আজই হোস্টেলে ধরে আনলাম।"

মার্থা বললো, "খুবই ভাল করেছো চ্যারিটা।"

আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে মার্থা জানালো, "আমরা ক'দিন ধরেই আপনার অ্যারাইভালের জন্যে অপেক্ষা করছি। চ্যারিটার ভয়ানক আনন্দ।"

আমি বললাম, "আমার ভাগ্নী আশা করি আপনাদের কোনো দুশ্চিন্তার কারণ হয় না।"

"দুশ্চিন্তা।" মার্থা চিৎকার করে উঠলো। "আপনার ভাগ্নীকে আমরা একটা ছোটখাট পরী মনে করি। যদিও, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের একটু হিংসেও আছে।"

"কারণ?" আমি জানতে চাই।

"কারণ, ওই অদ্ভুত সুন্দর শাড়ি। শংকর (আপনাকে নাম ধরে ডাকছি, আপনি আমাকে মার্থা বলবেন) আপনি জানেন না—রোপট্রিকের পর এই শাড়িই আমাদের দেশের ছেলেদের মাথা ঘোরাচ্ছে—শাড়ি একটা মধুর বিস্ময়, যার রহস্য ভেদ করতে সব ছোকরার সমান আগ্রহ।"

আমি হেসে ফেললাম। "আপনারা তাহলে শাড়ি পরতে আরম্ভ করুন।"

"আশ্চর্য হবেন না, সত্যিই যদি আমরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ির দিকে নজর দিই।"

মার্থার জন্যে খুকু এবার কফি আনতে গেলো। মার্থা আমাকে বললো, "চ্যারিটা হচ্ছে একরাশ মেয়ের মধ্যে একটি মুক্তো। কত ছেলে যে ওর সঙ্গে ডেট করার জন্যে পাগল।"

এসব কথা আমার তেমন ভাল লাগে না, তাজুদির কথা ভেবে। মার্থা বললো, "আমার বয়-ফ্রেণ্ডকে একদিন বকুনি দিয়েছি। ফের যদি চ্যারিটার কথা জিজ্ঞেস করো তা হলে ভাল হবে না।"

মার্থা ইংরিজী সাহিত্য পড়ে। ওর বাবা থাকেন নিউ ইয়র্কে, মা শিকাগোতে। বিয়ে ভেঙে বাবা এবং মা আবার বিয়ে করেছেন। দু'দিক থেকে সৎ ভাই এবং সৎ বোন হয়েছে মার্থার। মার্থা বললো, "এবার

গরমের ছুটিতে বাবার কাছে ছিলাম এক সপ্তাহ, মায়ের কাছেও এক সপ্তাহ। তারপর আমার বয়ফ্রেণ্ডের কাছে চলে গিয়েছিলাম। ও সামার প্রোগ্রামে সিয়াটল-এ এক রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ করছিল। তা দু'জনে মিলে বেশ রোজগার করা গেলো। মাইনে তেমন বেশী নয়, কিন্তু সিয়াটল-এর লোকরা খুব দিলদরিয়া। ভাল বকশিস দেয়। প্রথম মাসে আমরা প্রত্যেকে তিনশ' ডলার শুধু টিপ্‌স থেকে পেয়েছি।"

মার্থা বললো, "টাকাটা আমরা নষ্ট করছি না।"

খুকু কফির কাপ নামিয়ে দিয়ে বললো, "টাকা তোমাদের খরচ করলে কেমন করে চলবে? তোমরা বিয়ে করে সংসার পাতলে টাকাটার দরকার হবে।"

মার্থা এবার ঘড়ির দিকে তাকালো। খুকু বললো, 'মার্থা, তুমি সময় নষ্ট কোরো না। বব তোমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করবে। তোমার সাফল্য কামনা করি।"

মার্থা কোনোরকম লজ্জা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ফোনে বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন প্রেমালাপের জন্যে।

খুকু বললো, "কারা যে ভাল আছে—আমাদের দেশের মেয়েরা, না এরা, বুঝি না।"

"কেন?" আমি প্রশ্ন করি।

"এই যে নিজের-বর-নিজে-খোঁজ পশ্চিমী পদ্ধতি এতে মেয়েদের ওপর বড়ো ধকল হয়!"

"বলিস কী? আমার ধারণা ছিল, গণ-ভোট নিলে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা এখন বিবাহ ব্যাপারে স্বাবলম্বী হবার পক্ষেই মত দেবে।"

"জিনিসটার অনেক দিক ভেবে দেখবার আছে। এই বেচারা মার্থার অবস্থা দেখো না। কোথায় পরীক্ষার পড়া তৈরি করবে, তা নয় চললো ফোনে বয় ফ্রেণ্ডের মনোরঞ্জন করতে। প্রেমের একটা বিচিত্র অঘোষিত যুদ্ধ ক্যামপাসে সর্বদা চলেছে।"

"যুদ্ধ? বলিস কি।"

"যুদ্ধ ছাড়া আর কী বলবে মামা? জীবনমরণ প্রশ্ন। তুমি নিজে ভাল করে দেখো—তোমার মজা লাগবে। তাছাড়া যারা পুরোপুরি প্রেম

করে বিয়ের পক্ষে তারা কিছু ভাববার খোরাক পাবে তোমার লেখা থেকে।”

মার্থা ইতিমধ্যে ফোন সেরে ফিরে এলো। খুকু বললো, “এত তাড়াতাড়ি?”

মার্থা বেশ গম্ভীর। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে এরা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মতো চাপা নয়। মার্থা বললো, “চ্যারিটা, ববের কথায় মনো হলো সে একটু অধৈর্য হয়ে রয়েছে। কোথায় যেন বেরুতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় ফোন এসেছে। আমি বুঝিয়ে দিলুম, তার যদি লম্বা ফোন করবার ইচ্ছে না থাকে আমারও তেমন মাথাব্যথা নেই।”

মার্থার মুখ-চোখ দেখে মনে হলো সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। খাতার পুরনো পাতা থেকে সে কী যেন খুঁজতে লাগলো।

খুকু জিজ্ঞেস করলো, “কী খুঁজছো? ওই ডাচ ছোকরা লুসিংকের নম্বর?”

মার্থা বললো, “বেচারা সেদিনও আমাকে ডেটিং-এর প্রস্তাব দিয়েছিল, আমি বলেছিলাম পরে জানাবো। আমি ভেবেছিলাম বব ছাড়া আর কারও ডেট নেবো না।”

মার্থা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “আশা করি তোমাকে বিব্রত করছি না। আমার বান্ধবীর কাছে শুনেছি—এই ব্যাপারে গুরুজনের সামনে আলোচনা করা তোমাদের দেশে শোভন নয়।”

আমি বললাম, “আমি মোটেই বিব্রত নই। বরং আপনার ঘরে বসে আপনার গোপনীয়তা ডিসটার্ব করার জন্যে লজ্জিত।”

মার্থা নতুন টেলিফোন নম্বর নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলো।

খুকু বললো, “ডেভিড লুসিংক হলাণ্ড থেকে পড়তে এসেছে এখানে। মার্থার ওপর তার নজর রয়েছে—মার্থা এতোদিন পাত্তা দেয়নি। আজ ওর টেলিফোন পেয়ে অবাক হয়ে যাবে।”

খুকু আমাকে বসতে বলে এক মিনিটের জন্যে বেরিয়ে গেলো। ফিরে এলো একটি ঝলমলে সোনালী চুলের মেয়েকে নিয়ে। এদেশের যেটা স্বাভাবিক সেই স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য খুকুর এই বান্ধবীর মধ্যেও রয়েছে। খুকু বললো, “আমার এই বান্ধবীর নাম হেলেন মিড।”

হেলেনের চোখে চশমা দেখে অবাক হলাম—সবাই তাহলে কনট্যাক্ট

লেন্সের দলে এখনও যায়নি। হেলেনের চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটি একটু ভাবুক প্রকৃতির।

হেলেন বললো, "আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে আপনার ভাগ্নীকে অনুরোধ করেছিলাম। ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেলে আমার খুব আনন্দ হয়।"

হেলেন সাধারণ এক-রঙা ফ্রক পরেছে। চুলটা আলগোছাভাবে খোঁপা করা, অনেকটা আমাদের দিশী কায়দায়।

"আপনার সঙ্গে আলাপ করার একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। কিন্তু সেটা পরে বলবো। তার আগে আপনি বলুন, এদেশের পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে আপনার কীরকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে?"

হেলেনের প্রশ্নের ধরনটাই আলাদা। প্রশ্নের মধ্যেই ওর ব্যক্তিত্ব মেশানো আছে। বললাম, "এক কথায় যে আপনার প্রশ্নের জবাব হয় না তা বুঝতেই পারছেন। এদেশে প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা যে ইন্টারেস্টিং তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এতো সহজে সব বলা যায় না। আপনাদের দেশের কিছু পুরুষ আমি স্বদেশে দেখেছি। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে আপনাদের দেশ মানবজাতির প্রথম সারিতে রয়েছে, তার থেকে প্রমাণিত যে আপনাদের পুরুষরা এই বিষয়গুলো ভাল বোঝেন। আপনি তো জানেন, আজকের যুগে সব দেশকে বিচার করা হয় তার উৎপাদন এবং মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ দিয়ে। এদেশে পুরুষদের জীবনে দেখছি দুটো ভাগ—কীর্তি ও আদর্শ। কর্মক্ষেত্রে তুমি কতখানি কাজের লোক তাই দিয়ে তোমার বিচার হবে—সেখানে আদর্শের কোনো স্থান নেই। কাজেই সেই মানুষটি সংসারে ফিরে এসে তার আদর্শের পরিচয় দিতে পারে—স্নেহ, মায়া, মমতা, এসব ছেলেপুলে, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজনের জন্যে। এ ব্যাপারে কিছু বলবার মতো মতামত এখনও আমার তৈরি হয়নি। তবে মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি।"

হেলেন উৎসাহিত বোধ করলো। "বলুন, মেয়েদের সম্বন্ধেই তো জানতে চাই।"

আমি বললাম, "অনেকদিন আগে নতুন ভারতবর্ষের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আপনাদের দেশে এসেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও

এদেশে নারী জাতীর স্বাধীনতা দেখে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং দেশে গিয়ে বার-বার নারীমঙ্গলের কথা বলেছেন। দেখতে ভাল লাগে, মেয়েরা এখানে কত স্বাধীন। ছেলেদের সঙ্গে তারা সব বিষয়ে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে।"

হেলেন এবার ফিক করে হেসে ফেললো। জিজ্ঞেস করলাম, "হাসছেন কেন ?"

হেলেন বললো, "আপনার সঙ্গে এ-বিষয়ে অনেক কথা বলার দরকার। চ্যারিটার কাছে আপনাদের সংসারের কথা শুনেছি এবং আপনাকে বলেই ফেলি, আমার ইচ্ছে ভারতবর্ষে যাওয়ার। কারণ, ভারতবর্ষ যে কত বড়ো, প্রায়ই দেখি আপনাদের দেশের লোকেরাই তা জানে না।"

আমি হেলেনের কথা শুনে অবাক। ওইটুকু মেয়ে যে আবার হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে উঠবে আশা করিনি।

হেলেন বললো, "বন্ধ ঘরের মধ্যে কেন ? চলুন, ডরম থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে গিয়ে কোথাও বসা যাক।"

"বাইরে ঠাণ্ডা লাগবে না তো ?" সুচরিতার প্রশ্ন।

জানালার বাইরে রাখা থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে হেলেন জানালো, "বাইরের অবস্থা গ্লোরিয়াস।"

হেলেন, খুকু, ও আমি ওভারকোট হাতে ডরমিটরি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

গাছে ঢাকা রাস্তাগুলো কর্মক্লান্ত দিনের শেষে হাত-পা ছড়িয়ে চোখবুঁজে পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে হুস করে মোটরগাড়ি চলে যাচ্ছে। অদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট লাইব্রেরী বাড়িতে সমস্ত আলোগুলো জ্বলছে। পাশাপাশি আরও অনেকগুলো বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

হেলেন বললো, "ল্যাবরেটরিতে কাজ চলছে। ওখানে ছুটি নেই।"

খুকু বললো, "জানো মামা, হেলেনের একটা কবি-মন আছে।"

"তাই নাকি ?" আমি আগ্রহ প্রকাশ করি। কবিতা লেখে কিনা খোঁজ করি।

"লিখি না—কারণ এদেশের মেয়েরা তো স্বাধীন নয়। আর আপনি তো জানেন, স্বাধীনতা কবির প্রাণবায়ুর মতো।"

আমি একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। হেলেন বোধ হয়

আমার মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করলো। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললো, "শংকর, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? ঠিক উত্তর দেবেন?"

"সাধ্যমতো চেষ্টা করবো, হেলেন।"

"এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন বলুন তো?"

"তোমাকে মিথ্যে বলবো না, তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে আনন্দ হচ্ছে। আর ভাবছি, সাধারণ আমেরিকানদের বয়সের তুলনায় একটু অগভীর বলে মনে হতো, সে ধারণা তোমাকে দেখে পাল্টে যাচ্ছে।"

হেলেন বললো, "আপনার মুখে মধু পড়ুক। আমার যে প্রশংসা করলেন তার জন্য সহস্র আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনি যা ভাবছেন তার অর্ধেকও যেন সত্যি হয়।"

খুকু বললো, "হেলেনের পাল্লায় পড়ে আমরা মাঝে-মাঝে নৈশ ভ্রমণে বার হই।"

আমি বললাম, "খুব বেশি রাত পর্যন্ত একা একা ঘুরিস না।"

হেলেন হেসে ফেললো। "শংকর, আপনার ভাগ্নীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হবার কারণ নেই। এটা ইউনিভার্সিটি শহর—নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন বা শিকাগো নয়।"

খুকু বললো, "মামা, ওয়াশিংটনে তোমার নিজের কী হয়েছিল? একটা নারী গুণ্ডা তোমাকে তাড়া করেছিল?"

বললাম, "তোকে তো লিখেছিলুম, দিন দুপুরে শনিবারের অপরাহ্ণে নিগ্রো অঞ্চল দিয়ে আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিলাম—এমন সময় নারী কুস্তিগীর হামিদাবানুর মতো চেহারার একটি গুরুনিতম্বিনী মধ্যবয়সিনী সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায় আমাকে তাড়া করলো।"

খুকু রসিকতা করলো, "তোমাকে দেখে বোধ হয় খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল!"

"লক্ষ্য আমার হৃদয় হলে অবশ্যই আনন্দের কারণ ছিল—কিন্তু শ্রীমতীর লক্ষ্য যে আমার মানিব্যাগ তা বুঝেই প্রাণপণ ছুটতে আরম্ভ করলাম। উল্টোপথে সৌভাগ্যক্রমে এক ঢাকাই ছোকরা আসছিল। আমার অবস্থা দেখে সে তেড়ে আসতে মহিলা বিদায় নিলো—বুঝলো দুই পুরুষের সঙ্গে লড়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

খুকু বললো, "তা দিন-দুপুরে তুমি কী বলে ছুটতে আরম্ভ করলে—মহিলার মনোবাসনা ঠিকমতো না জেনে?"

"ইন্দো-পাকিস্তানী ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা চুক্তির সুফল উপভোগ করে যখন মনে ভরসা এলো, তখন ভাল করে মহিলার দিকে তাকালাম; ওই রকম ফোলা বেলুনের মতো চেহারা সচিত্র রামায়ণের তাড়কাবধ পর্ব ছাড়া কোথাও দেখিনি।"

"ছুটেছি বলে তুই হাসছিস। কিন্তু আমার বিপদের বন্ধু সামসুদ্দিন ভাই সাহেব একটুও হাসেননি। কারণ এ তো আর কলকাতার রাস্তা নয় যে আত্মরক্ষার্থে একটা কিছু ছুঁড়ে মারবো! যা চকচকে রাস্তা—কোথাও একটুকরো ইঁট পর্যন্ত পড়ে নেই।"

হেলেন ও খুকু তখন খুব হাসছে। "সামসুদ্দিন সাহেব আমাকে বিপন্মুক্ত করে যেমনি শুনলেন আমি বঙ্গসন্তান তেমনি ওঁর ভালবাসা ঝরে পড়তে লাগল। কিছুতেই ছাড়লেন না, জোর করে নিরাপদ অঞ্চলের এক ড্রাগ স্টোরে নিয়ে গিয়ে তুললেন।"

"কেন, তোমার গা-হাত-পা ছড়ে গিয়েছিল নাকি? সে কথা তো লেখোনি।" খুকু জানতে চায়।

বললাম, "আমি যেভাবে হাঁপাচ্ছিলাম তা দেখলে তোরা হয়তো কোরামাইন কিনতিস। কিন্তু ভাগ্যে এখানকার ড্রাগ স্টোরে ওষুধটা নিমিত্তমাত্র—বই থেকে বড়া সব কিছুই পাওয়া যায়। সামসুদ্দিন ভায়া আমাকে কফি খাওয়ালেন।"

হেলেন বললো, "এদের সঙ্গেই না আপনাদের বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেলো?"

"যুদ্ধ হয়ো গেলো বলে ভাই-এর বিপদে ভাই দেখবে না? আমার বাবা মফঃস্বল কোর্টের উকিল ছিলেন। সেখানে দেখেছি—দু'ভায়ে মামলা হলো। কিন্তু টিফিনের সময় বড়ো ভাই মিষ্টির দোকানে জলখাবার খেতে যাবার আগে ছোট ভাইকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে!"

"তোমার যত বানানো গল্প।" সুচরিতা সংশয় প্রকাশ করলো।

"বানানো নয় রে, দাদু বাবা বেঁচে থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারতিস। আমি তখন তো বাবার সঙ্গে রোজ হাওড়া কোর্টে যেতাম—নিজের চোখে দেখেছি।"

সামসুদ্দিন সেদিন কিছুতেই শুনলো না। আমার কফির দাম দিয়ে দিলো। বললো, "দাদা, আমরা ব্যাংগলি—আমাদের ব্যাংগলির মতো থাকতে দিন। আমেরিকান মিঞাদের পয়সা অনেক, তবু বাপের কাজ করে দিলেও ওরা পয়সা আদায় করে।

হেলেন বললে, "ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে। আপনি বলে যান।"

আমি বললাম, "সামসুদ্দিন ঢাকায় কোন ফ্যাক্টরির লেবার অফিসার। একেবারে কট্টর বাঙালী। মার্কিনীদের ওপর তেমন প্রসন্ন নয়। তিনি বললেন, "দাদা, আপনাকে কী বলবো—অদ্ভুত দেশ, এখানে সাবধানে থাকবেন। আপনাকে প্যাঁচে ফেলবার জন্য চারিদিকে ফাঁদ পেতে রেখেছে।"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করেছিলুম।

"পয়সা আর সেক্স দিয়ে সর্বদা সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কাগজের পাতা খুলুন, আধা ল্যাংটা মেয়েরা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। দোকানের শো-রুমে, সিনেমায়, থিয়েটারে, নভেলে, রাস্তাঘাটে সর্বত্র সেক্স। কিন্তু এই সুড়সুড়ি সহ্য করে নিজের কাজ করে যেতে হবে। কোনো বোকা যদি সরল মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো—তাহলে হৈ-হৈ পড়ে যাবে, কেলেংকারি ছড়িয়ে পড়বে। আপনি বলুন দাদা, এটা কেমন ধরনের সভ্যতা?"

আমি বলেছিলাম, "দিল্লীতেও এই রকম একটা খবর কানে গিয়েছিল। আফ্রিকা থেকে পড়তে-আসা এক ছাত্র হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। পাগল হবার কারণ আর কিছু নয়—বেচারা সরল সভ্যতা থেকে এসেছে, সেখানে মুখে এক এবং পেটে এক জিনিস নেই। অথচ এই নতুন দেশে সে দেখলো, মেয়েরা নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্যে আইন বাঁচিয়ে যতখানি সম্ভব নির্লজ্জভাবে সাজসজ্জা করছে—দেহের ভঙ্গী ও চোখের চাহনিতে সেক্স-আকর্ষণ বাড়াচ্ছে। অথচ বেচারা যখন আকর্ষণ বোধ করে কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে যায় তখন মেয়েরা আঁতকে ওঠে। লোকে তাকে অসভ্য জানোয়ার ভাবে। বেচারা এই সব হিপক্রিসির জন্যে তৈরি ছিল না। মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চাপবার চেষ্টা করতে গিয়ে বেচারা শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেলো।"

সামসুদ্দিন বললেন, "তাহলে ভাবুন দাদা, এসব তো আমাদের মধ্যে

ছিল না। বাঙালী মেয়েরা কোনোকালে এক গজ কাপড়ে তিনখানা ব্লাউজ বানিয়েছে? এসব শিক্ষা বিলেত-আমেরিকা থেকে রপ্তানি হচ্ছে, যাতে আমাদের সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যায়।"

সামসুদ্দিন আরও যা বলেছিলেন তা শুনতে হেলেন আগ্রহ প্রকাশ করলো। বললাম, "কফি খেতে খেতে সামসুদ্দিন বলেছিলেন, আমি হয়তো বোকা বাঙাল, তাই বুঝি না। কিন্তু দাদা, যতই গরীব হোক, আমাদের দেশে যদি কেউ বলে, আসুন দোকানে একটু চা খাওয়া যাক—তার মানে, যে-আমাকে দোকানে যেতে বলছে সে-ই আমার চা-এর দাম দেবে। কিন্তু দাদা, এখানে তো আমি তাজ্জব! একজন আমেরিকান সহকর্মী আমাকে খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে দেখি শুধু নিজের খাবারের দামটা বার করে দিলো। আমার তো কান লাল হয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা। এরকম অপমান দাদা জীবনে কখনও হইনি। রাতে ঘুম আসে না। শেষে আমাদের হোস্টেলেই চ্যাটার্জিবাবু ছিলেন। উনি সব শুনে বললেন, 'সামসুদ্দিন, এখানে ইংরেজী কথাগুলো মন দিয়ে শুনবে। জানো তো ইংরেজী ভাষাটা ডেনজারাস—দু'মুখো সাপের মতো—একই কথার দশটা মানে হতে পারে। মনের ভাব চেপে রাখবার জন্যই এই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। তোমাকে ছোকরা কি বলেছিল?—'আমার সঙ্গে লাঞ্চে চলুন' না 'আপনাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করছি।' আমি বলেছিলুম, হয়তো প্রথমটাই বলেছিল। কিন্তু তাহলেই কি সব দোষ মাফ হয়ে গেলো?"

সামসুদ্দিনকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম, প্রত্যেক দেশে সৌজন্য ও ভদ্রতার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই অনুযায়ী মার্কিনীরা হয়তো পরের বোঝা হতে চায় না। মার্কিনীরা অত্যন্ত সদাশয় বন্ধু হতে পারেন—তাঁরা যখন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অতিথি সৎকার করেন তার তুলনা নেই, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

সামসুদ্দিন ভাই সাহেব কিন্তু আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "দাদা, এদের গোড়ার কথাই হলো, হিজ-হিজ হুজ-হুজ—যে যার সামলাও। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?"

সামসুদ্দিন সেদিন আর একটা মূল্যবান বুদ্ধি দিয়েছিলেন। আমি বলছিলাম, "আজ যা ফাঁড়া গেলো—তাতে পকেটে পাশপোর্ট বা টাকাকড়ি

নিয়ে বেরনো নিরাপদ হবে না। এবার থেকে এগুলো হোটেলে রেখে রাস্তায় বেরুতে হবে!"

সামসুদ্দিন আমার কথা মন দিয়ে শুনে বললেন, "পাশপোর্টটা কাছে রাখবেন না—কিন্তু দোহাই পকেটে পাঁচটা ডলার অন্তত রাখবেন। কোনো গুণ্ডা, সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক, যদি আপনাকে কব্জা করে দেখে পকেটে পাঁচটা ডলারও নেই, তাহলে রাগের মাথায় খুন করে বসতে পারে। জানেন তো, এদেশে সময়ের দাম কত। গুণ্ডার সময় নষ্ট করলেও আপনাকে খেশারত দিতে হবে!"

হেলেন জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি সামসুদ্দিনের উপদেশ মেনে চলেছেন?"

স্বীকার করতে হলো, "নিউ ইয়র্ক এবং শিকাগোতে বেশী রাত্রে ঘুরে বেড়ানোটা খুব নিরাপদ মনে হতো না—এবং বন্ধু-বান্ধব সবাই সান্ধ্য ভ্রমণের বিরুদ্ধেই মত দিতেন।"

"ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। আপনি পৃথিবীর সমস্ত শক্তির কেন্দ্র ওয়াশিংটনে এসেছেন; সমস্ত সম্পদের মক্কা নিউ ইয়র্কে আছেন—অথচ আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে আপনি সুনিশ্চিত নন। অথচ আমরা আমাদের সভ্যতার গর্ব করি।" হেলেন বেশ দুঃখের সঙ্গেই বলে উঠলো।

আমি বললাম, "এতে কর্তৃপক্ষের তো কোনো হাত নেই—তাঁরা তো চেষ্টার ত্রুটি করেন না।"

"স্বীকার করছি চেষ্টা হয়—কিন্তু কে না জানে এই দেশে আমরা চেষ্টা দিয়ে মানুষের বিচার করি না, ফল দিয়ে করি।"

খুকু বললো, "মামা, আমরা অহেতুক সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছি।"

আমি বললাম, "খুকু, তোমার সঙ্গে আমি একমত। গুণ্ডা ছাড়াও আরও অনেক কিছু আলোচনার বিষয় রয়েছে। হেলেন, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি—আপনাদের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু যতদূর জানি পৃথিবীর কোনো জাতই নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে এতটা ওয়াকিবহাল নয়। কোনো দেশেই নিজেদের দোষ সম্বন্ধে এমন নির্দয় বিশ্লেষণ হয় না।"

খুকু বললো, "রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ এ-বিষয়ে কম যায়

না—তবে সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারে আমরা এখনও নিজেদের সমালোচনা করতে তেমন অভ্যস্ত হইনি।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা নদীর ধারে এসে পড়েছি। সিঁড়ি ভেঙ্গে জলের কাছে নেমে এসে আমরা ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। অদূরে কয়েক ডজন যুবক-যুবতী জোড়ে জোড়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। কেউ ফিস ফিস করে কথা বলছে, কেউ গুন গুন করে গান গাইছে—কেউ বা আকাশের দিকে মুখ করে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

হেলেন বললো, "আমি মাঝে-মাঝে এইখানে এসে লেখাপড়া করি। দুপুরবেলায় নদীর ধারে বসে বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগে।"

হেলেন বললো, "আপনি একটু আগে বলছিলেন এই দেশে মেয়েরা স্বাধীনতা উপভোগ করে—কথাটা যদি সত্যি হতো, তাহলে খুব ভাল হতো।"

আমি বললাম, "আপনারা কেমন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ান। আপনাদের হাতেই শুনেছি দেশের বেশীর ভাগ টাকাকড়ি রয়েছে—ছেলেরা তাই আপনাদের খাতির না করে পারে না। আপনারা দেখি একা-একা ফ্ল্যাট নিয়ে আছেন—আপনাদের রক্ষে করবার জন্যে মায়েরা সব সময় উৎকণ্ঠিতা নন। আপনাদের বিয়েতে পাত্রপক্ষকে যৌতুক দিতে হয় না—স্বামীর বাবা-মা আপনাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না।"

হেলেন বললো, "লিস্টি আর বাড়াবেন না। আপনি যত ফিরিস্তিই দিন, আপনার ভাগ্নীকে দেখে মনে হয় আপনাদের দেশে নতুন যুগের মেয়েরা আমাদের থেকে স্বাধীন।"

"এ আপনি কি বলছেন! আমি অবাক হয়ে যাই।"

হেলেন বললো, "আপনি দেশে গিয়ে বলবেন, একজন, আমেরিকান ছাত্রী নিজে আপনাকে বলেছে—মার্কিন দেশে মেয়েরা এখনও পুরুষের মুখ চেয়ে আছে। এখনও পুরুষরাই সর্বক্ষেত্রে জিতছে।"

খুকু বললো, "এ-সম্বন্ধে হেলেনের চিন্তা বেশ স্বাধীন।"

হেলেন বললো, "আপনাদের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আপনার ভাগ্নী একটি ছোটখাট জিনিয়াস। পড়াশোনায় আপনাদের দেশে শুধু নয়, এখানেও সে প্রচুর নাম কিনেছে। ওর বুদ্ধির দীপ্তি, ওর মেধা কি আপনার বা আপনার বোনের দুশ্চিন্তার কারণ?"

"দুশ্চিন্তার কারণ হবে কেন? বরং আমরা সবাই গর্বিত। খুকু যখন বিদেশে আসবার ব্যবস্থা করলো তখন ওর মা-বাবার কত আনন্দ। আমরাও সাধ্যমত ওকে উৎসাহ দিয়েছি। শুধু আমরা কেন, আমাদের আত্মীয়স্বজন, খুকুর সহপাঠী ও সহপাঠিনী এবং অধ্যাপকরা গর্ব বোধ করেছেন। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, খুকু আজকের ভারতবর্ষে খুব একটা দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন নয়—মেয়েরা নতুন স্বাধীনতার উৎসাহে অথবা নিজেদের নিষ্ঠায় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের মুখে চুনকালি দিচ্ছে। তারা বহু বিষয়ে প্রথম হচ্ছে—ফার্স্ট ক্লাশের তালিকায় ছেলেরা এখন মেয়েদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। এবং এতে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি না। বরং আমাদের মেয়ে, ভাগ্নী বা বোনদের এই কৃতিত্বে খুশী হচ্ছি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন লেডি ডাক্তার দর্শনীয় বস্তু ছিলো—এখন এমন অবস্থা হচ্ছে যে মেডিক্যাল কলেজে খুব শিগগিরি পুরুষ ছাত্রই দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠবে! শুধু হাসপাতাল কেন? আদালতেও মেয়েরা ঢুকে পড়ছে। মার্চেন্ট অফ ভেনিসের পোর্সিয়া আর গল্প নয়—আমার এক দিদি হাইকোর্টে বেশ ভাল পসার করেছেন। দিদির কাছেই আধ-ডজন মেয়ে উকিল শিক্ষানবিসী করছে—তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা মেয়েদের পেশায় বিশ্বাস করে। পেশায় নজর দিলে বিবাহিত জীবন যে বেনো জলে ভেসে যাবে তা মোটেই মনে করে না।"

হেলেন বললো, "আপনাকে উদাহরণ দিতে হবে না। আপনাদের সেরা উদাহরণ, এতো বড়ো দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে একজন মেয়েকে স্বাভাবিকভাবে বসাতে পেরেছেন, অথচ তা নিয়ে কেউ নাচানাচি করে না। আপনারা যে জাপানীদের মত 'ইকনমিক অ্যানিম্যাল' বা অর্থনৈতিক জন্তু নন; ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রবল হলে আপনারা এই নারী স্বাধীনতার ফলাও বিজ্ঞাপন করে পর্যটকদের কাছে থেকে কোটি কোটি ডলার তুলতে পারতেন। এর জন্যে আমি অবশ্য একটুও উদ্বিগ্ন নই—কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যে কে কত মুদ্রা আহরণ করলো তা দিয়ে যাঁরা জাতের বিচার করেন আমি তাঁদের খুব বিচক্ষণ লোক মনে করি না। জাপানীদের থেকে আপনারা যে অনেক বড়ো জাত তা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না।"

"হেলেন, তুমি একটু হাসো। তোমার মোহিনীমায়াজাল মামার ওপর একটু বিস্তার করো।" সুচরিতা এবার ফোড়ন দিলো।

"তোমার চোখের সামনে তোমার মামার ওপর মায়াজাল বিস্তার করলে তোমার মামীমার হয়ে তুমি আমার মাথায় লাঠি মারবে। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা বলে আমি আনন্দ পাই। এদেশে কোনো ছেলের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা বলা যায় না—কারণ স্ত্রী-জাতির কাছে এদেশের যুবসমাজ মস্তিষ্ক আশা করে না। যে-মেয়ের মাথায় ঘিলু আছে এদেশে তার সমূহ দুর্গতি।"

হেলেন প্রশ্ন করলো, "স্টেটসে মেয়েদের স্বাধীনতা নেই কথাটা আপনার মনঃপূত হচ্ছে না বুঝি।"

"শুনে যে একটু অবাক হচ্ছি, তা অস্বীকার করি কী করে?"

হেলেন হাসলো। ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো, "আমাদের এই ইউনিভার্সিটি টাউনে যে কয়েক হাজার মেয়ে দেখছেন এরা এখানে কেন এসেছে বলুন তো?"

"লেখাপড়া শেখার জন্যে, ডিগ্রী পাবার জন্যে।" আমি উত্তর দিই।

হেলেন এবার দুঃখের সঙ্গে বললো, "কথাটা যদি সত্যি হতো তাহলে আমার কিছু বলার থাকতো না। আমার কাছে জেনে যান, ডিগ্রী পাবার থেকেও একটা বড়ো উদ্দেশ্যে রয়েছে—সেটি হলো একটি মনের মতো স্বামী যোগাড় করা।"

আমি হেলেনের মুখের দিকে তাকালাম। হেলেন একটুও বিচলিত না হয়ে বললো, "আপনার ভাগ্নী তো অ্যানথ্রপলজিস্ট—মানবসমাজ নিয়ে ওর কাজ-কারবার—ওকে জিজ্ঞেস করুন।"

সুচরিতা বললো, "কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়, মামা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৃহদায়তন প্রজাপতি-অফিস। ভাল জামাই পাবার লোভে মেয়ের বাবারা কষ্ট করেও অনেক সময় মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান।"

হেলেন বললো, "আপনারা নিশ্চয় চ্যারিটাকে যখন কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলেন তখন বলে দেননি, একটি মনের মতো পুরুষমানুষকে পাকড়াও করা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অন্যতম কাজ হবে।"

আমি হেসে সুচরিতাকে জিজ্ঞেস করি, "সে রকম কোনো গোপন

নির্দেশ তোকে দেওয়া হয়েছিল নাকি? আমি তো জানি, তাজুদির মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে তুই পড়িস। তোকে তো তাজুদি বলেছিল, মনে রেখো কলেজটা হচ্ছে পড়বার জায়গা। যদি কোনো-রকম বদনাম কানে আসে তাহলে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।"

হেলেন বললো, "এখানে মেয়েদের মধ্যে গোপন ভোট নিন—ভাল বর চাই না ডিগ্রী চাই? দেখুন কী ফল হয়।"

সুচরিতা বললো, "মামা, তোমার মনে আছে, রাণু মাসিমা আমাদের বলতেন, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছো—তখন বি-এ হও এম-এ হও বেথুন-বিউটি হও আর নূরজাহান হও, অল ইকোয়াল-টু বর।"

হেলেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। "আমেরিকান মেয়েদের মনের কথাই তোমার মাসিমা চমৎকারভাবে বলেছেন। তুমি যাই হও, সব নির্ভর করছে বর কী রকম তার ওপর। তোমাদের সঙ্গে তফাৎ, বর খোঁজার দায়দায়িত্ব বাবা-মায়ের—এখানে বাবা-মা তোমাকে একটু-আধটু উপদেশ দিতে পারেন, সুযোগ থাকলে যে-সব জায়গায় ভাল বর পাবার সম্ভাবনা আছে সে রকম কোনো কলেজে পাঠাতে পারেন। কিন্তু তোমার মাছ তোমাকেই ছিপে তুলতে হবে—এবং এই গুরুতর দায়িত্ব পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকেই পালন করতে হবে। যে-রাঁধে তাকেই চুল বাঁধতে হবে—পড়তেও হবে এবং স্বামীও খুঁজতে হবে।"

বললাম, "কথাটা ছেলেদের সম্বন্ধেও খাটে। আমাদের দেশের ছেলেরা জানে—পড়াশোনা করে যে ভাল বউ পায় সে।"

হেলেন আমার ছড়াটা পছন্দ করলো। গালে হাত দিয়ে সে বললো, "আপনার বক্তব্যের উত্তর দিচ্ছি—কিন্তু তার আগে আপনাকে ছড়াটার জন্যে ধন্যবাদ জানাই।"

"ধন্যবাদ যখন জানালেন, তখন একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। জানিস, খুকু, কলকাতার এক নামকরা মেয়ে-কলেজের ছাত্রীরা একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিল। মেয়েরা দল বেঁধে খেলাধুলো করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু ছোকরা জুটে গেলো। কোনো ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে তারা পিকনিক করতে এসেছিল। ছোকরাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে মেয়েরা ওদের লিডার এক বয়স্থা

অধ্যাপিকার কাছে অভিযোগ জানালো। অধ্যাপিকা ছোকরাদের বেশ কিছু কথা শুনিয়ে দিলেন। তাঁর খবরদারিতে ছেলেদের রণে ভঙ্গ দিতে হলো। মেয়েরা তখন মিটমিট করে হাসছে। একজন ছোকরা তখন সেই দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঠিক হ্যায়, যাচ্ছি! সামনের বছরে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করি—তখন তোমাদেরই বাবারা গিয়ে আমাদের জন্যে পায়ে ধরবে।"

হাসিতে ফেটে পড়ে সুচরিতা জিজ্ঞেস করলো, "হেলেন, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো?"

"খুব পারছি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশকরা ছেলেদের তোমাদের দেশে কত দাম তা বোঝা যাচ্ছে।"

হেলেন এবার ব্যাগ থেকে চকোলেট বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "চ্যারিটা, নির্ভয়ে খাও—লো-ক্যালরি স্পেশাল চকোলেট, এতে ওজন বাড়বে না।"

চকোলেট চুষতে চুষতে সে বললো, "শংকর, আপনি যে কথা আগে বলেছিলেন তার উত্তর দিই। ছেলেদেরও ভাবী বউ নির্বাচনের চেষ্টা করতে হয় সত্যি কথা। কিন্তু ছেলেরা জানে—যতদিন খেলানো যায়, যতদিন বিয়ে নামক বস্তুটি পিছিয়ে রাখা যায়, ততদিনই মজা। আর মেয়েরা বিয়ের জন্যেই প্রেম করতে চায়—তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছেলেদের অনেক সুবিধে।"

আমি বললাম, "ম্যাক্সমূলর সম্বন্ধে এক গল্প শুনেছিলাম। যৌবনে এই জার্মান পণ্ডিত বহুদিন ধৈর্য ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এক ইংরেজ সুন্দরীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। পরে পরিণত বয়সে তিনি তাঁর ছেলেকে পত্নী সন্ধান সম্পর্কে লিখেছেন, এবার তুমি একটি বধুর জন্যে উঠে পড়ে লাগো…মনে রেখো, পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্যে তুমি যেমন পরিশ্রম করছো, সুন্দরীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যেও তোমাকে সেই নিষ্ঠা দেখাতে হবে।"

হেলেন বললো, "যুগটা বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দী এবং দেশটা নিশ্চয় আমেরিকা নয়। এখানকার পুরুষমানুষরা আজকাল বেশ হুঁশিয়ার, নিজের বাজার দর সম্পর্কে তারা বেশ খবরাখবর রাখে!"

খুকু বললো, "মেয়েরা সত্যিই এখানে খুব উচ্চাভিলাষী নয়। কেউই মাদাম কুরী বা ইন্দিরা গান্ধী হতে চায় না। তারা বলে, রক্ষে কর। প্রতিভাময়ী মেয়ে হলে কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না। আমাকে বেচারা আন্টি সুশানের মতো চিরকুমারী থাকতে হবে! সবাই আমার মাথার প্রশংসা করবে কিন্তু কেউ প্রেম করতে চাইবে না। তার থেকে আমি বরং সেক্রেটারী হবো—হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েট কার্তিকের মতো ছেলের সঙ্গে আংটি বদল করবো, বিয়ের পর তার আদরযত্ন করবো—দুই ছেলে ও এক মেয়ের মা হবো এবং ওদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবো। রক্ষে করো, আন্টি সুশানের মতো আইবুড়ো রয়ে গেলে—একলা অ্যাপার্টমেণ্টে থাকতে হবে, লোকে আড়ালে হাসাহাসি করবে।"

হেলেন জানালে, "চ্যারিটা যা বলছে তা মোটেই বাড়ানো নয়। ব্রেন থাকলেই মেয়েদের মুস্কিল—সেই রকম মেয়ের সঙ্গে ছেলেরা ডেট করতে চায় না। অনেক মেয়ে সেই জন্যে অঙ্ক নেয় না। অঙ্কে ভাল মেয়েদের কাছে ছেলেরা ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। আমার এক বান্ধবী ইংরিজি কমপোজিসন পড়ে। বেচারা জানতো না, ডেটিং-এর দিনে সরল মনে ছেলে-বন্ধুকে নিজের সাবজেক্ট বলে বসেছে। তারপর থেকে ছেলেটার খবর নেই। চিঠি দেবে বলেছিল, কিন্তু চিঠি আসে না। খবর নিয়ে জানলো—ইংরেজী সাহিত্য পড়লেও বা কথা ছিল, ইংরিজী কমপোজিসন পড়া মেয়েকে প্রেমপত্র লেখা নিরাপদ নয়—হয়তো ডজনখানেক বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল এবং প্রয়োগ ভুল বার করে মনে-মনে হাসবে। কোনো পুরুষমানুষই মেয়েদের কাছে ছোট হতে চায় না।"

"তারপর?" আমি প্রশ্ন করি।

"বান্ধবী ঠেকে শিখলো। তারপর ডেটিং-এ ছেলে-বন্ধুকে বলে, ইংরিজী সাহিত্য পড়ি। প্রেম একটু জমে উঠতে আর এক বান্ধবীর পরামর্শ মতো মোক্ষম চাল দিলো। প্রেমপত্র লিখলো একখানা, যার মধ্যে ইচ্ছে করে তিনটে-চারটে বানান ভুল হলো। পরের ডেটিং-এ বয় ফ্রেণ্ড বললো, হনি তোমার চিঠি পেলাম। চিঠিটা বুকে করে রেখেছি। কিন্তু তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলছি, তোমাকে বানান সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে, হাজার হোক ইংরিজী সাহিত্য পড়ছো তুমি। বান্ধবী অভিনয়

করলো—লজ্জায় যেন তার কান লাল হয়ে উঠলো। বয়-ফ্রেণ্ড তারপর চিঠিটা বার করলো। দেখা গেলো চারটে ভুলের মধ্যে মাত্র দুটো ধরতে পেরেছে সে। তারপর ছোকরা খুব উপদেশ দিয়ে বান্ধবীকে লম্বা চিঠি লিখেছিল। সে চিঠি আমি দেখেছি—যেমন বিশ্রী হাতের লেখা, তেমনি অজস্র বানান ভুল। বান্ধবী সব বুঝছে, কিন্তু ছেলেটি পাত্র হিসাবে খারাপ নয়—এমন বর হাতছাড়া করা যায় না। ওরা বিয়ে করে ফেলেছে। সামনের উইন্টারে ওরা প্রথম সন্তান আশা করছে।"

আমি বললাম, "আমাদের দেশে বিয়ের বাজারে পয়সা এবং পাত্রের রোজগার প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণী পাওয়া মেয়ের স্বামী নির্বাচনে অধ্যাপক থেকে বার্মিংহাম ফেরৎ কারিগরের কদর বেশী। পাত্রের চার অঙ্কের মাইনে হলে, সুন্দরীর মধ্যবিত্ত পিতামাতা সর্বপ্রকার শিক্ষাগত দোষ ক্ষমা করতে রাজী আছেন!"

হেলেন বললেন "সম্বন্ধ-করা বিয়েতে এসব চলতে পারে—কিন্তু আমরা ভাবি, একমাত্র অসভ্য বন্যরা পরস্পরকে না জেনে বিয়ে করে। আপনি ভুলে যাবেন না, মিস মেয়ো যিনি মাদার ইণ্ডিয়া বইতে আপনাদের দেশ সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়েছেন তিনি আমেরিকান ছিলেন।"

খুকু বললো, "মামা, তুমি হেলেনের কথাগুলো মন দিয়ে শোনো—তোমার কাজে লাগবে।"

হেলেন বললো, "আমি যা বলছি সে সম্বন্ধে এনথ্রপলজিস্টরা কিছু কিছু রিপোর্ট তৈরি করেছেন—সেখানেও একই কথা পাবেন। আমার কথাই ধরুন। যখন হাই-ইস্কুলে পড়ি তখন বাবা মা দাদা সবাই চায় আমি যেন পরীক্ষায় ভাল করি, না হলে নামকরা কলেজে ভর্তি হতে পারবো না। এদিকে বলছে পড়ো পড়ো। আর একদিকে আমাদের পাড়ার একটি রাঙা পলাশ ফুলের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ : জেন কী সুন্দর-ভাবে সাজে! জামা-কাপড়ে কী রুচি! ছেলেমহলে জেনের কী জনপ্রিয়তা! আমি কি নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আর একটু সাবধানী হতে পারি না? অর্থাৎ ওঁরা চান, আমি একই সঙ্গে ইভ কুরি এবং এলিজাবেথ টেলর হই।"

"এটা বেশ ভালই বলেছেন হেলেন।"

হেলেন বললো, "এই তো শুরু। আরও আছে। মাদাম কুরি ও লিজ টেলরের টাগ-অফ-ওয়ার এখনও চলছে। কাকা সাধারণতঃ রবিবারের সকালে লং ডিসটেন্স ফোনে কথা বলেন। কাকা এখান থেকে হাজার মাইল দূরে থাকেন। টেলিফোনে কাকার প্রথম প্রশ্ন, শনিবার রাত্রে কোনো ছেলের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম তো? আমার উত্তর শুনে কাকার কী রাগ। 'ছোট্ট সোনা, তুমি আর খুকুটি নেই—তোমার যৌবন এসেছে। তুমি এ কি বোকামি করছো—কলেজের দুটো প্রশ্নের উত্তর লেখবার জন্যে শনিবার ডরমিটরিতে পড়ে থাকলে! না সোনা, আর যেন কখনও এমন না শুনি।"

হেলেন বললো, "তারপরেই বাবার ফোন। বাবা আমাকে পড়া-শোনায় খুব উৎসাহ দেন। 'খুকু, প্রত্যেক পেপারে 'এ' পেতে হবে। কলেজ আর ক'দিন? ছেলেদের সঙ্গে পার্টিতে যাবার সময় তো সারা জীবনই পাবে'।"

মার হাতে ফোন দিয়ে বাবা দাড়ি কামাতে চলে যান। মা বলেন "খুকু, তোমার বাবা সংসারের কিছু বোঝে না। মেয়েদের সমস্যা কোনো ছেলেরই মাথায় ঢোকে না। পড়াশোনায় তুমি ফেল করো তা আমি চাই না। কিন্তু এমনভাবে ডুবে থেকো না যাতে মনের মতো ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময় পাওয়া যায় না। তোমার কাছে কিছুই চেপে রাখি না, সুতরাং শোনো—পড়াশোনায় অতি ভাল হলে তখন মনে হবে কোনো ছেলেই তোমার যোগ্য নয়। প্রত্যেক মেয়ে চায়, স্বামী তার থেকে গুণে একটু বড়ো হোক। এখনও সময় আছে। ছেলেদের কাছে নিজেকে ইন্টারেষ্টিং করে তোলো। ছেলেদের সঙ্গে যখন মিশবে তখন খুব আমুদে ভাব দেখাবে, মুখে যেন সব সময় হাসি ফুটে থাকে।"

হেলেন বলে চললো, "আমার মাসিমা চান আমি নিজের বিষয়ে নামকরা পণ্ডিত হই। রবিবারের দুপুরে লাঞ্চের আগে ওঁকে ফোন করতে হয়। মাসিমা বলেন, হেলেন তোমাকে ফোন করে আমি বিরক্ত করতে চাই না। তোমার যখন সময় হবে, তুমি আমাকে কলেক্ট কল করবে।"

সুচরিতা বললো, "কলেক্ট কল জানো তো মামা? এদেশে তুমি ট্রাংক-ফোন করতে পারো, যার টাকা তোমাকে দিতে হবে না। যাকে

ফোন করছো, সে দেবে। ফোন তুলে নিজের নাম জানাতে হয় এবং বলতে হয়, অমুককে আমি কলেক্ট কল করতে চাই। অপারেটর সঙ্গে-সঙ্গে অপরপক্ষকে জিজ্ঞেস করবে, অমুক জায়গার অমুক আপনাকে কলেক্ট কলে ফোন করতে চান। তিনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে কথা শুরু হয়।"

হেলেন বললো, "মাসিমা চান না ওঁকে ফোন করতে গিয়ে আমার পয়সা খরচ হয়, তাই এই ব্যবস্থা। মাসিমা আমার ফোন পেলেই বলেন, বাছা মেয়েদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সময় এসেছে। ডবল-বেড-এর মোহে নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট কোরো না। নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর ইচ্ছে হলে বিয়ে করে বাচ্চাদের ডায়াপার পরিষ্কার কোরো।"

"এর মধ্যে পথ খুঁজে বার করা সত্যি শক্ত", হেলেনের সমস্যা আমি আন্দাজ করতে পারছি।

হেলেনের উত্তর : "যে-সব মেয়ে একেবারে সাধারণ—জোড়া-বিছানাই যাদের লক্ষ্য তাদের তেমন অসুবিধে হয় না। কিন্তু মুস্কিল হয় তাদেরই যাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে—চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে।"

"মুস্কিলটা কিসের ?" আমি প্রশ্ন করি।

"প্রথম মুস্কিল, তারা আকৃষ্ট হয় এমন ছেলের দিকে যারা বিদ্যাবুদ্ধিতে তাদের থেকেও ভাল। কিন্তু এই ধরণের ছেলেরা বিছানায় শুয়ে ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা করতে ভয় পায়—তাই তাদের নজর সেক্রেটারিদের দিকে। আর সাধারণ ছেলেরা ডেটিং-এর সময় মোরগের মতো মাথা উঁচু রাখতে চায়—পুরুষদের ওইটাই নাকি অধিকার। তাই মেয়েদের বর পেতে হলে বোকা সাজতে হয়। ইউনিভার্সিটির মেয়েদের মধ্যে চ্যারিটার অধ্যাপক কিছুদিন আগে এক গোপন সমীক্ষা করেছিলেন। দেখা গেলো, শতকরা, চল্লিশজন মেয়ে স্বীকার করেছে, বয়ফ্রেণ্ডের মন জয় করবার জন্যে তারা কোনো-না-কোনো সময়ে বোকা সেজেছে। পরীক্ষায় খুব ভাল নম্বর পেয়েও জানাতে সাহস করেনি; কোনো সময় কিছু জেনেও বলেছে—জন, এটা একটু বুঝিয়ে দাও না; কিংবা তর্কের সময় ইচ্ছে করে হার মেনেছে। তর্কে জিতলে আসল জায়গায় হার হতে পারে এই ভয়।"

রাত্রের অন্ধকারে নদীর নির্জন তীরে বসে মার্কিন-নন্দিনী হেলেন সেদিন নিজের দুঃখের কথা বলেছিল। হেলেন প্রথমে নিজের স্বকীয়তা

ছাড়তে চায়নি। নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে, ছেলেদের তর্কে হারিয়ে দিয়েছে, পরীক্ষায় একের পর এক 'এ' পেয়েছে। মেয়েরা তাকে মাথায় করে নেচেছে, তাকে খাতির করেছে। ছেলেরা কিন্তু তাকে দূর থেকে দেখেছে—ডেটিং-এ বেচারা হেলেনের দাম কমে গিয়েছে। দেখতে অসুন্দরী না হলেও ছেলেরা তার জন্য মাথা ঘামায়নি। "কারণ আমি চিয়ারলিডার নই, 'গুপ্ত' চোখে পুরুষমানুষের দিকে তাকিয়ে 'বেবি টক' করতে পারি না।" ছেলেরা একেবারে সাধারণ মেয়েদের প্রেম গ্রহণ করেছে, বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। দেখতে-দেখতে হেলেনের বেশীর ভাগ সহপাঠিনীরই একটা হিল্লে হয়ে গিয়েছে।

মার্কিন ক্যামপাসে যে-মেয়ের কোনো স্টেডি বয় ফ্রেণ্ড হচ্ছে না—তার অবস্থা শোচনীয়। মেয়ের বাবা-মা, বান্ধবী, দাদা, কাকা সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রশ্ন একটাই—গত শনিবার কী হলো? শনিবারটাই যেন জীবনের একমাত্র দিন—মিষ্টি সম্ভাবনার একমাত্র রাত্রি। এই শনিবার রাত্রেই কত জীবনের ওপর ভাগ্যের দেবতা আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। মেয়েরা উন্মুখ হয়ে থাকে, কখন ডিনার এবং নাচের শেষে একান্তে নিয়ে গিয়ে ছেলেবন্ধু বলবে, "হনি, তোমার সঙ্গে কথা ছিল।" হাতদুটি ধরে খেলা করতে-করতে পুরুষ মানুষটি সেই আশ্চর্য মিষ্টি কথাগুলো বলবে—যার জন্যে এতো উদ্বেগ এতো উৎকণ্ঠা—যার নাম "প্রপোজাল"। যুগ-যুগান্ত ধরে এই "প্রস্তাব" করবার অধিকার পুরুষরা উপভোগ করেছে—মেয়েরা শুধু গ্রহণ করতে পারে, বড়জোর প্রত্যাখান করতে পারে, কিন্তু মুখ খুলে কিছু বলবার স্বাধীনতা নেই, বড়জোর ভাবে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে পারে, সে কাউকে চায়।

হেলেন বললো, "জানেন, প্রথম কিছুদিন তবু সহ্য করা যায়। তখন সবাই সবার সঙ্গে ডেট করতে ব্যস্ত—সবাই ঘুরে-ঘুরে মধুপান করছে প্রজাপতির মতো। তখন কিছুটা স্বাধীনতা থাকে। তারপর একে একে ছেলেরা কারুর সঙ্গে স্টেডি হতে শুরু করে—প্রিয়বান্ধবী তখন জাল গুটোবার জন্যে বলে 'হনি' আমি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি আর কারুর সঙ্গে ডেট করবো না। তুমিও তাই তো?' মেয়েরা ছেলেদের সরিয়ে নিতে চায়—হারাবার ঝুঁকি নিতে চায় না। কোনো মেয়ে যখন

দেখে একে-একে সব বান্ধবীই প্রাণেশ্বর যোগাড় করে ফেলেছে, তখন নিঃসঙ্গতায় তার মন ভরে ওঠে। শনিবারটা ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে—কত জনকে আর মিথ্যে বলা যায়, কেন শনিবার সে বেরোচ্ছে না।"

ছেলেদেরও এমন অবস্থা হতে পারে। প্রেমের প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ হেরে যায়। কিন্তু তাদের তবু আশা থাকে। তারা অপেক্ষা করতে পারে নতুন সেসনের জন্যে। গ্রীষ্মের শেষে ক্যামপাসে প্রাণের বসন্ত ফিরে আসে। নতুন বছরের ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজির হয়। সিনিয়র ছেলেদের অধিকার আছে, জুনিয়র মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং করার। যারা এখনও "মুক্ত" আছে, তারা নতুন মেয়েদের মধ্যে ভাবী স্ত্রী খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সিনিয়র মেয়েদের সেই স্বাধীনতা নেই। জুনিয়র ছেলেদের সঙ্গে ডেট করা এক ধরণের অশ্লীলতা। কেউ তা বরদাস্ত করবে না। নিজের বান্ধবীরা পর্যন্ত লুকিয়ে হাসবে—"অমুকের হলো কি! শেষ পর্যন্ত একটা 'গ্রীন কিড'-এর সঙ্গে ডেটে বেরুচ্ছে! দেখেছ ওই ছোকরাকে? ওর সঙ্গে একলা থাকলে আমার তো বাৎসল্য রস এসে পড়বে।"

এমনি করেই প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নীরবে করুণ নাটকের অভিনয় হয়—পরাজয়ের অভিশাপ নেমে আসে পাঁচটি ছ'টি যুবতী ছাত্রীর ওপর যারা তাদের অনাগত নিঃসঙ্গ দিনগুলোর কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় খুব ভাল করেও তারা হেরে যায়। তাদের কোনো দাম থাকে না—বন্ধুমহলে নয়, পরিবারে নয়, এমনকি, নিজের কাছেও নয়।

আর বছরের শুরু থেকেই এই অনাগত পরাজয়ের আশঙ্কা জেগে থাকে প্রতিটি অনূঢ়া ছাত্রীর মনে—সবাই ভাবে, আমার ভাগ্যে এই অবস্থা হবে না তো?

এই আশঙ্কায় সব ছাত্রীই স্বামী নির্বাচনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন শুরু হয় বুদ্ধি ও প্রেমের প্রতিযোগিতা। ভাবী স্বামী চাইছে দেরী করতে, আর পাত্রী চাইছে ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ফেলতে। জীবন কে না নিরাপত্তা চায় বলুন?

খুকু বললো, "মামা, এর ফলে বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রী লেখাপড়া শেষ করতে পারে না। বাবা-মায়ের কাছে সাহায্য নিতে তারা বিবাহিত জীবন-যাপন করতে চায়

না। তাই সাধারণ কাজকর্ম জুটিয়ে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয় এবং বিয়ে করে। স্বামী তখনও তো ছাত্র থেকে যায়। মেয়েরা চাকরি করে সংসারের খরচ চালায়, স্বামীকে রোজ কলেজে পাঠায় এবং অপেক্ষা করে কবে স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে তাকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবে।"

হেলেন বললো, "মার্কিনী-পুরুষরা অন্যদিকে যতই তেজী হোক স্ত্রীর খরচে পড়াশোনা করতে তারা লজ্জা পায় না। এমনও জানি, যে-স্বামীর ভবিষ্যতের জন্যে স্ত্রী নিজের লেখাপড়া বিসর্জন দিয়েছে, তিন বছর খরচ চালিয়েছে, তিন বছর পরে তিনিই তালাক দিয়ে নতুন গৃহিণী নির্বাচন করেছেন।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুকু বললো, "আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি—এবার ফেরা যাক।"

হেলেন বললো, "আপনার সঙ্গে গল্প করে বেশ আনন্দ পাওয়া গেলো। আপনি বুঝতে পারছেন, সভ্যতা হিসেবে আমরা যতখানি এগিয়ে আছি বলে ড্রাম বাজাই ততখানি আমরা এগোতে পারিনি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, সাধারণ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বললে তারা মোটেই আশ্চর্য হয় না—তারা ভাবে এইটাই স্বাভাবিক।"

সুচরিতা বললো, "হেলেন, তুমি বাজে কথা ছাড়ো। তোমার হাত দেখেছি আমি, এই বছরেই বিয়ের ফুল ফুটবে। ছাত্রদের টপকে কোনো ছোকরা অধ্যাপকই তোমার চরণে হৃদয় নিবেদন করবার জন্যে ছটফট করবে।"

"ডোণ্ট বি কিডিং—কেন রসিকতা করছো চ্যারিটা? আমেরিকান পুরুষমানুষদের কাছে আকর্ষণীয় হবার পক্ষে আমি একটু বেশী ইনটেলেক-চুয়াল। আমি 'বেবি-টক' করতে পারি না।"

হেলেনের কণ্ঠে কেমন রোদনের সুর বেজে উঠলো। পরমুহূর্তে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠে সে বললো' "তোমার মামাকে অনেক জ্বালাতন করেছি আমরা—তাঁকে এবার একটু শান্তি দেওয়া যাক্।"

"হেলেন তোমার কাছে আজ অনেক নতুন কথা শুনলাম। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা বলো তো, প্রেমের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো

গুণগুলোর বেশী দাম ? আমাদের দেশে তো মেয়েদের গায়ের রং এবং রূপ, ছেলেদের রোজগার এবং মেয়ের বাবার টাকা, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বংশ পরিচয়।"

হেলেন বললো, "আমরা বলে বেড়াই, প্রজাপতি প্রতিযোগিতায় যুবক যুবতীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। কথাটা মোটেই সত্যি নয়। ছেলেদের কাছে রূপটাই এক নম্বর—সুন্দরী মেয়েদের বেজায় কদর। মেয়ের বাবার টাকা খুব বড়ো কথা নয়, যদি না তিনি মিলিয়নেয়ার হন। আর মেয়েদের প্রথম নজর খেলোয়াড়দের দিকে। ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করবার জন্যে সবাই পাগল। তারপর ভাবী-স্বামীর ভবিষ্যৎ—কেমন রোজগার করবে মনে হয় ? ছাত্র কেমন ? বাড়ির অবস্থা কেমন ?"

আমি কোনো কথা বললাম না। হেলেন বললো, "এদেশের বিবাহিত জীবন কিসের ওপর দাঁড়িয়েথাকে তা আপনার জানা দরকার। প্রথম, স্বামী এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। দ্বিতীয়, পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগের কামনা। যেটা আপনাদের দেশে সবে শুরু হয়েছে, শুনলাম। স্বামী এবং স্ত্রী একত্রে বেড়াতে যান, সিনেমায় যান, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেন, এবং জীবনের সমস্ত আনন্দ একত্রই উপভোগ করেন। তিন নম্বর অবশ্যই যৌন সুখ—এর গুরুত্ব ছোট করা যায় না। তারপর স্বামীর রোজগার। আয় বেশী হলে বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম। নিজস্ব বাড়ী থাকলে বিবাহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ভাড়াটিয়ারা বেশী বিবাহ-বিচ্ছেদ করে। এবং স্বামীর শিক্ষা—স্বামী অপেক্ষাকৃত বেশী শিক্ষিত হলে বিচ্ছেদ কম ; স্ত্রী বেশী শিক্ষিতা হলে ডাইভোর্স বেশী।"

হেলেন ও খুকু এবার একসঙ্গে হেসে উঠলো। নির্জন রাস্তায় দুটো মেয়ের হাসি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়লো। আমরা জোর কদমে এগিয়ে চললাম। এমন সময় পিছনে একটা গাড়ি এসে থামলো।

"হাই ! কোক্"—এয়ারপোর্টে যাওয়া বিল-এর গলা। বিল আমাদের সবাইকে গাড়িতে তুলে নিলো।

"কোনো রাত্রের এ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিলে নাকি ?" সুচরিতা জিজ্ঞেস করলো।

"মোটেই না। ল্যাবের কাজকর্ম সেরে ভাবলাম মামাকে একটু জ্বালাতন করা যাক। ওমা, টেলিফোনে শুনলাম নো পাত্তা! ভাবলাম, সাহিত্যিক মামার এই সন্দেহজনক অনুপস্থিতির সংবাদটা কোরুকে দেওয়া যাক্। হা ঈশ্বর, ভাগ্নীও অনুপস্থিত। গোপন সংবাদ পাওয়া গেলো, হেলেনও সঙ্গে বেরিয়েছে। তখন আন্দাজ করলাম, মামাকে এরা একলা চরে খেতে দেবে না। নিশ্চয় নদীর ধারে বসে ওরা মামাকে নৈশ প্রকৃতি উপভোগ করতে বাধ্য করাচ্ছে। তাই এদিকে খোঁজ করতে আসছিলাম। পথেই তোমরা ধরা পড়ে গেলে।"

খুকু কি আমার সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করছে? বুঝতে পারছি না।

বিল কলিনসের গাড়ি আমার হোটেলের সামনে এসে পড়েছে। আমি নেমে পড়লাম। হাত দুটো বাড়িয়ে হেলেন আমার সঙ্গে করমর্দন করলো। "সামনের বছর আমি নিশ্চয় ইণ্ডিয়াতে যাচ্ছি। তখন চিনতে পারবেন তো?" ওর উষ্ণ স্পর্শে বুঝলাম, হেলেন আমাদের সান্নিধ্যে আনন্দিত হয়েছে।

আমি বললাম, "আমরা তোমাকে আমাদের দেশে আশা করবো হেলেন।"

গাড়ির মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে ছোকরা বললো, "তাহলে মামা, গুড নাইট ফ্রম বিল এণ্ড কোক।"

॥ ২ ॥

এই বিল ছোকরার মতিগতি আমার তেমন সুবিধেজনক মনে হচ্ছে না। এর সম্বন্ধে ডায়রিতে কি লেখা যায় তাই সকালে বসে ভাবছিলাম। দুটো ভয়—এই ডায়রি তাজুদির হাতে পড়তে পারে। দ্বিতীয় ভয় আমার মৃত্যুর পরে। বিল সম্বন্ধে যদি কিছু তীব্র মন্তব্য করি—এবং পারিবারিক মতামতের বিরুদ্ধে স্নেহের ভাগ্নীটি যদি শেষ পর্যন্ত মিসেস কলিন্স হয়—তখন মামার এই ডায়রি তার হাতে পড়লে আমার ওপর খুকুর কোনো শ্রদ্ধা থাকবে না—হাজার হোক স্বামী ইজ্ স্বামী।

এমন সময় ঘরের বেল বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই খুকু ঘরে ঢুকলো, এই ভোরবেলাতেই সে ফিটফাট—স্নান সেরে নিয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি ডায়রিটা বন্ধ করে ফেললাম। খুকু বললো, "মামা, তুমি এখনও রেডি নয় ?"

"মানে দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি। স্নানের ব্যাপারে সাহেবদের কায়দা ধরেছি—বাড়িতে ফিরে বিকেল বেলায় বেদিং।"

খুকু বললো, "এখানে সবাই তাই করে। কিন্তু আমার পুরনো অভ্যাস রয়ে গিয়েছে—বেরুবার আগে স্নান, ফিরবার পরে নয়।"

আমি বললাম, "কালকে ফিরে গিয়ে তুই একটা টেলিফোন করলি না। আমার ভয় হলো, অত রাত্রে হোস্টেলে ঢুকতে পেলি কি না।"

খুকু বললো, "আমাদের কাছে চাবি থাকে মামা। আমি ভাবলাম, সারাদিন ঘুরে ঘুরে তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো—কলকাতায় কত তাড়াতাড়ি তুমি ঘুমিয়ে পড়ো তা তো জানি!"

আমি বললাম, "সকাল-সকাল উঠে পড়ছি এখানে। ভোরবেলায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বড়ো ভাল লাগলো। এত সুন্দর জায়গায় মানুষের এমনিই পড়তে ইচ্ছে করবে—একেই তো বলে তপোবন।"

"মামা, আজকে ছুটির দিন, তাই লম্বা প্রোগ্রাম। এখনই বেরিয়ে পড়বো আমরা। প্রথমে যাবো আমার লোকাল গার্জেনের বাড়ি। ওখানে তোমার ও আমার লাঞ্চে নেমন্তন্ন। তার পর বিকেলে চা, চিঁড়ে বৌদির বাড়ি। ওঁরা ডিনারে তোমাকে ডাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হইনি, কারণ আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে। সেখানেও তোমার ভাল লাগবে। তোমার হোটেলের ঘরটা যাবার সময় ছেড়ে দিয়ে যাবো।"

খুকু নিজেই একটা ছোট্ট গাড়ি কিনেছে। পুরনো ফোক্সওয়াগেন। যেমন জার্মান জাত, তেমনি এই ফোক্সওয়াগেন গাড়ি—ভীষণ নিষ্ঠাপরায়ণ, কিছুতেই খারাপ হয় না। আমেরিকান মোটরসম্রাটদের ঘুম কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করেছে এই ক্ষুদে ফোক্সওয়াগেন।

খুকু অবলীলাক্রমে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। বললাম, "তোর এই রকম একটা ছবি নেওয়া দরকার। ফটো না দেখলে তাজুদি বিশ্বাস করবেন না, তুই এইরকম পাকা ড্রাইভার হয়েছিস।"

খুকু বললো, "পাকে পড়ে ড্রাইভার হয়েছি। রিসার্চের কাজে কত জায়গায় ঘুরতে হয়, রাত-বিরেতে ফিরতে হয়—গাড়ি ছাড়া চলে না।"

"তোর এ-দেশে ক'বছর হলো?" হিসেব করতে বসি।

"দু' বছরে ডিগ্রি নিয়েছি। দেড় বছর ডক্টরেটের থীসিস এর কাজ চলছে।"

"কতদিন লাগবে তোর ডক্টরেট হতে? তাজুদি তোর বিয়ের কথা ভেবে-ভেবে রোগা হয়ে যাচ্ছেন।"

সুচরিতা হেসে ফেললো। "হেলেন গত রাত্রে যে ইণ্ডিয়ার নতুন সমাজকে এতো প্রশংসা করলো তা সব বৃথা!"

"বিয়ে না হয় না-ই করলি। দেশে ফিরবি কবে বল?"

"ফিরলেই তো আর একখানা রেশন কার্ড বাড়বে—ইণ্ডিয়া গভরমেণ্টকে আর একটা লোক খাওয়াবার দায়িত্ব নিতে হবে।"

"রসিকতা পরে করিস খুকু", আমি আবেদন করি।

"আসলে মামা, কবে যে ডক্টরেট পাবো তা কেউ বলতে পারে না—দুই থেকে দুশো বছর পর্যন্ত লাগতে পারে। আর যে-লোকের আণ্ডারে কাজ করি– অদ্ভুত মহিলা। ডক্টর মিস শিপেন। এঁর কথা পরে তোমাকে বলবো।"

আমাদের গাড়ি হাই-ওয়ে ধরে হু হু করে এগিয়ে চলেছে। ভোরের মিষ্টি রোদ্দুর এসে পড়েছে গাড়ির ওপর। দু'পাশে ভুট্টার ক্ষেত—যত দূর দৃষ্টি যায় সোনা হয়ে রয়েছে।

খুকু এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ছোট্ট একটা কফির দোকানে ঢুকে পড়লো। আমাকে কফি খেতে বললো খুকু!

"তোর কফি।" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এখন নয় মামা। সকাল থেকেই উপোস চলছে। আজ আমার দুটো লোকাল ভাইকে ফোঁটা দেবো।"

খুকু দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনলো। তারপর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম।

খুকু ড্রাইভ করতে করতে বললো, "আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় গার্জেন সিস্টেমটা আমার খুব ভাল লাগে।"

"ব্যাপারটা কি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"প্রত্যেক বিদেশী ছাত্রকে এরা একটা স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে যোগ করে দেয়। এই সব পরিবার যেন এক-একটি ছেলে-মেয়েকে দত্তক নিয়েছে। উদ্দেশ্য, এত দূরে কেউ যেন নিঃসঙ্গ বোধ না করে। সবাই যেন নিজের বাবা-মা ভাই-বোনের কাছ থেকে দূরে থেকেও আত্মীয় সান্নিধ্যের সুফল পায়।

"জানো মামা, আমার প্রথম রবিবারের কথা মনে পড়ছে। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস ফিশার আমাকে হোস্টেল থেকে নিতে এলেন। আমাকে ওঁরা আগে টেলিফোন করে দিয়েছিলেন—আমি নিচে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন নতুন এসেছি—বিদেশে মন তেমন বসেনি। মিসেস ফিশারের বয়স চল্লিশের মতো হবে। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আদর করে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, চলো তোমার বাড়ি দেখবে চলো।"

"তোর বাড়ি।"

"হ্যাঁ, ওঁরা চান আমি যেন ওঁদের বাড়িকে আমার নিজের বাড়ি মনে করি।"

"এর জন্যে ওঁরা কি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাকা-কড়ি পান ?"

"মোটেই না। এঁরা মনে করেন প্রত্যেক মানুষের কিছু সামাজিক কর্তব্য আছে—তাই ওঁরা স্বেচ্ছায় এই সব দায়িত্ব নেন। এই ধরনের লোকের কখনও অভাব হয় না এই আজব দেশে। কত লোক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গভরমেণ্টকে চিঠি লেখে—আমাদের একটি বিদেশী ছাত্র বা ছাত্রী দেওয়া হোক। তাদের সঙ্গে মিলেমিশেই এঁদের আনন্দ। আমাদের কলকাতায় তো কত বাইরের ছেলে আছে—শুনেছো কোনো দিন কাউকে আমরা ভালবেসে বাড়িতে নিয়ে এসেছি।"

খুকু বললো, "তুমি বিশ্বাস করবে মামা ? আমাকে বাড়িতে আনবেন বলে ওঁরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দু'খানা বই কিনে ফেলেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের সমাজ সম্বন্ধে জানবার জন্যে মিসেস ফিশার লাইব্রেরি থেকেও বই আনিয়েছেন। ওঁদের চারটি ছেলেমেয়ে—সংসারে কেউ সাহায্য করবার নেই। মিসেস ফিশারকেই বিরাট সংসার সামলাতে হয়। ওঁর স্বামী এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে এক ইলেকট্রনিক কোম্পানিতে পদস্থ ইঞ্জিনীয়ার।"

"আমি এঁদের সঙ্গে ছুটির দিনটা কাটাই। খুব ভালো লাগে। ওঁরা কখনও বাইরে গেলে আমাকে নিয়ে যান। প্রত্যেক সপ্তাহে টেলিফোনে খোঁজ-খবর নেন এবং আমার অসুখ-বিসুখ হলে ওঁরা যে কি রকম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তা না দেখলে বিশ্বাস করবে না। বিদেশে এরকম মানুষ পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা মামা। আমেরিকার সাধারণ মানুষদের স্নেহ প্রীতির এই দিকটা দেখলে জাতটাকে তুমি না ভালবেসে পারবে না।"

আমাদের গাড়িটা এবার বড়ো রাস্তা ছেড়ে একটা সরু রাস্তা ধরে চলেছে। দু'ধারে গাছে ঢাকা, ছবির মতো ছোট ছোট বাড়ি। কোথাও কোনো শব্দ নেই—মাঝে-মাঝে দু'একটা নাম-না-জানা পাখির ডাক কানে আসছে। একটা বাড়ির লনে গৃহস্বামী আপন মনে মেসিন দিয়ে ঘাস কাটছেন। ছুটির দিনের সোনালী ঢিলেমি প্রকৃতির ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশ্ব প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে নিমন্ত্রণ না করে, অনেকদিন আগে এখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনা উচিত ছিল। আমরা আর একখানা আরণ্যক উপহার পেতাম।

আমরা এবার কাঁচা পথ ধরে চলেছি। গাড়ির চাকায় শুকনো পাতার ঘর্ষণে মিষ্টি মুচমুচে আওয়াজ হচ্ছে। খুকুর গাড়ি এবার একটা কাঠের বাড়ির সামনে থেমে গেলো। গাড়ি থেকে নেমে আমরা দরজা পর্যন্ত আসতেই—মজার একটা ব্যাপার হলো।

খুকু শুধু কলিং বেল টিপেছে—অমনি ভিতর থেকে কোকিলের ডাক শুরু হলো—কু-উ-উ কুউউ। ভিতরে গোটা কয়েক কোকিল যেন আমাদের অভ্যর্থনার জন্যেই বসন্তের পঞ্চম ধরেছে। দুটি তিনটি পুরুষ ও নারী কণ্ঠও যেন তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে মনে হলো।

আমি একটু অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু খুকুর মুখে হাসি। "দুষ্টু ছেলেদের কীর্তি—মজা দেখাচ্ছি।"

এবার দরজা খুলে গেলো। একটি বাচ্চা ছেলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও বলছে—কু-উ-উ, কুউউ।

খুকু ছেলেটাকে আদর করে বললো, "খুব দুষ্টু হয়েছো তোমরা।"

ছেলেটির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই—শুধু বলছে, কুউউ কুউউ।

খুকু বললো, মিস্টার ও মিসেস ফিশারকে আমি কাকা ও কাকিমা

বলি। ওঁরা আমাকে কুকু বলেন—খুকু উচ্চারণ করতে পারেন না। তাই আমার আমেরিকান ভাইবোনেরা কোকিল ডেকে মজা করে, আমাকে কখনও বলে কুকু বা কোকিল কখনও বলে ডিডি, দিদি কথাটা আসে না।

দিদি এবার গম্ভীরভাবে বললো, "এখনই একটা বিরাট বেড়াল ডেকে আনছি—কোকিল ডাক বেরিয়ে যাবে !"

এবার আরও একটি বালক এবং বালিকার আবির্ভাব। ছেলেটির বয়স বার তেরো, মেয়েটির পনেরোর মতো। তারা সবাই খিল খিল করে হেসে উঠলো। কিন্তু কোনো অদৃশ্য স্থান থেকে তখনও কয়েকটা কোকিল একসঙ্গে ডেকে চলেছে।

খুকু জিজ্ঞেস করলো, "বাবা-মা কোথায় ?"

ছোট ছেলেটি মিলিটারি কায়দায় হুকুম করলো, "অ্যাটেনশন !' তারপর মার্চ করতে-করতে বললো, "আমাকে ফলো করো।" অন্য ছেলেমেয়েরাও মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগলো। অপারগ হয়ে আমরাও মার্চে যোগ দিলাম।

সেনাপতির আদেশ মতো হলঘর পেরিয়ে আমরা বাঁয়ে ঘুরলাম, তারপর থামবার হুকুম হলো। বালকটি এবার আলিবাবা কায়দায় চিৎকার করলো, "চিচিং ফাঁক।" অমনি দরজা খুলে গেলো।

আবার হাসির হুল্লোড়। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন শাড়িপরা এক মার্কিন মহিলা—উনিই যে মিসেস ফিশার তা বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হলো না। পাশেই মিস্টার ফিশার, পাঞ্জাবী আর ধুতি পরে জবুথবু হয়ে পড়েছেন।

তাঁরাও এবার ছেলেদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। হাসি সামলে কর্তা গিন্নী এবার ভারতীয় প্রথায় হাত জোড় করে আমাকে স্বাগত জানালেন।

মিস্টার ফিশার বললেন, "ছেলেরা তোমাকে কোকিল-অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এক সপ্তাহ ধরে ষড়যন্ত্র করছে। ন্যাচারাল হিস্ট্রী মিউজিয়ম থেকে ওরা কোকিলের স্বর টেপ করে এনেছে, বাড়িতে সাতদিন ধরে কোকিল ডাকের রিহার্সাল চলেছে, আমাকেও মহড়ায় অংশ নিতে হয়েছে।"

"কান ঝালাপালা, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত," মিসেস ফিসার অভিযোগ করলেন।

"তোমরা যেমনি এসে পৌঁছলে, অমনি টেপ রেকর্ডার চালু হয়ে গেলো, আর সঙ্গে তিনটি মানুষ কোকিলের কণ্ঠ।"

এই সরল সদানন্দ পরিবারের ছেলেমানুষিটা সংক্রামক। আমিও হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে পড়লাম।

মিসেস ফিশার বললেন, "শুধু কি তাই, আমরা আজ ভারতীয় জামাকাপড়ে তোমাদের অভ্যর্থনা জানাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু ছেলেরা আমাদের বন্দী করে ঘরে ঢুকিয়ে রেখে গেলো। ডিডিকে তারা আগে রিসিভ করবে, তারপর আমরা।"

খুকু জানালো, "প্রত্যেকবার আমার জন্যে এরা নতুন কিছু মতলব ফাঁদবে। এদের মাথায় এত বুদ্ধি কি করে আসে ভগবান জানেন।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "আপনি আশা করি আমাদের এই ছেলেমানুষিতে কিছু মনে করছেন না। আমার ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে সব সময় হৈ হৈ করে, আমি কখনও আপত্তি করি না এই জন্যে যে, বড়ো হয়ে এরা হয়তো হাসাহাসির সময় পাবে না।"

মিসেস ফিশার এবার পরম স্নেহের সঙ্গে আমাদের সকলকে ওঁদের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ছোট ছোট ফ্রেমে সাতটা ছবি সাজানো রয়েছে। কর্তা গিন্নী দু'জন, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। এবং শেষে আমাদের খুকুও রয়েছে।

মিসেস ফিশার বললেন, "খুকুই তো আমাদের বড়ো মেয়ে। তাই ওর ছবিটা ওখানে রেখেছি। শুধু বড়ো মেয়ে নয়, আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে।"

ছোট ছেলেটা বললো, "ডিডি, এবার আমাদের ঘরে চলো।"

আমাদের সবাইকে ওদের অনুসরণ করতে হলো। সেখানেও মজা। দেওয়ালে বিরাট একটা কাগজে তাজমহলের ছবি আঁকা। আর পাশে মাথায় পাগড়ি পরা মহারাজবেশে ছোকরার নিজের ছবি।

মিসেস ফিশার বললেন, "কালকে দুইভাই মিলে এঁকেছে—তোমাকে দেখাবে বলে।"

বড়ো ছেলে গর্ডন জিজ্ঞেস করলো, "কেমন হয়েছে ?"

দিদি বললো, "আমাদের আসল তাজমহল থেকেও ভাল হয়েছে।"

মিসেস ফিশার ছেলেদের কাণ্ডকারখানা দেখে বেশ আমোদ পাচ্ছেন। লিভিংরুমে ফিরে গিয়েই তিনি বললেন, "এবার তোমরা খাবে চলো।"

খুকু বললো, "দাঁড়ান ভাইফোঁটা সেরে নিই। তার আগে পর্যন্ত আমার উপোস। এইসব দুষ্টু ভাইদের জন্যে আমাকে ভোরবেলায় স্নান করতে হয়েছে।"

চন্দন আর কোথায় পাওয়া যাবে ? খুকু ট্যালকাম পাউডারের গুঁড়ো জলে মিশিয়ে একটুখানি মণ্ড তৈরি করে ফেললো এবং গর্ডন ও ফিলিপকে হাত মুখ ধুয়ে মেঝেতে বসতে বললো।

"কি হবে ডিডি ? কেন আমরা মেঝেতে 'স্কোয়াট' করবো ?" গর্ডন ও ফিলিপ দু'জনই চিৎকার করে উঠলো।

মিসেস ফিশার উত্তর দিলেন, "তোমরা অপেক্ষা করে দেখো। আজ কত মজা হবে। আজ যে ব্রাদারস্ ডে—ভাইফোঁটা। মনে নেই গত বছরে ডিডি এই দিনে তোমাদের নিয়ে কত আনন্দ করেছিল ?"

"কী মজা।" ছেলেরা এবার চিৎকার করে উঠলো। "আমরা যদি আজ খুব দুষ্টুমি করি তাহলেও ডিডি আমাদের বকতে পারবে না।"

খুকু এবার ওদের হাঁটু-মুড়ে বসাবার চেষ্টা করতে লাগলো। "ফোঁটা নেবার সময় ওই রকম পা ছড়িয়ে বসলে চলবে না। প্রার্থনার সময়, লর্ড বুড্ঢা যেভাবে বসে থাকতেন সেইভাবে তোমাদের পদ্মাসন হতে হবে" খুকু ওদের পা দুটো মুড়ে দিল।

আমেরিকান ছেলেদের পা মুড়ে বসানো নিতান্ত সোজা কাজ নয়। ফিলিপ বলে উঠলো, "ডিডি, এইভাবে কতক্ষণ থাকতে হবে ? আমার পা অবশ হয়ে যাচ্ছে—ভিতরে জ্বালা করছে।"

বড়ো ছেলে গর্ডন বললো, "আমার হাঁটুটা দড়ি দিয়ে বাঁধো, নাহলে এখনই পা সোজা হয়ে যাবে।"

খুকু তাড়াতাড়ি পরম-স্নেহে ওর বিদেশী দুই ভাই-এর কপালে ফোঁটা এঁকে দিল। ভাইফোঁটার মন্ত্র পড়লো—ভাই-এর কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়ারে পড়লো কাঁটা……।

মিস্টার ফিশার ছেলেমেয়েদের বললেন, "তোমরা শোনো, বছরের এই বিশেষ দিনে ভারতবর্ষের বোনরা তাদের ভাইদের কপালে পবিত্র ফোঁটা পরিয়ে তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করে। শত শত বছর ধরে এই সুন্দর ঐতিহ্য চলে আসছে।"

ফিলিপ বললো, "বাবা, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। বছরে মাত্র একদিন কেন? প্রতি সপ্তাহে ব্রাদার-ডটিং করলেই হয়।"

ফিলিপের কথায় আমরা সবাই হেসে উঠি। ফিলিপ এবার দিদি পামেলার দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি দাঁড়িয়ে দেখছো কি? আমাদের কপালে পেন্টিং করো, গোপন কবিতা মুখস্থ বলো। আর মনে থাকে যেন, আজকে ভাইদের ওই বিশ্রী দাঁতগুলো বার বার দেখাতে নেই। ভাই ফিলিপ ভুল করলেও তার চুল টানতে নেই।"

ফিলিপ ছেলেটির কথায় বেশ বাঁধুনি। পামেলা এবার বসে পড়ে ডিডির কায়দায় ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "ফিলিপ, আজ তোমার চুলে হাত দেবো না, কিন্তু তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি একটি ওরাং ওটাং।"

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো ফিলিপ। "তবে রে। আমাকে ওরাং ওটাং বলা।" ফিলিপের লক্ষ্য পামেলার পশমের মতো নরম চুলগুলো।

মিসেস ফিশার ছেলেকে সামলে নিলেন। "মনে থাকে যেন ফিলিপ আমরা আজ ভারতীয় মতে চলেছি। ভারতবর্ষে কেউ বয়োজ্যেষ্ঠদের গায়ে হাত তোলে না। ওটা বেআইনী।"

ফিলিপ বেচারা একটু হতাশ হয়ে পড়লো। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললো, "বড়ো বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? ইণ্ডিয়াতে কি বড়োরা ছোটদের ওরাং ওটাং বলে?"

খুকু হেসে ওদের মিষ্টি দিতে দিতে বললো, "বড়োরা রেগে গেলে মোটেই ওরাং ওটাং বলে না। বাঁদর বলে!"

এবার আবার হৈ-হৈ পড়ে গেলো। প্যামেলা লাফাতে লাফাতে বললো, "বেশ, তোমাদের এবার থেকে আমি তাহলে বাঁদরই বলবো।"

আমাদের লিভিং রুমে বসিয়ে রেখে খুকু হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো। ওর সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও উধাও।

ফিশার দম্পতিকে বললাম, "এই দূর বিদেশে সুচরিতাকে আপনারা যে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তার জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আপনাদের কথা বলতে গিয়ে খুকুর চোখে জল এসে যায়।"

মিস্টার ফিশার উত্তর দিলেন, "সুচরিতার মতো মেয়ের সান্নিধ্যে এসে আমরা ধন্য। আমাদের সংসারে সে আনন্দের বসন্ত নিয়ে আসে।"

মিশেস ফিশার বললেন, "আপনার ভাগ্নী একটি হীরের টুকরো। দশলক্ষে এমনি মেয়ে একটি হয় না। পড়াশোনায় এতো ভাল, সহপাঠীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব অথচ একেবারে কচি মন। আপনাকে সত্যি কথা বলছি, আমার স্বপ্ন, আমার ছেলেমেয়েরা যেন ওদের ডিডির মতোই হয়ে উঠতে পারে।"

কম কথার মানুষ মিস্টার ফিশার। উনি জানালেন, "সুচরিতা ম্যাচিওর অথচ ছেলেমানুষ—সোনালী অথচ সবুজ। আমার কী মনে হয় জানেন, মেয়েদের এমনি হওয়াই উচিত, ওদের যে মা হতে হবে।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আপনার মতো একজন লেখককে আমাদের বাড়িতে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আমরা অতি সাধারণ একটি পরিবার —এখানে আপনি আমেরিকার তেমন কিছু পরিচয় পাবেন না।"

মুখে কিছু উত্তর দিলাম না, মনে মনে বললাম, সাধারণ সংসারে মানুষকে দেখা না হলে দেশ দেখা হয় না।

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "খুকু আপনাকে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলেছে কি না জানি না। আমরা দু'জনেই দক্ষিণী—টেকসাসের লোক। বিয়ে হয়েছে কুড়ি বছর। আমি হাই ইস্কুল পর্যন্ত পড়েছিলাম। আমার স্বামী বছর দশেক বেল টেলিফোনে কাজ করেছিলেন, তারপর এখানে চলে আসেন। আমি বিয়ের পর বছর দুয়েক কাজ করেছিলাম—তারপর আমার বড়ো মেয়ে হয়। সেই থেকেই সংসার নিয়ে মেতে আছি। এদেশে চাকর-বাকর পাওয়া যায় না—চারটি সন্তান মানুষ করা সারাক্ষণের কাজ।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "আমি ওকে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বলি। সংসারও তো এক ধরনের কারখানা। কাচামাল হলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে। তা থেকে নাগরিক তৈরি করা হয় এই সংসার-কারখানায়।"

"টেমপোরারি ফ্যাক্টরি। কাঁচামাল ফুরিয়ে গেলেই কারখানা বন্ধ

হয়ে যায়। আমাদের ছেলেমেয়েরাও মানুষ হয়ে এলো। তারপর আমাদের কোনো কাজ থাকবে না।'' মিসেস ফিশার আমার দিকে আঙুরের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে বললেন।

মিস্টার ফিশার জানালেন, "আমার স্ত্রীর খুব ইচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা পৃথিবী সম্বন্ধে অবহিত হোক। শুনেছেন বোধ হয়, জাহাজের ওপর এক ধরনের নতুন ইস্কুল তৈরি হচ্ছে। জাহাজটাই ইস্কুল। সেখানেই ক্লাশ হয়। এক এক বন্দরে জাহাজ থামে—ছেলেমেয়েরা সেখানে নেমে সে দেশের ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়—তারপর আবার জাহাজ ছেড়ে দেয়। মধ্য-সমুদ্রে জাহাজ এগিয়ে চলে, ছেলেদের পড়াশোনাও হতে থাকে। দশ মাস পরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ছেলেদের ভাসমান ইস্কুল আবার স্বদেশের বন্দরে ফিরে আসে। এই ধরণের ইস্কুলে ছেলেদের পাঠাতে পারলে খুব ভাল হতো। কিন্তু বড্ড খরচ, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বড়ো মেয়ে কলেজে, আর তিনটি ইস্কুলে। অতি সাধারণ ইস্কুলে পড়ে, তাতেই মাসে মাথাপিছু মাইনে পনেরোশ টাকা। তা যা বলছিলাম আপনাকে, বিদেশে না যেতে পারলে বিদেশীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

মিসেস ফিশার বললেন, "সেই জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখেছিলাম, আমরা একজন বিদেশী ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। কিন্তু আমাদের কি সৌভাগ্য ওঁরা সুচরিতাকে পাঠালেন।'

মিস্টার ফিশার বললেন, "আসা থেকেই সুচরিতা আমাদের পরিবারের ওপর তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের আমেরিকা বিজয় বলতে পারেন।"

"সুচরিতা কেমন মেয়ে জানেন? আমার ছেলেরা যে এতো দুষ্টু, তারাও ডিডির কাছে বশ! ডিডিকে ওরা ভালবাসে এবং ভয় করে। আমাদের ছোটখাট যে-সব পারিবারিক গোলমাল বাধে তার বিচারের ভারও ডিডির ওপর। ওর বুকটা সোনা দিয়ে তৈরি। ছুটির দিনে এখানে এসেই আমাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে।"

"ওর রান্না ইণ্ডিয়ান কারি!" মিস্টার ফিশার খুকুর রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। আমার মত, খুকু ওর দু-একটা

রান্নার পেটেন্ট নিয়ে নিক। পাঁচ বছরের মধ্যে মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবে।”

মিসেস ফিশার বললেন, “আজও কুকু রান্নাঘরে ঢুকেছে। ছেলেরা তাই এতো উত্তেজিত। ওরা সবাই রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ডিডির রান্না দেখছে।”

মিসেস ফিশার আরও বললেন, “সেবার আমার শরীর খারাপ হলো। কয়েকদিন বিছানায় বন্দী। ফোন করে জানতে গিয়ে কুকু শুনলে আমার অসুখ। দেড় ঘণ্টার মধ্যে মেয়ে এখানে হাজির। তারপর এক সপ্তাহ ধরে ওইটুকু মেয়ে আমাদের জন্য যা করলে তা পরীরাও করে না। নিজে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করছে, রান্না করছে, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রেখেছে, বাসন মেজেছে, ওঁকে অফিসে পাঠিয়েছে। আমার স্বামী তো তাজ্জব—আমরা কখনও এরকম ব্যাপার শুনিনি। জানেন তো, এদেশে বাচ্চাদের আধ ঘণ্টা দেখলে আপনার প্রতিবেশীও টাকা আদায় করে।”

খুকু একটু পরেই রান্না সামলে ঘরে ঢুকলো। মিসেস ফিশার বললেন, “বোসো বাছা, তোমার মুখ ঘেমে গিয়েছে। তোমার মায়ের যা মেয়ে-ভাগ্য, বহুলোকের হিংসে হবে।”

খুকু হেসে বললো, “আমাদের দেশে সমস্ত মেয়েই রান্নাবান্না শেখে—আমিই বরং তেমন কিছু জানিনা বলে মা ভয় পান, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বদনাম কুড়বো।”

“যে-বাড়িতে তুমি যাবে, তারা তোমার মাকে সোনার মেডেল দেবে, এই রকম মেয়ে তৈরির জন্যে!” শ্রীমতী ফিশার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

মিস্টার ফিশার স্ত্রীকে বললেন, “লক্ষ্য করেছো, কুকুর মা বলেন, ফাদার-ইন-ল-এর বাড়ি যাবে। শ্বশুরবাড়ি—স্বামীর বাড়ি নয়।”

মিসেস ফিশার বললেন, “শ্বশুর বাড়ি কিংবা স্বামীর বাড়ি যেখানেই যাক—মেয়েদের মন পড়ে থাকে বাপের বাড়ির দিকে। বাপ-মায়ের জন্যে মেয়েরাই কিছু করে।”

মিস্টার ফিশার প্রশ্ন করলেন, “আপনাদের দেশে বাপ-মা বৃদ্ধবয়সে ছেলের ওপর নির্ভর করেন, তাই না?”

খুকু উত্তর দিলো, “কন্যাদায় বলে একটা কথা আছে। কন্যা মানেই

খরচ, অথচ ছেলেরা একটা ইনসিওরেন্স পলিসি, "প্রথমে খরচ করলে পরে সুদে আসলে উঠে আসবে।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "কুকু নৃতত্ত্বের ছাত্রী, ও ভাল বলতে পারবে। তবে আমার মনে হয়, আমাদের দেশে মেয়েদের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে।"

ভারতবর্ষের খবর জানতে চাইলেন ওঁরা। বললাম, "অন্য ব্যাপার জানি না, তবে যেখানেই যাই মায়েরা আজকাল অভিযোগ করেন, বিয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেরা নাকি পর হয়ে যাচ্ছে। ঝোঁকটা নাকি তাদের শ্বশুর-বাড়ির দিকেই বাড়ছে।"

খুকু আমার কথায় হেসে ফেললো। আমি বললাম, "অনেকে দুঃখ করছেন, ঘোর কলিতে মায়ের থেকে শাশুড়ীর দাম বেড়ে যায়।"

মিসেস ফিশার বললেন, "শাশুড়ীর সঙ্গে এখন কোনো বউ এদেশে ঘর করে না, সুতরাং শাশুড়ী বউ-এর মতান্তরের সুযোগ কমে গিয়েছে।"

খুকু বললো, "আমাদের অধ্যাপক মিড্ বলেন যে শিল্পবিপ্লবের ফলে ছেলেরা ক্রমশই শ্বশুরবাড়ির দিকে ঝুঁকবে। অমন যে অমন জাপান, সেখানেও হাজার হাজার বছরের পারিবারিক ঐতিহ্যে ফাটল দেখা দিচ্ছে। অনেক বড়ো ছেলে এখন বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। অনেক জামাই শ্বশুরবাড়িতে উঠছে। আর জানেন তো, জাপানে ঘর-জামাইদের জন্য কী ব্যবস্থা—তাকে স্ত্রীর উপাধি নিতে হয়! আমাদের জানাশোনা এক ভদ্রলোকের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, জাপানে মেয়েরা ক্রমশই বাপের বাড়ির খোঁজখবর বেশী নিচ্ছে।"

মিস্টার ফিশার বললেন, "কোথায় যেন পড়েছিলাম, মেয়েরা আজকাল বাপের বাড়ির কাছাকাছি বাসা খোঁজে।"

"ঠিকই পড়েছেন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কমবয়সী দম্পতিরা স্ত্রীর পৈতৃক বাড়ির কাছাকাছি থাকছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, ছেলের শ্বশুরবাড়ি-প্রীতি বাড়ছে। এ সম্বন্ধে অনেকগুলো কারণ দেখানো হচ্ছে। প্রথম, অবিবাহিত মেয়েরা অবিবাহিত পুরুষদের মতো কাজের সন্ধানে বাবা-মার বাড়ি থেকে খুব দূরে চলে যায় না। সুতরাং তাদের বিয়ে হয় এমন পুরুষদের সঙ্গে যারা এ-অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে। ফলে বিয়ের পরে তারা মেয়ের বাপের বাড়ির কাকাকাছি অ্যাপার্টমেন্ট নেয়।

আর একটা কারণ দেখানো হচ্ছে যে মেয়ে সাধারণত বয়সে ছোট, সুতরাং তার বাবা-মায়ের বয়স ছেলের বাবা-মার বয়স থেকে কম হবে, এইটা আশা করা যায়। সুতরাং তাঁদের শারীরিক ক্ষমতা বেশী থাকে এবং মেয়ে-জামাই-এর তদারকী করতে পারেন। তবে এই যুক্তিটা ধোপে টেঁকে না।"

"আপনাদের দেশে কী হচ্ছে ?" মিস্টার ফিশার জিজ্ঞেস করেন।

"আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্বশুরবাড়ির প্রতি বেশী অনুরক্ত হওয়াটা ছেলেদের পক্ষে শোভন বিবেচিত হয় না। এঁদের স্ত্রৈণ বলে বদনাম দেওয়া হয়। কিন্তু ক্রমশঃ যা দেখছি—মেয়ের সংসার সম্পর্কে বাবা মা ক্রমশঃই অনেক বেশী আগ্রহ নিচ্ছেন। মেয়ে জামাই আলাদা থাকলে, দৈনন্দিন সাংসারিক খুঁটিনাটি সম্পর্কে মেয়ের মায়ের উপদেশ বেশী নেওয়া হচ্ছে।"

খুকু বললো, "আমাদের প্রফেসরদের ধারণা, এইটাই ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। অর্থাৎ কাঁটাটা অলক্ষ্যে ম্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটির দিকেই ঝুঁকছে। পুরুষ-প্রধান সমাজ থেকে প্রমীলা-প্রধান সমাজের দিকে যাচ্ছি আমরা।"

"বলিস কী! এই করতে-করতে শেষ পর্যন্ত আমরা আবার না প্রমীলা রাজত্বে ফিরে যাই!" আমি আশঙ্কা প্রকাশ করি!

খুকু হেসে বললো, "খুব সাবধান তোমরা। ভারতবর্ষে আমরা ঘর-সংসার চালিয়েও এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছি, পার্লামেণ্টের মেম্বার হচ্ছি, রাজনীতি করছি, লাটসায়েব হচ্ছি, এমন কি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছি। অফিসেও আমরা ঢুকে পড়েছি। কারখানা আর মিলিটারি এই দুটো মেয়েদের হাতের মধ্যে আনতে পারলেই পুরুষ যুগের অবসান হবে!"

"তখন কী হবে ?" আমি কাতরভাবে প্রশ্ন করি।

"প্রমীলা রাজত্বে যা হয় তাই হবে। বিয়ের পরে তোমাদের নাম পাল্টে যাবে, চাদরের খুঁটে চোখের জল মুছতে-মুছতে স্ত্রীর বাড়ি চলে আসবে। রান্না-বান্না এবং শিশুপালন পদ্ধতি ভাল করে শিখবে। এবং শ্বশুরের বকুনি খেয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে চোখের জল ফেলবে।"

"খুব খারাপ হয় না, তাহলে।" শ্রীমতি ফিশার মেয়েদের পক্ষেই প্রবল উৎসাহে ভোট দিলেন।

আমি ও মিস্টার ফিশার বোকার মতো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

মিস্টার ফিশার এবার গম্ভীর ভাবে জানালেন, "ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফাটকা খেলাটা ভাল নয়। আমাদের আলোচনা বর্তমানে সীমাবদ্ধ থাকাই যুক্তিযুক্ত নয় কি?"

দু'জন মেয়ে আমাদের হারিয়ে খুশী হয়ে বললো, "ঠিক আছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিয়ে তোমাদের মনোকষ্টের কারণ হতে চাই না।"

খুকু বললো, "হিসেব করে দেখা গেছে, এবং আমাদের বইতে লেখা আছে, আমেরিকায় স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনরাই বেশী বিনা নোটিশে বেড়াতে আসেন। বহুক্ষেত্রে ফ্ল্যাটের বাড়তি চাবিটা স্ত্রীর বাপের বাড়িতেই থাকে। স্বামীরা যদিও নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের বেশী ফোন করেন, চিঠি লেখা বেশী হয় স্ত্রীর বাবা-মায়ের কাছে। বাড়িতে যত খানাপিনা হয় তাতে স্ত্রীর বাবা মা বোন বেশী আমন্ত্রিত হন স্বামীর আত্মীয়স্বজন থেকে।"

"বুঝুন তাহলে আমরা কোন্‌দিকে যাচ্ছি!" মিস্টার ফিশার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ফিশার গৃহিনী বললেন, "কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই, তেমনি সংসারের ধকল সামলাবার জন্যে সব সময় স্ত্রীর মার কাছে টেলিফোন করা হয়। স্ত্রীর বাচ্চা হবার সময় কে আসেন? স্বামীর মা না স্ত্রীর মা?"

সুচরিতা বললো, "আমরা বইতে পড়েছি, নতুন সংসার পাতার সময় স্বামীর বাবা-মা টাকা দেন ধার হিসেবে। আর স্ত্রীর বাবা-মা যা দেন তা প্রায়ই উপহার হিসেবে। আমরা বলি নন-রেসিপ্রোকেটেড গিফট অর্থাৎ যে উপহারের প্রতিদানে আবার উপহার দিতে হয় না।"

ফিশার পরিবারের ছেলেমেয়েরা মার্চ করে ঘরে ঢুকে পড়লো। ওরা এতোক্ষণ বাড়ির অন্য কোথাও দুষ্টুমিতে ব্যস্ত ছিল।

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আর কথা নয়! সবাই খাবে চলো।"

একটা টেবিলে আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বসলাম। ইণ্ডিয়ান

ও আমেরিকান দু'রকম রান্না হয়েছে। শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আমার মুস্কিল হয়েছে, ছেলেমেয়েরা ইণ্ডিয়ান রান্না পেলে আর কিছুই চায় না। প্রত্যেকটি ছেলে ঝাল খেতে ওস্তাদ হয়েছে!"

এমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে অনেকদিন খাইনি। শ্রীমতী ফিশার মায়ের মতো আদর যত্ন করলেন। বললেন, "এটা নাও, ওটা নাও।"

খুকু বললো, "খুব সাবধান মামা, আমেরিকায় না বোলো না। নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে একবার অনুরোধেই নিয়ে নেবে। এখানে কেউ দুবার সাধে না। আমি তো প্রথম দিকে বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমবার অভ্যাস মতো না বলেছি, তারপর কেউ কিছু বললে না। পেটে ক্ষিদে নিয়ে উঠতে হলো।"

মিসেস ফিশার বললেন, "কুকুর কাছে আমরা শিখে নিয়েছি, ইণ্ডিয়ানদের বার-বার অনুরোধ করতে হয়। প্রথমবারে কেউ হ্যাঁ বলে না। অন্তত তিনবার 'না'-এর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে!"

খাবার পর খুকু কফির ব্যবস্থা করলো। ও-যে এ বাড়িরই মেয়ে হয়ে গিয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

কফি পানের পর বড়ো ছেলে গর্ডন বললো, "বাবা, আমার খবরের কাগজের হিসেব মেলাতে পারছি না।"

বাবা বললেন, "চলো, আমি তোমার ঘরে যাচ্ছি।"

মিস্টার ফিশার আমাকে বললেন, "আমার বড়ো ছেলে ভোরবেলায় খবরের কাগজ বিক্রি করে। আজকে গত সপ্তাহের হিসাব মেলাবার দিন।"

যাদের বাড়িতে দু'খানা ইমপালা মোটর গাড়ি, যার বাবা নামকরা কোম্পানির পদস্থ অফিসার, সেই ছেলে সকালবেলায় খবরের কাগজ ফেরি করে!

খুকু বললো, "এদেশে এইটাই দেখবার এবং শেখবার।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "গর্ডন আগে একটু ঘুমকাতুরে ছিল। এখন ওর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, খুব ভোরবেলায় উঠে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সাইকেলে স্পেশাল কেরিয়ার লাগিয়ে নিয়েছে—আমাদের দেশের খবরের কাগজ দেখেছেন তো—প্রায় দু পাউণ্ড ওজন।"

"মুস্কিল হয় ওর বাবার, তাই না?" খুকু জিজ্ঞেস করে।

"ঠিক বলেছো। গত সপ্তাহে গর্ডনের গলা ব্যথা হয়ে জ্বর হলো—তখন ওঁকে বেরুতে হলো ছেলের কাগজ বিলি করতে। উনি ছেলের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে সব বাড়ি চিনে রেখেছেন।

মনে মনে বললাম, এইরকম ব্যাপার আমেরিকায় দ্বিতীয়বার দেখছি। খুকু বললো, "ভাবতে পারো, কলকাতা, বোম্বাই বা দিল্লীর কোনো নামকরা কোম্পানির ম্যানেজার সকালবেলায় ছেলের বদলি হিসেবে খবরের কাগজ বিলি করছেন! এবং তার জন্য কোনো সংকোচ বোধ করছেন না।"

আমাদের ছেলেরা এইগুলো বিদেশে শিখছে তো? আমার জানবার কৌতুহল হয়। পশ্চিমের প্রাচুর্যের খবরটাই আমাদের কানে আসে—পশ্চিমের কর্মযোগটা আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় না।

শ্রীমতী ফিশার ইতিমধ্যে পারিবারিক বিশ্বকোষের একটা খণ্ড হাতে নিয়ে মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছেন।

"ডেটিং-এর পরিচ্ছেদ আর একবার ঝালিয়ে দিচ্ছি, কুকু। আজ পামেলার ডেটিং রয়েছে। দু'-তিনদিন ধরে ওকে শেখাচ্ছি—ডেটিং-এ কী করতে হয় এবং কী করতে নেই।"

"আপনার নিজের অভিজ্ঞতাটা খাটালেই চলে যায়", খুকু প্রস্তাব করে।

"না বাছা, দিনকাল দ্রুত পাল্টাচ্ছে। এখন ডেটিং-এর ধারা প্রতি বছরে পরিবর্তন হচ্ছে—সুতরাং নতুন বই বা ম্যাগাজিন পড়া ছাড়া উপায় নেই। তোমাদের দেশের মায়েরা বেশ ভালই আছেন। ওঁদের এইসব ঝামেলা নেই।" শ্রীমতী ফিশার হেসে আবার বই-এর মধ্যে ডুবে গেলেন।

শ্রীমতী ফিশার ডেটিং-এ জামাকাপড়ের ফ্যাশন সম্পর্কে খবর খুঁজছেন। বইপড়া শেষ করে তিনি বললেন, "ডেটিং মানেই চিন্তা—মেয়ে বাড়ি না-ফেরা পর্যন্ত আমার ভয় কাটে না। ডেটিং এখন আমাদের সভ্যতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

খুকু বললো, "ডেটিং এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চলছে, কলকাতার হাই সোসাইটিতে ব্যাপারটা রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।"

"পার্ক স্ট্রীট থেকে লোয়ার সারকুলার রোড পর্যন্ত কলকাতাখণ্ড তো বিলেত-আমেরিকারই অংশ।" আমি উত্তর দিই।

"মানব-মানবী সম্পর্কে এই শতাব্দীর ঐতিহাসিক আবিষ্কার এই

ডেটিং। পৃথিবীতে মার্কিন সভ্যতার বিশিষ্ট দান। জিনিসটা চালু হয়েছে প্রথম যুদ্ধের পরে, এই ১৯২০-২১ সালে", খুকু আমাদের বললো।

"তার আগেই তো পছন্দ করে বিয়ে করা—যাকে আমরা লভ্ ম্যারেজ বলি, তা এখানে চালু হয়ে গিয়েছে। তখন তাহলে কী ভাবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন হতো ?" আমি প্রশ্ন করি।

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আগে রবিবারের সকালে চার্চে সবাই জড়ো হতো। মায়েরা সেখানেই মেয়েদের সাজগোজ করিয়ে নিয়ে যেতেন এবং যোগ্য পাত্রের দিকে নজর রাখতেন। তারপর যখন মেয়ে কোনোও যোগ্য ব্যাচেলরের চোখে ধরলো তখন পাত্রকে মেয়ের বাবার কাছে চিঠি লিখে আবেদন করতে হতো। আবেদনে নিজের বংশ-পরিচয় এবং গুণাবলীর সুবিস্তৃত বিবরণ দিতে হতো। পাত্রীকে পাবার জন্যে এই তরুণ যুবক যে কতখানি আগ্রহী তা কায়দা করে চিঠির ভাষায় জানাতে হবে। কর্তা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বেকন ও ওমলেট খেতে খেতে সেই সব সুদীর্ঘ পত্র পাঠ করবেন। চিঠির ভাবা থেকে আন্দাজ করবেন ছোকরাটি জামাই হিসেবে কেমন হবে। যদি পাত্র পছন্দ হয়, যদি তার পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা মনের মতো হয়. তাহলে তিনি গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন—এবং পাত্রকে বাড়িতে নেমতন্ন করবেন। মেয়ের সঙ্গে পাত্রের যা ভাবের আদান-প্রদান তা ড্রইং-রুমে বসে বাবা-মায়ের সামনে করতে হবে।"

খুকু বললো, "আমেরিকান যৌবন যে স্বাধীন হতে চাইছিল তার প্রমাণ এই ডেটিং। নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে বড়োদের খবরদারি তারা সহ্য করতে রাজী নয়। তারা স্বাধীন ভাবে মেলা-মেশা করতে চায় পার্টিতে। ফোনে ডেট ঠিক করে নিজেদের গাড়িতে জোড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। তারা একসঙ্গে সিনেমায় যায়, একসঙ্গে জুকবক্সে পয়সা ফেলে পপ গান শোনে এবং নাচে।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "ভাল-মন্দ বুঝি না, তবে ডেটিং নিয়ে আমেরিকান জাতের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন।"

"অনেকেই এর মধ্যে বেলেল্লাপনা ছাড়া কিছুই দেখতে পান না," খুকু স্বীকার করলো। "কিন্তু জিনিসটা অত সহজ নয়। ডেটিং ব্যবস্থা যে এদেশের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে তা মানতেই হবে।"

"ব্যাপারটা একটু খুলে বলো না। আমি দু'দিনের জন্যে এদেশে এসে একটা ভুল ধারণা নিয়ে যাবো, সেটা ঠিক নয়।"

খুকু হেসে বললে "উইনডো শপিং কথাটা শুনেছো নিশ্চয়। লোকে ঘুরে-ঘুরে বিরাট বিরাট দোকানের শো-কেসে যে হরেক রকম জিনিস সাজানো থাকে তাই দেখে, অথচ কিছুই কেনে না। 'উইনডো শপিং', কথাটা প্রথমে ছিল ব্যঙ্গ, এখন সবাই বলছেন এর দরকার রয়েছে। ঘুরে ফিরে সব দেখে, শেষে মাথা ঠাণ্ডা করে মানুষ জিনিস কিনবে। কেউ কেউ ডেটিংকে বিবাহের উইনডো শপিং বলছেন।"

"তা ঠিক। একদিন ডেট করেই কেউ বিয়ে করছে না। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছে—একটু আধটু কথা হচ্ছে, হাসি-ঠাট্টা, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় চলছে, তারপর আবার অন্য কারুর সঙ্গে ডেটিং।" শ্রীমতী ফিশার তাঁর মতামত দিলেন।

খুকু বললো, "বার বছর বয়েস থেকেই অনেক পরিবারের ছেলেমেয়ে ডেটিং শুরু করে।"

"না বাপু! অত কম বয়সে জিনিসটা ভাল নয়," মিসেস ফিশার তাঁর মতামত জানালেন।

"হিসেবে দেখা যাচ্ছে, শতকরা ২০ ভাগ ছেলে এবং শতকরা ১৫ ভাগ মেয়ে তেরো বছর বয়সে তাদের প্রথম ডেটিং করে। তবে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সব ছেলেমেয়ে ডেট-ক্রীড়ায় রপ্ত হয়ে যায়।"

"ওই পনেরো বছর বয়সটাই ভাল। তবে কি জানো, আজকাল ছেলেমেয়েদের ওপর বাবা-মায়ের সেরকম প্রভাব থাকে না। ইস্কুলে এবং পাড়ায় ছোটরা যা দেখছে তা থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রাখা বেশ শক্ত কাজ", দুঃখ প্রকাশ করলেন মিসেস ফিশার।

খুকু বললো, "ডেটিং-এর ওপর আমি স্পেশাল পেপার লিখেছি। ১৬ বছর বয়সে যে ছেলে বা মেয়ে ডেটিং গেমে নামলো না তার সম্বন্ধে মায়েরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বেশীর ভাগ মা ছোটেন মানসিক রোগের চিকিৎসকদের কাছে। চোখ ছলছল করে বলেন, ডাক্তার, আমার এই মেয়েটির কী হবে বলুন তো? একটিও ছেলে বন্ধু নেই। অথচ আমার মেয়ের তো দৈহিক আকর্ষণ কম নয়। দেখতে সুন্দরী, দাঁত এবড়ো-

খেবড়ো নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, অহেতুক ঘামে না, মুখে গন্ধ নেই। কথাবার্তাও খারাপ বলে না। আমি কত বলি, কিন্তু মেয়ে শুধু মেয়ে বান্ধবীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে, চিঠি লিখছে, গল্প করছে।"

"সর্বত্রই তা হলে প্রতিযোগিতা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এবং সে-প্রতিযোগিতায় নিজেকে লড়তে হবে—আমাদের দেশের মতো বাবা-মাকে এগিয়ে দিলে কাজ হবে না।"

মিসেস ফিশার বললেন, "কিন্তু ডেটিং-এর অর্থ শুধু পাত্র-পাত্রী নির্বাচন নয়।"

খুকু ওঁর সঙ্গে একমত হলো। বললো, "ওটাই নাটকের শেষ অঙ্ক। তার আগেও অনেক আছে।"

মিসেস ফিশার বললেন, "কুকু, তুমি তো ডেটিং করো না অথচ কেমন শিখে গিয়েছো। আমি জোর করে বলতে পারি, যে সব আমেরিকান মেয়ে ডেট ছাড়া আর কিছুই করছে না, তারাও তোমার মতো খবরাখবর রাখে না।"

"আমার যে পরীক্ষার পড়া কাকীমা। এসব না জানলে 'এ' পেতাম না পরীক্ষায়।" খুকু উত্তর দিলো।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে খুকু বললো, "আমেরিকার যৌবন এই ডেটিংকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খাচ্ছে। যা কিছু ডেটিং-এর পক্ষে বাধাস্বরূপ তা এদেশে টিকবে না। ছেলেমেয়েদের আলাদা কলেজের কথা ধরো: এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কারণ ছেলেরা বা মেয়েরা কাদের সঙ্গে মিশবে? কাদের ডেটে নিমন্ত্রণ জানাবে? বহু কলেজ তাই বাধ্য হয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।"

খুকু বললো, "ডেটিং এখন বালক বালিকা এবং অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের অবসর বিনোদনের প্রধান পদ্ধতি। পাত্র-পাত্রী সন্ধান ছাড়াও এর অন্য মূল্য রয়েছে। এদেশের ধারণা, ডেটিং-এ ছেলে এবং মেয়ের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। পুরুষ পুরুষোচিত ব্যবহার করতে শেখে, এবং মেয়েদের মেয়েলি গুণগুলো ফুলের মতো ফুটে উঠে। তাছাড়া নিজের ফ্যামিলির বাইরে পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। মেয়েরা পুরুষ জাত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে এবং ছেলেরাও মেয়ে বলতে কী বোঝায়

তা শিখে নেয়। ফলে দু'পক্ষই নিজেদের ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। এই ট্রেনিং পরবর্তীকালে বধূ এবং স্বামী দুজনেরই উপকারে লাগে।"

"আমি তোমার সাথে সম্পূর্ণ একমত কুকু," বললেন শ্রীমতী ফিশার। "ডেটিং-এর সবচেয়ে বড়ো লাভ অপোজিট সেক্স সম্পর্কে রহস্য কেটে যায়। আজকের যুগে এটা বিশেষ দরকার। এখন এতো ছোট ছোট সংসার যে অনেক মেয়ের সমবয়সী ভাই নেই, অনেক ছেলের বোন নেই। ফলে তারা অন্য সেক্স সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। আমার কথাই ধরো না। বাবা মায়ের এক সন্তান আমি। এটা মোটেই ভাল নয়। ভাই বা বোন হওয়ার অভিজ্ঞতাও জীবনে মূল্যবান। সংসারে যারা এক সন্তান এবং একলা বড়ো হয়, জীবনে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে বেশী মেহনত করতে হয়। আমি আবার মেয়ে স্কুলে পড়তাম। ফলে ডেটিং ছাড়া আর কোথাও ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় হতো না। ওরা যে আমাদের থেকে আলাদা তা ডেটিং-এ গিয়েই প্রথম বুঝতে পারলাম।"

থুকু বললো, "ডেটিং-এর পক্ষে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি এতে ছেলেমেয়েরা নিজের ব্যক্তিত্ব অপরের উপর বিস্তারের সুযোগ পায়—মানব চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয় এবং নিজের ব্যক্তিত্বের ত্রুটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়, ফলে নিজেকে শোধরানোর একটা সুযোগ পাওয়া যায়।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "প্রেমের এই প্রতিযোগিতায় অনেকে বেশ রপ্ত হয়ে ওঠে, অনেকে একেবারে ভেঙে পড়ে। অনেক মেয়ের ছেলেমহলে ভয়ানক খাতির, ফলে তারা যা-খুশী করে বেড়ায়। একটু মাথা বিগড়ে যায়। অনেকের আবার উল্টো। ডেটিং-এর ব্যর্থতা তাদের পড়াশোনা খারাপ করে দেয়।"

থুকু বললো, "যেখানে এই ধরনের সমস্যা হয় না, সেখানেও নার্ভের ওপর চাপ পড়ে। দু'পক্ষই এমন মায়জাল বিছাবার চেষ্টা করে যাতে অপরপক্ষ খুব তাড়াতাড়ি প্রেমে হাবুডুবু খায়। সে প্রেম যে গ্রহণ করা হবে তার কোনো কথা নেই। কিন্তু এতে বন্ধু মহলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ডেটিং-এ বাজারে দাম বাড়ে। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, অমুক যে-সে ছোকরা নয়, চারটে মেয়ে ওর প্রেমে পাগল!"

"এটা কি খুব ভাল অবস্থা? বিশেষ করে যখন সবাইকে পরীক্ষার পড়া করতে হচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ভাল-মন্দ জানি না, এইটাই পরিস্থিতি" খুকু উত্তর দেয়।

"আমিও ভাল-মন্দ জানি না, তবে ছেলেদের সম্পর্কে মেয়েদের এবং মেয়ে জাত সম্পর্কে পুরুষদের অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত উপায় হলো ডেটিং। কারণ, বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীকে সব সময় জোড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, তখন আলাদা ঘোরবার স্বাধীনতা নেই," বললেন শ্রীমতী ফিশার।

"কেউ কেউ বলছে ডেটিং-এর শেষ অধ্যায়টা বিবাহিত জীবনের রিহার্সাল। কে কতখানি নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত আছে তা এই সময় বোঝা যায়।"

শ্রীমতী ফিশার বললেন, "সবই তো শুনলাম, কিন্তু পামেলার জন্যে আমার চিন্তার শেষ নেই। ওই তো এক কৌটা মেয়ে—সবে ওর ডেটিং-এর শুরু। যতদিন না বিয়ে হচ্ছে ততদিন ফাঁড়া কাটবে না। ডেটিং-এর বিরুদ্ধে কোনো চার্চের ফাদার একবার বলেছিলেন—যৌনগন্ধে ভরপুর সস্তা মজা ছাড়া এতে আর কিছুই নেই। আমাদের ছেলে-মেয়েদের অবসর বিনোদনের জন্যে আমরা কি এর থেকে ভাল কিছু ভাবতে পারি না?"

আমি বললাম, "ঈশ্বর-প্রেমিকদের কথায় চিন্তিত হবেন না। আমাদের দেশে শংকরাচার্য নামে এক সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনিও দুঃখ করেছেন—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ।
তরুণস্তাবৎ তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ।
পরম ব্রহ্মনি কোহপি ন লগ্নঃ।।

অর্থাৎ বালকরা খেলাধূলোয় মগ্ন, যুবকরা সমর্থ তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যস্ত, বৃদ্ধরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত—হায়, ঈশ্বর সম্বন্ধে কারও আগ্রহ নেই।"

শ্রীমতী ফিশার হাসতে লাগলেন। এবং মন্তব্য করলেন, "যাই বলুন, চার্চের ফাদার ডেটিং সম্পর্কে যা বলেছেন তা ভেবে দেখা দরকার।"

ভাববার আর সময় পাওয়া গেলো না। বড়োছেলে গর্ডনকে সঙ্গে নিয়ে মিস্টার ফিশারের প্রবেশ এবং ঘোষণা "খবরের কাগজের হিসেব মিলে

গিয়েছে। সামনের সপ্তাহ থেকে গর্ডন আরও দশখানা কাগজ বেশী বিক্রি করবে, ফলে রোজগার আরও বাড়বে।"

বাবাকে গর্ডন মনে করিয়ে দিলো, "বাবা, ভুলো না যেন, তুমি বলেছো আমি নিজে যত রোজগার করতে পারবো, তুমি তার ডবল আমাকে বোনাস হিসেবে দেবে।"

মিস্টার ফিশার আশ্বাস দিলেন, সেকথা তিনি মোটেই ভোলেননি।

শ্রীমতী ফিশার এবার মেয়ে পামেলাকে কাছে বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ডেট তোমাকে কখন নিতে আসবে?"

"সন্ধ্যা ছটায় তো বলেছে। জিম কী লম্বা মা। আর তেমনি খেলোয়াড়। এবার ফুটবল টীমের ক্যাপটেন হতে পারে। বলো, এটা গ্রেট-অনার কিনা, ও আমাকে ডেটে বলেছে। অন্য মেয়েরা তো হিংসেয় লাল।"

মেয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন বেচারা মিসেস ফিশার। তারপর ফিসফিস করে মেয়েকে বললেন, "তোমাকে গতকাল যা বলছিলাম, সভ্য মেয়েরা ডেটিং-এ কতকগুলো আইন মেনে চলে। যারা ওসব নিয়ম মানে না তারা পরে দুঃখ পায়। মনে রেখো, ছেলেরা অধৈর্য হয়ে অনেক কিছু চায়, কিন্তু চাইলেই দিতে নেই। পেলে ওরা শান্ত হয় না, আরও চায়। চাওয়া মাত্রই দিলে ছেলেমহলে মেয়েদের কোনো দাম থাকে না। ওরা মনে মনে সেই মেয়েকে সস্তা ভাবে, তার সম্বন্ধে আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।"

পামেলা গম্ভীরভাবে মার কথা শুনে যাচ্ছে। শ্রীমতী ফিশার বললেন, "মনে থাকে যেন, কোনো বদ রেস্তোরাঁয় মেয়েদের যেতে নেই। আবার বন্ধুর মানিব্যাগের কথাও বিবেচনা করতে হয়—বেশী খরচ করিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।"

"কেন মা?" পামেলা জিজ্ঞেস করে।

"বেশী খরচ হয়ে গেলে বেচারা তোমাকে ঘন ঘন ডেট করবে কী করে?"

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী ফিশার জিজ্ঞেস করেন, "জিম যদি নাচ থেকে ফেরবার পথে তোমার হাত চেপে ধরে তাহলে তোমাকে কী করতে হবে মনে আছে?"

পামেলার উত্তর: "হুঁ। আমাকে আইসক্রিমের মতো ঠাণ্ডা হয়ে

যেতে হবে। হাতটা কাঠের মতো শক্ত করে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিতে হবে।"

"বাঃ এই তো লক্ষ্মী সোনা, বেশ মনে আছে।"

শ্রীমতী ফিশার এবার মেয়েকে সময় সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। "বেশী রাত কিছুতেই করবে না।"

"কত রাতকে বেশী রাত বলো ?" মেয়ে জানতে চায়।

"সাড়ে এগারো, বড় জোর বারো। তোমাকে পৌঁছে দিতে এসে ডেট যদি কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকতে চায় তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রাখবে, ঘরের আলো নেভানো চলবে না। এবং আধঘণ্টার মধ্যে ডেট-এর চলে যাওয়া উচিত।"

"জিম যদি না যায়, আমি কী করে তাকে যেতে বলবো ?" পামেলার প্রশ্ন।

"যদি দেখো বন্ধু উঠছে না, তা হলে মাঝে-মাঝে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাবে, বলবে অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। তাতেও যদি ফল না হয়, মিষ্টি হেসে ওকে সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার জন্য ধন্যবাদ জানাবে, তারপর আস্তে-আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যাবে।"

মিসেস ফিশার বললেন, "তোমার যদি তেমন ইচ্ছে হয়, তোমার বন্ধুকে একদিন বাড়িতে ডেট করতে বলতে পারো।"

মেয়ে মুখ টিপে হাসলো। শ্রীমতী ফিশার বললেন, "আরও অনেকগুলো কথা আছে—তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে এখন বলবো। যারা খুব ভাল মেয়ে তারা সেইসব নিয়ম মেনে চলে এবং শেষ পর্যন্ত হীরের টুকরো স্বামী পায়।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুকু বললো, "এবার আমাদের উঠতে হবে। মামার হাতে তো মাত্র পাঁচটা দিন। তার মধ্যে দুটো দিন শেষ হতে চললো।"

ডিডি এখনই চলে যাচ্ছে শুনে ছেলে-মেয়েদের মন খারাপ হয়ে গেল। "সে কি ডিডি ? আমরা যে ঠিক করে রেখেছিলাম, গাড়ি করে লেকের ধারে বেড়াতে যাবো। সেখানে তুমি আমাদের ইণ্ডিয়ান 'কিৎ-কিৎ' খেলা শেখাবে।"

"পরের সপ্তাহে জোর খেলা হবে। তোমাদের যদি ভোট পাই, তাহলে ওখানে চড়ুইভাতি হবে।" খুকু ওদের শান্ত করবার জন্য বললো।

ছেলেমেয়েরা এক কথায় রাজী।

ফিশার দম্পতি সামান্যক্ষণের মধ্যে আমাকে কেমন আপন করে নিয়েছিলেন। কে বলবে, ওঁরা সায়েব আমরা ভারতীয়; ওঁরা খ্রীস্টান আমরা হিন্দু; ওঁদের এবং আমাদের মধ্যে অনেক দূরত্ব!

মিস্টার ফিশার আমাকে বললেন, "কুকু-র মা-বাবাকে আমাদের শুভেচ্ছা দেবেন। বলবেন, তাঁদের মেয়ের জন্যে কোনো চিন্তা নেই। তাঁদের যদি কোনো দরকার হয় আমাদের লিখতে পারেন। এমন কি তাঁরা যদি বেড়াতে আসেন আমাদের এখানে থাকতে পারেন।"

মিসেস ফিশার বললেন, "আমাদের দুঃখ, আপনি এখানে দু'একদিন থাকলেন না। আমরা সাধারণ গৃহস্থেরা ছেলেপুলে নিয়ে কেমনভাবে দিন কাটাই তা আপনাকে দেখাতে পারলাম না। তবে আবার আসবেন।"

আমরা গাড়িতে উঠে, জানলার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে হাত নাড়লাম। খুকু গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো কোকিলের ডাক। তিনটে ছেলেমেয়ে মুখে হাত দিয়ে শব্দ করছে কু-উউ—কু-উউ। আর আমরা দেখলাম, তাদের বাবা-মা পরম স্নেহভরে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন।

॥ ৩ ॥

খুকুর ওপর আমার ভরসা অনেক বেড়ে গিয়েছে। নিরন্তর গার্জেনির বন্ধন সরিয়ে এনে বিদেশী পরিবেশে কাউকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে দিলে কী ফল হয়, খুকু তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। আমাদের কলকাতার সেই ভীরু লাজুক মেয়েটা এই সামান্য ক'বছরে কী আশ্চর্য পাল্টে গিয়েছে। তাজুদির ভাল লাগবে কিনা জানি না। মেয়েদের আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ওঁর অন্যরকম ধারণা। তাজুদির একটা কথা নাটক নভেলে চালাবার মতো। "লাউগাছ মাচা ছেড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালে বাঁশ গাছও হয় না, লাউ গাছও থাকে না।" কিন্তু এই স্বাধীনতা আমার ভাল লাগে। এই স্বাধীনতার সূর্যোদয় হলে আমাদের মা বোন স্ত্রী ও মেয়েরা

জীবনকে আরও উপভোগ করতে পারবে, সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে এবং নতুন যুগের সন্তানরা স্বাধীন দেশের উপযোগী হয়ে উঠবে।

খুকুর প্রশ্ন "মামা, কী ভাবছো?"

"ভাবছি, সেদিনকার ছোট্ট মেয়েটা কেমন সুন্দর আমার গার্জেন হয়ে গেছিস, আমিও কেমন বিদেশে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছি।"

"মামা, তোমাদের বাৎসল্য রস ছাড়ো। স্নেহে অন্ধ হয়ে ভাবছো ভাগনী তোমাদের কেষ্টবিষ্টু হয়েছে, কিন্তু তা নয়। এ-দেশে এই সব আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরীক্ষায় একটু ভাল ফল দেখাতে হলেই শক্তি এসে যায়।"

"খুকু, আমরা এখন কোথায় চলেছি?"

"তোমার মালপত্র তো গাড়িতেই রয়েছে। আমরা চিঁড়ে বউদির বাড়িতে চা খেয়েই গোল্ডেন হোমে গিয়ে উঠবো।"

খুকু আমাকে এবার সাবধান করে দিলো, "দেখো, তুমি যেন ওঁকে চিঁড়ে বউদি বলে ফেলো না, তাহলে কেলেংকারি হবে। ওটা ওঁর গোপন নাম, যে নামে ওঁকে আড়ালে সবাই ডেকে থাকে।"

আমি এবার একটু উৎসাহিত বোধ করি। খুকুকে জেরা শুরু করলাম।

চিঁড়ে বউদি আসলে মিসেস জয়শ্রী গোস্বামী। ওঁর স্বামী ডঃ রতন গোস্বামী এখানে বছর আষ্টেক আছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল রিসার্চ সেণ্টারে। শ্রীমতী গোস্বামী আকারে বিপুল। সেই তুলনায় ডঃ গোস্বামী নিতান্তই স্লিম। চিঁড়ে বউদি নামটার উৎপত্তি গভীর রহস্যজনক। বহু বছর আগে শ্যামবাজার থেকে আসা এক ফ্রেশম্যান গোস্বামী দম্পতিকে দেখে ভয় পেয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, "ওরে বাপ, গিন্নী ঘাড়ে পড়লে কর্তা চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।" সেই থেকেই চিঁড়ে বৌদি নামটা চালু হয়ে গিয়েছে।

চিঁড়ে বউদির স্বামী এখানকার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট। খুকু বললো, "ইণ্ডিয়ান বেশী নেই, তবু একটা সমিতি রাখা হয়েছে, মাঝে মাঝে দেখাশোনা মেলামেশা হয়।"

খুকুর ফোকসওয়াগেন হু-হু করে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিলো। ডঃ গোস্বামীর বাড়ির বেল টিপতেই যিনি দরজা খুললেন তিনিই যে

চিঁড়ে বউদি তা বুঝতে আমার মোটেই কষ্ট হলো না। চিঁড়ে বউদির মুখে পান। ঠোঁট লাল হয়ে উঠেছে।

মুখের পান সামলাতে সামলাতে চিঁড়ে বউদি স্বচরিতার হাত-দু'খানা জড়িয়ে ধরলেন। "এসো ভাই, এসো। রায়বাঘিনী ননদিনীর যে আজকাল দেখাই নেই! আইবুড়ো মেয়ে হঠাৎ খবরাখবর নেওয়া বন্ধ করলে আমার ভয় হয়, হয়তো কোথাও মন দেওয়া-নেওয়া আরম্ভ হলো।"

"আঃ বউদি কি আরাম! হাত দু'টো আর একটু টিপুন। ভগবান আপনাকে ন্যাচারাল ভানলোপিলো দিয়েছেন," খুকু রসিকতা করে।

আমি ভাবি, এরা তো বিদেশে বেশ জমিয়ে বসে আছে! ঠিক খোঁজখবর নিয়ে কোথায় কোন্ দেশোয়ালী আছে যোগাড় করে বিদেশে স্বদেশের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

চিঁড়ে বউদি বললেন, "সরো স্বচরিতা। তোমরা তো চোদ্দ আনা আমেরিকান হয়ে গিয়েছো। আমি দেশের লোকে শংকরবাবুকে একটু আদর আপ্যায়ন করি।"

চিঁড়ে বউদি আমার দিকে এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন এবং ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "কর্তা সুযোগ পেয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। ওঁকে ডেকে তুলি।"

কর্তাকে তুলে দিয়ে বউদি আবার ঘরে এসে বসলেন। ডঃ রতন গোস্বামীও পিছন-পিছন হাজির হলেন। ভদ্রলোকের মাথায় মাঝারি আকারের টাক পড়েছে, কিন্তু বেশ ধারালো চেহারা। গলায় পৈতে উঁকি মারছে।

স্বচরিতা বললো, "এ তো অষ্টম আশ্চর্য! বউদি, পান কোথা থেকে যোগাড় করলেন?"

"হুঁ হুঁ। বুদ্ধি এবং উদ্যম থাকলে সব হয়," বউদি হুঙ্কার ছাড়লেন।

"না বউদি, তার সঙ্গে গোস্বামীদার মতো একটি শিবতুল্য স্বামীও দরকার।"

বউদি পান সামলাতে সামলাতে বললেন, "লণ্ডনে আজকাল পান আসছে, আমার মাসতুতো বোনের চিঠিতে জানলাম। লণ্ডন থেকে আমাদের এই জায়গা আর কত দূর বলো?"

কর্তা ব্যঙ্গ করলেন, "না, এমন কিছু নয়—মধ্যিখানে আটলান্টিক মহাসাগরটা আর হাজার দেড়েক মাইলের স্থলভাগ!"

"দু'দিন আগে এক ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই গোপনে পানগুলো এসেছে—এখন খেয়ে বাঁচছি। আহা, পানের মতন জিনিস আছে?"

"গত দুদিন ধরে তোমাদের বউদি শুধু পানের পরিচর্যা করছেন—কি করে ওদের দীর্ঘায়ু করা যায় তার গবেষণায় লেগে রয়েছেন।"

রতনবাবু আমাকে বললেন, "আমরা দশ বছর দেশছাড়া। যাবো যাবো করি, কিন্তু খরচের অঙ্কটা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছে, ফিরবো যখন একেবারেই ফিরবো। দেশের লোক দেখলে যে কী আনন্দ হয় কী বলবো। বিশেষ করে আমার স্ত্রীর। একেবারে কলকাতার মেয়ে—বিদেশে দশ বছর থেকেও মানসিকভাবে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলেন না।"

"রক্ষে করো বাপু। আমি মরে গেলেও মেমসায়েব হতে পারবো না। জানেন শংকরবাবু, আজকাল অনেক দেশী বউ এখানে এসে শাড়ি ছেড়ে ফ্রক পরছে—বাড়িতে হাপ প্যান্ট পরে কাজকর্ম করছে।"

সুচরিতা বললে, "বউদি, আপনার গলায় যেন আর একটা মাদুলি বেড়েছে?"

"উঃ। তোমার নজরও বলিহারি। কোথায় কি একটু বেড়েছে, তাও চোখ এড়ালো না," বউদি সস্নেহে বকুনি দেন।

"ওটি এসেছে কামাক্ষ্যা থেকে বাই এয়ার মেল। নাম সতীসাবিত্রী কবচ। সতীসাবিত্রী নারী এই কবচ ধারণ করলে স্বামীর ওপর দুষ্টনারীর নজর পড়ে না।"

ডঃ গোস্বামীর কথায় সুচরিতা মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

বউদি নিজের মাদুলিটা একটু নেড়ে বললেন, "হেসো না বাছা! নিজের স্বামীটি হোক—তখন বুঝবে কত দুশ্চিন্তা। আমার দিদিমা বলতেন—স্বামী না কাঁচের বাসন! নিজের হাতে সাবধানে ধুয়ে মুছে সব সময় আলমারিতে তুলে রাখবে।"

ওরা দু'জনে আবার হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু শ্রীমতী জয়শ্রী গোস্বামী

এবার আমাকে সালিশী মানলেন। "আপনি তো সাহিত্যিক—মানুষের মনের খবর রাখেন, বলুন তো পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করা উচিত ?"

ডঃ গোস্বামী বললেন, "গল্পের পুরুষমানুষদের কখনও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু জীবনের পুরুষমানুষ এবং গল্পের পুরুষমানুষ এক নয়।"

"বাজে-বাজে বোকো না," মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন শ্রীমতী জয়শ্রী গোস্বামী।

কর্তা জানালেন, "ওঁর মেজাজটা ঠিক নেই। ওই খবরটা পড়া পর্যন্ত।"

"কী খবর বউদি ?" সুচরিতা জিজ্ঞেস করে।

কর্তাই উত্তর দিলেন, "মোটা স্ত্রীদের স্বামীদের নাকি ডাইভোর্স করবার সম্ভাবনা রোগা স্ত্রীদের স্বামী অপেক্ষা শতকরা ৮৩.৪ ভাগ বেশী। তারপরেই তো তোমাদের বউদি খাওয়া কমাতে আরম্ভ করেছেন। সকালে মৃদু একসারসাইজ করছেন এবং শাশুড়ীকে চিঠি লিখে এয়ার মেলে সতীসাবিত্রী কবচ আনালেন।"

চিঁড়ে বউদি বললেন, "খুব হয়েছে, এখন স্ত্রীনিন্দা ছেড়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো।"

চিঁড়ে বৌদি এবার আমাদের খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সমস্ত টেবিলটা ছোট বড়ো তিরিশ চল্লিশখানা বাটিতে বোঝাই! তার কোনোটাতে মাছ, কোনোটায় মুরগী, কোনোটায় সন্দেশ, কোনোটায় রসগোল্লা, কোনোটায় পায়েস, কোনোটায় পুডিং।

"একি করেছেন বউদি! এর নাম চা।" খুকু আর্তনাদ করে উঠলো।

"তুমি বাজে বাজে বোকো না। দেশে ফিরে গেলে খেতে পাবে না। এমন দুধ, এমন মাংস কোথায় পাবে ?"

আমাকে বললেন, "সব নিজে তৈরি করেছি। এখানে রান্নার এত জিনিস। কিন্তু খাওয়াবার লোক নেই। সবাই ওজন-ওজন করে উপবাসী হচ্ছে।"

ডঃ গোস্বামী বললেন, "ভাববেন না, আমরা বেশী খরচ করেছি। মুরগীটা এখানে সবচেয়ে সস্তা মাংস—গরীবের খাদ্য। যদি কাউকে বোঝাতে হয়, তার দিনকাল ভাল যাচ্ছে না সে বলে, পয়সাকড়ির এমন অভাব যে শুধু মুরগীর ওপর আছি।"

ওই খাবারের ওপর যথাসাধ্য সুবিচার করে, আমরা আবার বসবার

ঘরে ফিরে এলাম। চিঁড়ে বউদি বললেন, "ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করছি, কবে দেশে ফিরে যাবো।"

"বেশ তো আছেন বউদি, ফেরবার জন্যে এত তড়িঘড়ি কেন? জানেন তো দেশের অবস্থা—বার মাসে তেরো সমস্যা লেগে আছে। এখানে খাওয়া-দাওয়া থাকা-পরার কোনো চিন্তা নেই। দাদাও নিজের মেজাজে কাজকর্ম করছেন।" সুচরিতা বউদিকে রাগাবার জন্যেই বোধ হয় কথাগুলো বলে ফেললে।

"রক্ষে করো ভাই। খাওয়া-পরা মাথায় থাকুক—ভবানীপুরে যেখানে ছিলুম সেখানেই আমাকে ফিরিয়ে দাও।" বউদি এমনভাবে কথাগুলো বললেন, যেন সুচরিতাই ওঁদের ফিরিয়ে দেবার কর্তা।

ডঃ গোস্বামী বললেন, "ওঁর দুটি ভয়—স্বামী এবং ছেলে।"

"ঠিকই তো। স্বামী আর সন্তান ছাড়া মেয়েমানুষের আর কী আছে?" বউদি চ্যালেঞ্জ করেন।

"খোকার তেরো বছর বয়স হয়ে গেল। সেদিন এসে বলে কি না, মা, আমি ডেট করবো। আমাদের ক্লাশের ছেলেরা সবাই ডেট করছে। আমি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত পালটিয়েছি, কিন্তু কতদিন পারবো? আর ওঁকেও আমি বিশ্বাস করি না। ওঁর যত সব বন্ধু কেউ দু'বার ডাইভোর্স করেছে, কেউ তিনবার। এখানে কথায়-কথায় বিয়ে ভাঙে। গাড়ির টায়ার পাল্টাবার মতো এরা বউ পাল্টায়। আর বলিহারি যাই আদালত, তারা কিছুই বলে না!"

জানা গেলো শ্রীমতী গোস্বামী ইন্দোমার্কিন বিবাহের বিশেষ বিরোধী। বললেন, যখন শুনি, "ইণ্ডিয়ান ছেলেরা, শনিবার রাত্রে মেমসায়েবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়।"

"ইণ্ডিয়ান মেয়ে যদি সায়েব ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?" ডঃ গোস্বামী সমস্যাকে আরও পাকিয়ে তুললেন।

এরপর যা শুরু হলো তা মিশ্রবিবাহ সম্পর্কে একটি বিতর্কসভা। বৈজ্ঞানিকের মন দিয়ে ডঃ গোস্বামী বললেন, "তিন রকম বিবাহ হতে পারে। দেশী ছেলের সঙ্গে দেশী মেয়ের, কিংবা পাত্র দেশী পাত্রী মেমসায়েব, অথবা সায়েব পাত্র দেশী পাত্রী।"

"ছি ছি, আমাদের দেশের ছেলে মেমসায়েব বিয়ে করবে তা তুমি ভাবতে পারছো ?" চিঁড়ে বউদি এবার স্বামীর দিকে তেড়ে গেলেন।

"ভাবার প্রশ্ন নয়, যা হচ্ছে তাই বলছি," ডঃ গোস্বামী নিজের পক্ষে সওয়াল করেন। "কিন্তু তুমি রেগে যাবার আগে আমার বক্তব্যটা শোনো। কোনো মেমসায়েবকে বধূ করা মানে—ভারত সংস্কৃতির প্রচারবৃদ্ধি হলো। জিনিসটা ভাবতে তোমার ভাল লাগছে না ? কোনো আমেরিকান নাগরিক পুরোপুরি একজন বঙ্গসন্তানের শাসনের অধীন—তাকে ইচ্ছে করলেই শ্যামবাজার বা শিয়ালদহের বাড়িতে তোলা যায়। আর তুমি তো জানো, যত রকম জয় আছে তার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিজয়ই সবচেয়ে বড়ো। সাধে কি আর সম্রাট অশোক যুদ্ধবিজয় ছেড়ে ধর্মবিজয়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন ? অশোককে যারা নিতান্ত বোকাসোকা ভালমানুষটি ভাবে আমি তাদের দলে নই।"

চিঁড়ে বউদির চোখ ছলছল্ করে উঠলো। তিনি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "কেন তোমরা আমাকে জ্বালাতন করছো ? বিদেশে এসে এই সব হীরের টুকরো ইণ্ডিয়ান ছেলে এক একটি বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী নিয়ে ঘরে ফিরবে, এ আমি সহ্য করবো না। বিয়ে জিনিসটা ছেলেখেলা নয়।"

সুচরিতা বললো, "সমাজে অনেক সময় মৌখিক ভালবাসা থাকে—কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা, সামাজিক প্রীতির সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ সেই সমাজের কাউকে বধূ করতে বা জামাই করতে রাজী আছে কিনা।"

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। জামাই করতে রাজী আছে কিনা, এইটাই বড়ো পরীক্ষা," ডঃ গোস্বামী তাঁর মতামত জানালেন।

চিঁড়ে বউদি খানিকটা কোণঠাসা হয়ে সুচরিতার সঙ্গে চাপাগলায় কী সব শলাপরামর্শ করলেন। তারপর বললেন, "দেশের ছেলেদের মেমসায়েব বিয়ে করতে তো নেহাত কম দেখলাম না। সাংস্কৃতিক বিজয় তো দূরের কথা তারাই সব বউ-এর কথায় উঠছে বসছে। জামাই আর ঘরজামাই এক জিনিস নয়।"

সুচরিতা এবার চিঁড়ে বউদির কথায় সায় দিয়ে বললে, "মেয়েরা যেখানেই যায় সেখানেই তাদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে।

সুতরাং কেউ যদি বলে, এক একটি মেমসায়েব বউ মানে এক একটি সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ, তাহলে খুব ভুল হবে না।"

"অ্যাঁ? তার মানে কোনো জাতকে কব্জা করতে হলে তাদের ছেলেদের জামাই করো। রণকৌশল হিসেবে এটা যাচাই করে দেখা দরকার!" ডঃ গোস্বামী মন্তব্য করলেন।

খুকু বললো, "মেয়েরা শুধু নিজের স্বামীকে নিজের কালচারের দিকে টানবে তাই নয়, সন্তানের মধ্য দিয়ে নিজের কালচারকে পাকাপোক্ত করবে।"

খুকুর এই বক্তব্যের মধ্যে হয়তো কিছু যুক্তি আছে। কিন্তু কথাটা আমার তেমন ভাল লাগলো না। এয়ারপোর্টের সেই আমেরিকান ছোকরার মুখটা ভেসে উঠলো। স্বীকার করছি, খুকুর মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাই বলে সায়েব বিয়ে করার পক্ষে। কোনো ছেলে মেম বিয়ে করলে তেমন গায়ে লাগে না, হাজার হোক কিছু এলো; কিন্তু মেয়ে দেওয়া মানেই তো কিছু হারানো এবং চিরদিনের জন্যে।

খুকু বললো, "বউদি, আপনার সঙ্গে মামার এইটাই শেষ সাক্ষাৎ নয়। মামা এখানে আরও কয়েকদিন থাকছেন, সুতরাং দেখা হবে নিশ্চয়।"

আমার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে এঁরা খবরাখবর রাখেন দেখছি। ডঃ গোস্বামী বললেন, "বুদ্ধিটা ভালই করেছো—বৃদ্ধনিবাসের মধ্যেই ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছো। তবে যখন ইচ্ছে এখানে চলে আসবেন···পায়ে হেঁটে দশ মিনিট।"

চিঁড়ে বউদি বললেন, "ওই বৃদ্ধদের সঙ্গে ওঁর থাকা কেন? আমাদের এখানেই থাকতে পারতেন।"

ডঃ গোস্বামী বললেন, "সুচরিতার মাথায় অনেক ফন্দি আছে তাই আমি আপত্তি করিনি।"

॥ ৪ ॥

ইস্পাতের ফলক পথ নির্দেশ করছে—গোল্ডেন হোম এই দিকে। খুকুর গাড়িটা সেই দিকে মোড় নিলো।

"সোনালীভবন—নামটা বেশ তো", আমি বলি।

খুকু হাসলো। "ওটা একটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা। যৌবন যদি

সবুজ হয়, বার্ধক্য তাহলে সোনালী। কিন্তু সোনার আর এক নাম মৃত্যু—ফসল যখন সোনালী হয় তখন তো ফসল কাটার সময়।"

যা বুঝলাম, গোল্ডেন হোম একটি বৃদ্ধনিবাস। খুকু বললো, "মামা তুমি কোনো বৃদ্ধ-নিবাসে সময় কাটিয়েছ?"

বললাম, "সামান্য কিছুক্ষণ এক নিবাসে গিয়েছিলাম।"

"তাহলে তোমার গোল্ডেন হোম ভাল লাগবে। পশ্চিমে তো যৌবনের জয়—তাই বৃদ্ধনিবাস না দেখলে, তোমার ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

"তুই এখানকার খবর পেলি কী করে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এখানেই তো আজকাল বেশীদিন থাকি আমি। আমার থীসিস তো বৃদ্ধদের জীবন নিয়ে।"

"তাহলে বৃদ্ধরাই তোর গিনিপিগ?"

"তা ঠিক নয়, তবে জীবনের শেষ অধ্যায়টা কেমন তা দেখছি আমি। তোমরাই তো বলো, সব ভালো যার শেষ ভালো।"

খুকুর কাছে জানলাম, এখানকার মেডিক্যাল সেণ্টারে বার্ধক্য সম্পর্কে গবেষণা চলেছে। জেরনটোলজি বিভাগের প্রধান ডক্টর এলিজাবেথ শিপেন। ডঃ শিপেন কাছাকাছি কয়েকটি বৃদ্ধনিবাসের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে তাঁর ছাত্র এবং সহযোগীরা 'এজিং প্রসেস' সম্পর্কে কাজ করেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করেন।

এই গবেষক দলে আছেন মনস্তাত্ত্বিক, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ফিজিওলজিস্ট এবং আরও অনেকে। সমাজজীবন সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধানই আজকাল নাকি নৃতত্ত্ববিদ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। খুকু হাসতে হাসতে বললো, "মামা, ভারতবর্ষেই তোমরা অ্যানথ্রপলজিস্টদের দাম দাও না। পৃথিবীর সর্বত্র এখন মানুষকে বোঝবার জন্যে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের ডাক পড়ছে। এই যে ডঃ শিপেন, ওঁর গবেষণা ডাক্তারিসংক্রান্ত, কিন্তু আমাদের বিভাগের সাহায্য সর্বদা নিচ্ছেন। আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করছি। মানুষ তো 'সামাজিক জন্তু'—তাকে আলাদা করে চিকিৎসা করা যায় না। মানুষকে পুরোপুরি জানতে গেলে তার পরিবেশও জানতে হয়।"

"তা তুই এখানে কী করিস?" আমি জানতে চাই।

"আমি তো তিনমাসের ওপর এখানে আসা-যাওয়া করছি। এবার

কিছুদিন পাকাপাকিভাবে থেকে যাবো। আমার একটা ডেজিগনেশন আছে—শুধু গবেষক বললে এখানকার লোকরা বিরক্ত হতে পারে। আমাকে এখানে 'সোশ্যাল অ্যাসিসটেন্ট' বা সামাজিক সহকারী বলা হয়।"

"সে আবার কী জিনিস ?"

"আমার কাজকর্ম অনেক মামা। তোমার শাহাজান হোটেলের স্যাটা বোসের চাইতে আমি নেহাত কম যাই না। নিজের চোখেই দেখবে। স্যাটা বোসও একজন আছে। তার অ্যাপার্টমেন্টেই তুমি থাকবে। আমি থাকবো আমার রুমে।"

গোল্ডেন হোমকে আসলে একটা হোটেল বলতে পারো, মামা। একটু আলাদা ধরনের হোটেল এই যা। এখানে থাকতে হলে অন্ততঃ ৬৫ বছর বয়স হওয়া চাই। তার কমবয়সীদের এই দেশে বৃদ্ধ বলা হয় না," হোমের মধ্যে গাড়ি ঢোকাতে ঢোকাতে সুচরিতা খবরটা দিলো।

গাড়ির আওয়াজে কয়েকটা মাথা নড়ে উঠলো—তারপর তাদের দৃষ্টির ফোকাস নিবদ্ধ হলো আমাদের গাড়ির দিকে। এঁরা সবাই টুপি পরে, লাঠি হাতে গোটা কয়েক বেঞ্চিতে গাছের তলায় বসে আছেন।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে প্রায় সব ক'টা মাথা আবার স্বস্থানে ঘুরে গেলো। খুকু বললে, "ছুটির দিনে এঁরা এমনি করেই গাড়ির আওয়াজের জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন। আমার গাড়ির জন্যে নয়, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতীক্ষায়। কিন্তু ভয়ানক আত্মসম্মান জ্ঞান, কিছুতেই নিজেদের উৎকণ্ঠা অপরের কাছে প্রকাশ করবেন না।"

একটা মাথা তখনও আমাদের দিকে ঘোরানো রয়েছে। খুকু বললো, "নিশ্চয় মিস্টার রাইট। উনি আমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছেন।"

খুকু গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে মিষ্টি হেসে বললো, শুভ "অপরাহ্ণ টম কাকা। আপনাকে আজ চার্মিং দেখাচ্ছে !"

মিস্টার রাইট হাতের টুপিটা নাড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। বললেন, "তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সময় পেলে একবার এসো।"

"নিশ্চয়, খুকুর উত্তর থেকেই বুঝলাম সে এই বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে বেশ পরিচিত। হোমের ম্যানেজার মিসেস টমলিনকে দেখা গেলো না।

ভদ্রমহিলা পাশকরা নার্স। খুকু জানালো, "উইক-এণ্ডে মিসেস টমলিনকে পাওয়া যায় না। ওঁর বয় ফ্রেণ্ড-এর সঙ্গে শিকাগোতে বেড়াতে যান।"

"কত বয়স ভদ্রমহিলার?"

"বালিকা নন, পঞ্চাশের একটু ওপরেই হবেন। ইদানীং যার সঙ্গে তিনি ভাবের আদান-প্রদান করছেন তিনি একজন লরি ড্রাইভার। হয়তো বিয়ে-সাদি লেগে যেতে পারে, যদি ড্রাইভার ভদ্রলোক তাঁর বর্তমান বউকে ছাঁটাই করতে পারেন। ভদ্রলোক একটু সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, কারণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নাকি অন্য কারুর সঙ্গে প্রণয় করেন। হাতে-নাতে ধরতে চান স্ত্রীকে, তা হলে ডাইভোর্সের খরচ কম লাগে। না হলে, নিজে ধরা পড়লে—অনেক টাকার ব্যাপার এবং স্ত্রীকে মাস-মাস খোরপোষ দিতে হবে, যাতে মোটেই আগ্রহ নেই ভদ্রলোকের।"

"তুই তো অনেক খবর রাখিস," আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

"মিসেস টমলিন যে আমাকে সব বলেন। ওঁর প্রথম স্বামী ছিলেন মিলিটারি ট্রাক ড্রাইভার— হনলুলুতে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। মাইনে ছাড়া মিসেস টমলিন স্বামীর জন্যে বৈধব্যভাতা পান। বিয়ে হয়ে গেলে মোটা টাকা পেনসন কমে যাবে, সেই এক চিন্তা। শনিবারে ট্রাক সমেত মিসেস টমলিনের ছেলে-বন্ধু এখানে হাজির হন—বান্ধবীকে ট্রাকে তুলে নেন। শিকাগোতে ট্রাক খালি করে দু'জনে একটু আনন্দ করেন, তারপর রবিবার গভীর রাত্রে কিংবা সোমবার ভোরে মিসেস টমলিনকে ফেরার পথে নামিয়ে দিয়ে ট্রাক আবার চলে যায়।"

গোল্ডেন হোমের বাড়িটা তিনতলা—গোটা পঞ্চাশেক ঘর। ওদিকে আর একটা বাড়ি সামান্য একটু ছোট। লিফটে তিনতলায় উঠে খুকু নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো—ব্যাগ থেকে চাবি বার করলো। বললো, "এই অংশটায় কর্মীরা থাকে—অর্থাৎ সেইসব কর্মী যাঁদের সংসারের টান নেই। সংসারী লোককে কেউ এখানে আলাদা মেসে রাখতে পারবে না। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কাজ করে বিকেলের ট্রেনে বাড়ি ফেরা কলকাতাতেই সম্ভব—এখানে লক্ষ টাকা দিলেও কেউ রাজী হবে না।"

"আমাদের দেশে ঘরসংসারটা হাতের পাঁচ—টাকা যোগাড় করা

ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। এখানে সংসারটা অত সহজ নয় দেখছি," আমি বলি।

"মোটেই সহজ নয়। কারণ, এখানে মেয়েরা ভাত-কাপড়ের জন্যে বিয়ে করে না। রোজগার স্বামীও করবে, স্ত্রীও করবে। সেক্স ? সে তো বিয়ে না করলেও পাওয়া যায়—সুতরাং ভাত-কাপড় ও সেক্সের জন্যে এদেশে কেউ বিয়ে করে না। বিয়েটা সিরিয়াস ব্যাপার—বিয়ে হয় কমপ্যানিয়ন-শিপের লোভে, সান্নিধ্যের জন্যে। যে লোক সান্নিধ্য দিতে পারে না, বিয়ের বাজারে তার দাম নেই ; বিবাহিত হলেও সে বিয়ে রাখতে পারবে না।"

ঘরের মধ্যে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে আমরা দু'জনে আবার বেরিয়ে পড়লাম। খুকু বললো, "এই যে হোমের পঞ্চাশখানা ঘর দেখছো এর অর্থ অন্ততঃ পঞ্চাশখানা নাটক সবসময় অভিনীত হচ্ছে। ঈশ্বর এই জাতকে দীর্ঘায়ু করেছেন, মানুষ আরও বেশীদিন বাঁচছে, কিন্তু সবসময় সেটা সুখের নয়।"

"সুখের নয় কী রে! বাবা-মা বেঁচে থাকাটা সন্তানদের পক্ষে মস্ত আশীর্বাদ!"

"ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে গেলে বাবা-মায়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক থাকে না এখানে। ছেলেরা তখন নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।"

"বাবা-মা সংসারে থাকলে কি মহাভারতের অশুদ্ধি হয় ?" আমি জানতে চাই।

"পশ্চিমী সভ্যতায় এই ব্যবস্থা এখন অচল। পরিবার বলতে শুধু স্বামী স্ত্রী এবং ছেলেপুলে—এছাড়া আর কেউ সংসারে পাকাপোক্ত থাকবার অধিকারী নয়। থাকলে সেটা আশ্চর্য ব্যাপার।"

আমি সুচরিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে বললো, "ব্যাপারটা ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরছে। ছেলে বড়ো হলেই আলাদা ঘর ভাড়া নেবে। তারপর বিয়ে করে। আলাদা সংসার হয়। মাঝে-মাঝে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা হয়—ফোনে কথা চলে। তারপর সেই সময়টুকুও থাকে না। বাবা মা শেষ পর্যন্ত নিজের সংসার তুলে দিয়ে বৃদ্ধনিবাসে ওঠেন এবং মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করেন। এদের ছেলেরাও বড়ো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তারাও একদিন সংসার ছেড়ে চলে যায়, বিয়ে করে, নতুন সংসার পাতে। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—এইভাবেই চলেছে। ভালমন্দ জানি না, আজকের

সভ্যতায় সমস্ত দেশে ক্রমশঃ এই অবস্থা নাকি হতে বাধ্য। আমাদের হাই-সোসাইটিতে নাকি আজকাল বাবা-মা'রা ছেলেদের কাছে থাকছেন না।"

"হাই-সোসাইটি মাথায় থাকুন," আমি বলি।

করিডর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে খুকু বললো, "মানুষের সংস্কৃতি যখন মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়, তখন যে কি সব সমস্যা সৃষ্টি হয় তাই আমার গবেষণায় কিছুটা দেখাবো। মানুষের সংস্কৃতি বৃদ্ধকে সংসারের কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তাকে নিঃসঙ্গ করে তুলছে; অথচ এই সময় তার সবচেয়ে বেশী সাহায্যের প্রয়োজন। বার্ধক্যকে তো তোমরা দ্বিতীয় শৈশব বলো।"

আমি খুকুর মুখের দিকে তাকালাম। খুকু বললো, "এখানে যে সব বৃদ্ধ দেখবে তাঁরা তো ভাগ্যবান। বহু স্বামী-স্ত্রীর কোনো রোজগার নেই, সময় ফুরিয়ে আসছে। রাষ্ট্রের করুণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। অথচ ওঁদের ছেলেপুলে আছে—তারা মনের সুখে রোজগার করছে এবং নিজের পরিবারের জন্যে খরচা করছে।"

বললুম, "আমার পাকিস্তানী বন্ধু সামসুদ্দিনের কথা মনে পড়ছে। ও বলেছিল, দাদা, এ এক আজব জায়গা। গুরুজনের কোনো সম্মান নেই। এরা মাগকে মা বলে! যে বাড়িতেই যাই, শুনি কর্তা বউকে 'মাম' বলে ডাকছে!"

আমাদের কথায় বাধা পড়লো। করিডরে একজন পরিচারিকার সঙ্গে দেখা হলো। এদেশের ভাষায় জেনিটর। সে বললো, "মিস্ চ্যাটার্জি, আপনি একবার ২১০ নম্বর ঘরে যাবেন? ওখানে মিসেস ডিক বড্ড জ্বালাতন করছে, আমাকে ঘর পরিষ্কার করতে দিলো না।"

সুচরিতা হেসে বললে, সে যাচ্ছে। পরিচারিকা সামান্য শিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলা। মাথা চাপড়ে বললো, "ওঃ মিস্, কেন যে তোমরা এই বুড়ীগুলোকে হোমে নাও। বুড়োগুলো অনেক শান্ত ও ভদ্র, কিন্তু এই বুড়ীগুলো আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে ছাড়ে। তোমায় বলছি মিস্ চ্যাটার্জি—ওয়ান বুড়ী ইজ ইকোয়ালটু তিনটে বুড়ো। এক একটি থাণ্ডারিং নুইসেন্স।"

দুশো দশ নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে খুকু বললো, "তুমি এখানে অপেক্ষা করো।"

দরজায় বেল পড়তেই, ভিতর থেকে খ্যান-খ্যান গলায় উত্তর এলো, "যদি ঘর পরিষ্কারের ব্যাপার হয় তাহলে আমি তো বলে দিয়েছি আমি ইন্টারেস্টেড নই।"

সুচরিতা বললো, "না, আমি মিস্ চ্যাটার্জি। এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

গলার স্বরে সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তন। "আঃ, তুমি! বলবে তো। ভিতরে এসো।"

সুচরিতা দরজা সামান্য খোলা রেখে ভিতরে ঢুকে গেলো। বিছানার ওপর উঠে বসে মিসেস ডিক বললেন, "আমার একটা চিঠি পাওয়া যাচ্ছে না—আমার নাতনী লিখেছিল। নিশ্চয় ওরা ফেলে দিয়েছে। খুবই জরুরী চিঠি।"

সুচরিতা মিসেস ডিককে শান্ত করবার চেষ্টা করলো। "আপনার চিঠি আমি একটু খুঁজে দেখবো?"

"দেখো। কিন্তু কোথায় পাবে?" ছেলেমানুষের মতো মিসেস ডিক মন্তব্য করলেন।

খুকুর বোধ হয় ম্যাজিক জানা আছে। বিছানার গদির তলায় হাত দিয়েই একখানা চিঠি বার করে ফেললো। "এই চিঠিটার কথা বলছেন?"

"ও ডিয়ার ডিয়ার। দেখো তো, কোথায় চিঠিটা রেখেছিলাম।" মিসেস ডিক এবার বেশ নরম হয়ে গেলেন। বললেন, "জানো, আজকাল চোখে তেমন দেখতে পাই না। তুমি সময় পেলে একটু এসো, আমার নাতনীকে একটা চিঠি লিখে দেবে—আমি বলে যাবো।"

খুকু বললো, "নিশ্চয়"। এবার খুকু আমার কথা তুললো। মিসেস ডিক বলে উঠলেন, "তোমার মামা? আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন! এখনই নিয়ে এসো।"

আমি ঘরে ঢুকে ওঁকে নমস্কার করলাম। বৃদ্ধা মিসেস ডিকের শরীর শীর্ণ। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে—মাথার সমস্ত চুল শাদা হয়ে গিয়েছে। চোখে মোটা পাওয়ারের চশমা—তবু ভাল দেখতে পান না।

মিসেস ডিক বললেন, "ইণ্ডিয়া? ক্যালকাটা? যেখানে রায়ট হয় তো?"

"হ্যাঁ, কয়েকবার রায়ট হয়েছে কলকাতায়—তবে রায়ট ছাড়াও অনেক

কিছু হয়, আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। বিদেশে সাধারণ মানুষের কলকাতা সম্পর্কে ধারণার কথা ভাবলে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে।

"দেখ তো, আমি তাই ভাবি—একটা শহরে শুধু রায়ট হয় কী করে? ট্রাভেল এজেন্ট আমাদের ঠকিয়েছে। আমার স্বামী ও আমি ক'বছর আগে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। আমাদের সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল, ওয়ার্লড ট্যুর করা—সেই জন্যেই টাকা জমাচ্ছিলাম। ব্যাংককের পর আমাদের কলকাতায় নামবার কথা ছিল। কিন্তু এজেন্ট ব্যাংককে খবর দিল কলকাতায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। আমাদের যাওয়া হলো না—রেমণ্ড ভয় পেয়ে ইণ্ডিয়াতে গেলো না—আমরা সোজা করাচি হাজির হলাম।"

মিসেস ডিক দুঃখ করতে লাগলেন, রেমণ্ড বেঁচে থাকলে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হতো।"

স্বামীর কথা বলতে গিয়ে মিসেস ডিকের চোখ সজল হয়ে উঠলো। নিজের হাতব্যাগ খুলে একখানা ছবি বার করে ফেললেন। "আমাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে তোলা। আমাদের পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি আমাদের টাউনের মেয়র। অমন একজন নামকরা লোক নিজে এসেছিলেন আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে।"

মিসেস ডিক উত্তেজনায় চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। তারপর বললেন, "আমাদের বিয়ে এই তো সেদিনের কথা! তোমাকে ফটো দেখাচ্ছি।"

মিসেস ডিকের হাতটা কাঁপছে—সে অবস্থায় হাতব্যাগটা আবার খুললেন। ওঁর সমস্ত মূল্যবান সম্পদ ওই ব্যাগের মধ্যেই রেখে দিয়েছেন। ব্যাগ থেকে ছবিটা বেরুলো; ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে উঠলেও ডিক দম্পতিকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। বয়সকালে সত্যি সুন্দরী ছিলেন ভদ্রমহিলা।

শ্রীমতী ডিক বললেন, "গোল্ডেন জুবিলির দিনে, ঘরের মধ্যে একলা আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে এই ছবিটা দেখেছিলাম। ছবিটাকে প্রশ্ন করেছিলাম, এখন আমরা পরস্পর সম্বন্ধে যা জানি, তা যদি পঞ্চাশ বছর আগে তোমরা এই ছবি তোলার দিনে জানতে, তাহলে তোমরা কী করতে? বিশ্বাস করবেন না, মিস চ্যাটার্জি—ছবিটা যেন নড়ে উঠলো। বললো, আমরা যা করেছি ঠিক তাই করতাম, বিয়ে করতাম।"

শ্রীমতী ডিকের গলা এবার কাশিতে ডুবে গেলো। কাশির ধাক্কা সামলে রুমালে মুখ মুছে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর বললেন, "আমার স্বামী বলতেন, বুড়োবয়সে শুধু শুনতে হয়—একদম কথা বলতে নেই। যে-বুড়ো কথা বলে তাকে লোকে সহ্য করতে পারে না। আমি শুধুই বকে যাচ্ছি।"

"মোটেই না। আপনার কাছে শোনবার জন্যেই তো আমরা এসেছি।"

মিসেস ডিক বললেন, "রেমণ্ড ছাড়া আমাকে যে বেঁচে থাকতে হবে তা কোনোদিন কল্পনা করিনি। যে লোক আমাকে ছাড়া এক সপ্তাহ থাকতে পারতো না সে কেমন চলে গেলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বেচারা বেশীদিন ভোগেনি। প্রথমে খুব কষ্ট হয়েছিল। আমার ছেলের কোলে মুখ রেখে খুব কেঁদেছিলাম। তারপর কেমন সাহস বেড়ে গেলো। এখন ভাবি, রেমণ্ড আগে না গেলে মুস্কিল হতো। বেচারা কখনও সংসার সামলে একলা থাকতে পারতো না।"

ছবি দুটো ব্যাগের মধ্যে পুরে মিসেস ডিক বললেন "আপনাদের দেশে বাপ-মা'রা তো ছেলের সংসারেই থেকে যান, তাই না ?"

"আজ্ঞে হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ পরিবারে তাই তো হচ্ছে। শৈশবটা যেমন বাবা-মায়ের দায়িত্ব, বার্ধক্য তেমন সন্তানের দায়িত্ব—কোটি কোটি লোক এখনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বাবা-মা'র ঋণ কখনও শোধ করা যায় না।"

মিসেস ডিক হাসবার চেষ্টা করলেন। ওঁর মুখটা বেশ করুণ হয়ে উঠলো। "আমাদের দেশে সে তো আর সম্ভব নয়। আমরা সবাই যে স্বাধীনতা ভালবাসি। তবু এক এক সময় মনে হয় আপনারাই বুদ্ধিমানের কাজ করছেন। নিঃসঙ্গতাই বৃদ্ধ বয়সে সবচেয়ে কষ্ট দেয়।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। শ্রীমতী ডিক বললেন, "আমাদের বাড়িটা ছবির মতো সাজানো ছিল। সেই হোম ছেড়ে এই 'হোম'-এ আসবার কথা এক বছর আগেও আমি ভাবতে পারতাম না। নিজের সংসার নিজে গুছোতে গুছোতে সমস্ত দিন কেটে যেতো। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সামান্য যা টাকাকড়ি আছে, তাতে বাকি কটা দিন

কোনোরকমে চলে যেতো। কিন্তু বিশ্রী বাত রোগে ধরলো। বাইরে বেশ সুস্থ আছি, কিন্তু এক একদিন এমন হয়, হাত-পা নাড়তে পারি না। কে বাড়ি পরিষ্কার করবে? কে দোকানে যাবে? কে রাঁধবে? তার থেকেও বড়ো কথা, যদি শরীর খারাপ করে, বা কিছু হয়, কে বাইরের জগৎকে খবর দেবে? আমার পাশের বাড়ির মিসেস শিলারকে দেখে আমার ভয় হলো, একা থাকবার সাহস নষ্ট হয়ে গেলো। মিসেস শিলার তিন দিন মরে পড়েছিলেন। তিন দিনের দিন কোনো খবর না পেয়ে আমি ফোন করলাম—ফোনে কোনো উত্তর না পেয়ে পুলিশকে জানালাম। ওরা এসে দরজা ভেঙে ওঁর দেহ উদ্ধার করলো। হঠাৎ কখন হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল কেউ জানতে পারেনি। একলা থাকাটা যে এতো চিন্তার তা আগে কখনও খেয়াল হয়নি। মিসেস শিলার খুব সৌখিন মহিলা ছিলেন, আর তাঁর সমস্ত মুখে কিনা পিঁপড়ে থকথক করছিল!"

কল্পনায় নিঃসঙ্গ বেচারা মিসেস শিলারের জরাজীর্ণ দেহটা ভাববার চেষ্টা করছিলাম। মিসেস ডিক বললেন, "কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে ওঁর ছেলেরা যে ফিউনারালের ব্যবস্থা করেছিল তা রাজকীয়। কোনোরকম কার্পণ্য করেনি। ছয় ছেলেই খবর পেয়ে এসেছিল মায়ের কফিন গোরস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে।"

একটু থেমে মিসেস ডিক বললেন, "আমার বেশ সাহস আছে; কিন্তু গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলেই ভয় হতো—যদিও হাতের কাছেই টেলিফোনটা রাখতাম যাতে প্রয়োজন হলে বিছানায় শুয়ে-শুয়েই টেলিফোন করতে পারি। অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে যে এখন আর মৃত অবস্থায় তিন দিন ঘরে পড়ে থাকবার কোনো দরকার নেই। এখানে সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান হয়েছে একটা—ওখানে নাম রেজিষ্ট্রি করালে তারা প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফোন করবে এবং কোনো খবরাখবর না পেলে বাড়িতে চলে আসবে। কিন্তু তা হলেও তো চব্বিশ ঘণ্টা—মরা অবস্থায় অতক্ষণ পড়ে থাকতে আমার ভাল লাগবে না বলেই তো এই গোল্ডেন হোমে চলে এলাম।"

"এখানে তো বেশ ভালই আছেন।" আমি সান্ত্বনা দিই।

হাসলেন মিসেস ডিক। "হোটেলে থাকা আর নিজের বাড়িতে থাকা

তো এক জিনিস নয়। এখানে এরা এমনভাবে ঘর পরিষ্কার করে আমার পছন্দ হয় না, এদের রান্না আমার ভাল লাগে না। এত লোকের ভিড়ও আমার পছন্দ হয় না। বিশেষ করে এক সঙ্গে এতগুলো বুড়োকে দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—কোথাও যেন একটু সবুজ নেই! আমাদের বাগানে অনেক গাছ—শরৎকালে এইসব গাছের ঝরাপাতা ঝাঁট দিয়ে আমার স্বামী এককোণে জড়ো করতেন—এখানে অনেক শুকনো পাতা জড়ো হয়ে রয়েছে। কুৎসিত দৃশ্য!" মুখবিকৃত করলেন, শ্রীমতী ডিক।

ইতিমধ্যে ঘড়ির এলার্ম বাজতে শুরু করলো। শ্রীমতী ডিক বললেন, "এর মানে আমার ট্যাবলেট খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। এতোবার ওষুধ খেতে হয় যে খেয়াল থাকে না, তাই ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখি। ট্যাবলেট না খেলেই বাতের ব্যথা বেড়ে ওঠে, বড্ড জ্বালায়।"

মিসেস ডিক এবার চিঠির কথা তুললেন। নাতনী মাঝে-মাঝে দিদিমাকে চিঠি লিখে থাকে। ভারী সুন্দরী নাতনী। মিসেস ডিক তাঁর চিঠিটা খুকুকে বলে গেলেন—খুকু আস্তে আস্তে লিখে গেলো এবং পড়ে শোনালো। মিসেস ডিক লিখলেন, গোল্ডেন হোমে খুব আনন্দে আছেন। এখানকার প্রতি মুহূর্ত তিনি উপভোগ করছেন। এই আনন্দ অনেকটা ছোটবেলার আনন্দের মতো—যার মধ্যে কোনো হিসেব নেই, উদ্দেশ্য নেই। গতকাল ছিল তাঁদের বিবাহ বাৎসরিক—বাহান্ন বছর আগে, এই দিনে তিনি বধূ হয়েছিলেন। নাতনী যেন বিবাহিত জীবনে তাঁরই মতো সুখী হয়।"

মিসেস ডিকের ঘর থেকে বেরিয়ে খুকুকে জিজ্ঞেস করলাম, "নাতনীকে নিজের কাছে রেখে পড়াশোনা করালেই পারতেন। ওঁর ছেলের তো আরও ছেলেমেয়ে আছে।"

খুকু বললো, "মিসেস ডিকের নিজের তাই ইচ্ছে ছিল কিন্তু ছেলের স্ত্রীর তা পছন্দ নয়। আজকালকার বাবা-মারা পছন্দ করেন না তাঁদের ছেলেপুলে বুড়োদের সঙ্গে বেশী মিশুক; তাতে নাকি তারা বুড়োটে মেরে যায়—ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধা পায়। অনেক মায়ের চিন্তা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে আঘাত না দিয়ে কেমন করে বাচ্চাকে তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়।"

খুকু বললো, "এইবার আমার কাজ আরম্ভ করে দেবো। যতদূর পারি সবার খবরাখবর নেবো। কারুর কোনো ছোটোখাট সমস্যা থাকলে সাহায্য করবো।"

বারান্দার শেষপ্রান্তে এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখা গেলো। গম্ভীর হয়ে তিনি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন, মাঝে মাঝে লাঠিটা একটু বাড়াচ্ছেন। এই গম্ভীর বিষণ্ণমূর্তি কোনো ভাস্কর দেখলে খুশী হতেন—রোঁদার থিংকারের মতো বার্ধক্যের একটা চমৎকার রূপ সৃষ্টি করতে পারতেন। আমি ফিসফিস করে খুকুকে বললাম, "আহা বেচারি! বোধ হয় কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছিলেন। ভেবেছিলেন কেউ আসবে।"

খুকু বললো, "ভদ্রলোকের অতোটা নিঃসঙ্গবোধ করার কারণ নেই, এখানে সস্ত্রীক বসবাস করেন।"

"গুড ইভনিং, মিস্টার ডুগান। প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছেন কেমন?" খুকু ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে।

"ইয়ং লেডি, শুভ সন্ধ্যা। আমি কিন্তু মোটেই প্রকৃতিকে উপভোগ করছি না। আমি স্ত্রীর ব্যবহারে তিতবিরক্ত হয়ে এখানে বসে আছি।"

খুকু দুঃখ প্রকাশ করলো। জানালো, এই হোমে তাঁরা আদর্শ দম্পতি বলে পরিচিত, সুতরাং তাঁদের মধ্যে কোনোপ্রকার বাকবিতণ্ডা অভিপ্রেত নয়।

"আমাকে আজ থেকে আলাদা একটা ঘর দাও, বুড়ীর সঙ্গে আমি থাকবো না। আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছে—বিকেলবেলায় আমি গায়ে সোয়েটার রাখবো কিনা তা উনি ঠিক করবেন। খাবার সময় খিটখিট করবেন। আমার কোনো স্বাধীনতা নেই—পেরেমবুলেটরের বেবির সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্য নেই। এনাফ ইজ এনাফ—অনেক হয়েছে, আর নয়। তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও—ওখান থেকে গোপনে আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আমার ঘর থেকে যত খুশী ফোন করুন—কিন্তু এতোলোক থাকতে উকিলের সঙ্গে কথা বলবেন কেন?"

"ইয়ং লেডি, তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলতেই হচ্ছে—আমার ওয়াইফ নামক স্ত্রীলোকটি আজ আমাকে মেরেছে। আমার যদি সমস্ত

দেহে বাতের যন্ত্রণা না থাকতো তা হলে আজ তোমাদের হোস্টেলে রক্তারক্তি হয়ে যেতো। একথাও তোমাকে বলে দিই, পঁচিশ বছর আগেও আমি একবার ডাইভোর্সের চিন্তা করেছি।"

খুকু দেখলো, বৃদ্ধ মিস্টার ডুগানের রাগ কিছুতেই কমছে না। এঁকে একলা রেখেই আমরা এগিয়ে চললাম। বৃদ্ধ হলে অনেকে সত্যিই শিশু হয়ে যায়।

শ্রীমতী ডুগানের দরজার সামনে এবার বেল পড়লো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। খুকু এক মুখ হেসে শ্রীমতীকে নমস্কার জানিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো স্বামী কোথায়? শ্রীমতী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, "ওই বুড়োটার কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আদালতের জজ ছিল, কিন্তু এখন ওঁকে কয়েদিদের ইস্কুলে পাঠানো দরকার—সেখানে ওকে চড়চাপড় মারা প্রয়োজন।"

খুকু অপ্রস্তুত। শ্রীমতী ডুগান বললেন, "আপনাদেরও বলিহারি। হোমের আভিজাত্যের দিকে একটুও নজর নেই, যে-কেউ পয়সা দিলেই তাকে হোমে ঢোকাচ্ছেন। আমি প্রেসিডেন্টকে লিখবো। আমার ছেলেকেও ফোন করছি—এখানে যদি ওই মিসেস সিম্পসন থাকেন, তাহলে আমাকে চলে যেতে হবে।"

"মিসেস সিম্পসন!" খুকু বুঝবার চেষ্টা করে।

"হ্যাঁ, ওই যে মহিলা, এখনও উনিশ বছরের ছুঁড়ির মতো ন্যাকা-ন্যাকা ব্যবহার করেন। বৃথাই ওঁর স্বামী দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। আপনি দেখেছেন, স্ত্রীলোকটির জামা-কাপড়, চাল চলন, মেক-আপ? মনে হবে প্রথম হনিমুনে বেরোচ্ছেন! দেখে কে বলবে, ছ'মাস আগে বিধবা হয়েছেন।"

খুকু চুপ করে কথা শুনে যায়।

মিসেস ডুগান বললেন, "তা তোমার ভীমরতি ধরেছে, তুমি যা খুশী করো গে যাও! যতক্ষণ ধরে মনে চায় মেক-আপ করো। কিন্তু তা বলে অন্যের ঘর ভাঙতে দিচ্ছি না।"

"ব্যাপারটা কী?" খুকু জানতে চায়।

"তোমাকে বলতে লজ্জা নেই—আমার স্বামীটির মতিগতি ভাল যায়

না—অনেক শাসনে রেখে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওমা! কাল লাঞ্চের পর বিশ্রাম নিচ্ছি—একটু চোখ বুঁজেছি, হঠাৎ দেখি উনি নেই। বেরিয়ে দেখি, উনি বাগানে মিসেস সিম্পসনের সঙ্গে পায়চারি করছেন! আমি কিছু বলিনি। শুধু রাতে ডিনারের সময় মনে করিয়ে দিয়েছিলাম —তুমি অনেক জজিয়তী করেছো কিন্তু মানুষের মন সম্বন্ধে কিছু জানো না। বেচারা মিসেস সিম্পসন! ওঁকে একলা থাকতে দাও, সবে ছ'মাস হলো বিধবা হয়েছেন। কর্তা কথাগুলো শুনলেন কিন্তু উত্তর করলেন না। ভাবলাম লজ্জা পেয়েছেন। ওমা! আজ দেখি লজ্জার নামগন্ধ নেই—বুড়ো অপেক্ষা করছিল, কখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি। যেমন আমি চোখের পাতা বন্ধ করেছি, অমনি বাগানে মিসেস সিম্পসনের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। আজ কোনো কথা নয়, খপ করে ওঁর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছি। মেয়েমানুষটার দিকে তাকাইনি পর্যন্ত।”

খুকু বললো, “বৃদ্ধ মানুষ, অভিমান হয়েছে-ওখানে একলা বসে রয়েছেন।”

“যেখানে খুশী ও যেতে পারে—নিজে অসভ্যতা করবে, আবার রাগও দেখাবে, তা চলে না,” মিসেস ডুগান সোজা জানিয়ে দিলেন।

এবারের মতো ওঁকে একটা সুযোগ দিন। অভিমান যখন হয়েছে তখন নিজে গিয়ে ডেকে আনুন।” সুচরিতা পরামর্শ দেয়।

“ওই মেয়েমানুষটাও আছে নাকি? তাহলে কিন্তু স্বামী আজ মার-ধোর খাবে, তা তোমায় বলে রাখছি। খুব সামান্য শাসন করে ছেড়ে দিয়েছি আজ।”

“না না, কেউ নেই। আপনার স্বামী একা বসে আছেন।” সুচরিতা জানায়।

“আমি কিছুতেই যেতাম না—শুধু তোমাদের অনুরোধে বুড়ো খোকাকে আনতে যাচ্ছি। তবে তোমরা বলে দিও মিসেস সিম্পসনকে, যেন আমার স্বামীর দিকে নজর না দেন।” মিসেস ডুগান এবার পায়ে জুতো গলিয়ে নিয়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করলেন। চুলটা সামান্য আঁচড়ে, ঠোঁটে একটু লিপস্টিক ঘষে নিলেন। তারপর বার হলেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে।

খুকু বেরিয়ে এসে বললো, "এবার মিসেস সিম্পসন।"

দোতলার এক কোণে তাঁর ঘর। ঘরটা নিজের রুচি অনুযায়ী তিনি সাজিয়েছেন। দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো সারাক্ষণ মনে করিয়ে দেয় যে যৌবনে শ্রীমতী সিম্পসন অসামান্য সুন্দরী ছিলেন।

টেলিভিশন সেট খুলে দিয়ে শ্রীমতী সিম্পসন কেশ পরিচর্যা করছিলেন। মাথায় টোপরের মতো কী একটা লাগিয়েছেন। তারই ভিতরে চুলগুলো নাকি শাসিত হচ্ছে।

সুচরিতাকে দেখে মিসেস সিম্পসন বসতে বললেন। "ছোট্ট মেয়ে, বৃদ্ধদের এই নির্বাসনকেন্দ্র তোমার কেমন লাগছে?"

"বেশ ভালই।"

মিসেস সিম্পসন হাসলেন। বললেন "আমি একটা ফরাসী গল্প পড়েছিলাম। একজন সহিসকে বৃদ্ধ ঘোড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্য সব কর্মচারীরা তেজী জওয়ান ঘোড়ার পরিচর্যা করে, আর এই ছেলেটির ভাগ্যে বৃদ্ধ ঘোড়া। প্রতিদিন ঘোড়াকে সে বেড়াতে নিয়ে যেতো, আর মনে মনে ভাবতো কবে এই বেতো ঘোড়া মরবে এবং সে মুক্তি পাবে।"

খুকু মিষ্টি হেসে বললে, "ঘোড়া আর মানুষ এক নয়, মিসেস সিম্পসন।"

খুকুর পিঠে হাত দিয়ে মিসেস সিম্পসন বললেন, "মানুষকে ঘোড়া থেকেও নিকৃষ্ট বলতে চাও?"

খুকু হাসলো। মিসেস সিম্পসন বললেন, "আজকে কয়েক ঘণ্টা আগেই ওইরকম একটি প্রাণী দেখলাম, তোমাদের হোমে!"

"আমাদের এখানে?"

"হ্যাঁ, আমি মিসেস ডুগানের কথা বলছি। বেচারা মিঃ ডুগান কেমন চমৎকার লোক—সভ্য ভব্য বিচারকের খাসা ব্রেনখানি। এখনও চকচকে ছুরির মতো বুদ্ধি রয়েছে। একজন দার্শনিকের বিছানায় বহু বছর শুয়েছি—সুতরাং আমি জানি কাকে মস্তিষ্ক বলে। পুওর মিঃ ডুগানের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি দুপুরের ঘুমে বিশ্বাস করি না—ওতে ওজন বেড়ে যায়,

ফিগার নষ্ট হয়। দুপুরে কখনও ঘুমিও না বাছা। ফিগার বাদ দিলে মেয়েমানুষের কী থাকে বলো ? তা যা বলছিলাম, লাঞ্চের পরে তাই আমি বাগানে গিয়ে বসি, কখনও ঘুরে ঘুরে ফুল দেখি। মিঃ ডুগান বেচারা সেদিন জিজ্ঞেস করলেন, উনি মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্যে আমার দলে যোগ দিতে পারেন কিনা। আমি বলেছিলাম—অবশ্যই, কারণ আমি মেয়েদের সান্নিধ্যে ইনটেলেকচুয়াল আনন্দ পাই না। সমস্ত জীবন পৃথিবীর সেরা দার্শনিকদের সঙ্গে গল্প করে আমার এই অবস্থা হয়েছে। পুওর মিস্টার ডুগান আমার সঙ্গে গল্প করে খুব আনন্দ পাচ্ছিলেন—বলছিলেন সমস্ত জীবন স্ত্রীর শাসনে থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়নি। ঠিক সেই সময়, সাক্ষাৎ ডাইনীর মতো মিসেস ডুগান হাজির হলেন। কোনোরকম ভদ্রতা নেই, সৌজন্য নেই—চিৎকার করে উঠলো, ডগলাস, এখনই চলে এসো। তোমাকে বলছি মিস চ্যাটার্জি, লোকে কুকুরকেও ওইভাবে ডাকে না। বেচারাকে হিড় হিড় করে টানতে লাগলো, আর পুওর মিঃ ডুগান বাতের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলেন।”

“আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলেননি ?” খুকু জানতে চায়।

“কথা ! আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি একটি ডাইনী, মন্ত্রবলে ওর স্বামীটিকে নিজের অধীনে আনছি। ফুঃ! জানে না, আমার এমনই ব্যক্তিত্ব যে, পুরুষমানুষ দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যায়! এখানের এই হোমে কে না আমার সঙ্গে ভাব করতে চায় ? আমি কিন্তু যার তার সঙ্গে কথা বলতে পারি না।”

খুকু বললো, “বেচারা মিস্টার ডুগানের খারাপ সময় চলছে।”

“কেন ?” মিসেস সিম্পসন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

“উনি এতোক্ষণ বাইরে চুপচাপ বসেছিলেন,” সুচরিতা জানায়।

“এঁ্যা! মেয়েমানুষটা ওঁকে বার করে দিয়েছে ? না উনিই রাগ করে বেরিয়ে গিয়েছেন ?” মিসেস সিম্পসন জানতে চান।

“উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। মিসেস ডুগানকে বোঝানো হয়েছে, উনি স্বামীকে আবার ফিরিয়ে আনতে গিয়েছেন। এখনকার মতো মিটমাট”, খুকু জানায়।

“পুওর ডগলাস। মিটমাট ছাড়া ওঁর উপায় নেই, নিজের সমস্ত

টাকাকড়ি বৌ-এর নামে। মেয়েমানুষটা কায়দা করে সব হাতের মধ্যে রেখেছে—ইচ্ছা থাকলেও ডাইভোর্স করতে পারবেন না।"

খুকু আমার সঙ্গে মিসেস সিম্পসনের আলাপ করিয়ে দিলো। মিসেস সিম্পসন বললেন, "আমার স্বামীর সঙ্গে আপনাদের দেশের অনেক দার্শনিকের পত্রালাপ ছিল। রাধাকৃষ্ণণ আমার স্বামীকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন।"

দর্শনের কথাবার্তার পর পারিবারিক খবর পেলাম। ওঁর দুটি ছেলে নিজেদের ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে-মাঝে তারা ফোন করে, কখনও বা দেখতে আসে। যেদিন দেখতে আসে সেদিন মিসেস সিম্পসনের কি আনন্দ! ছেলে, ছেলের-বৌ নাতিকে নিয়ে কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। পাশের অনেক ঘর থেকে উঁকি-ঝুঁকি শুরু হয়ে যায়। সবাই তো সমান ভাগ্যবান নয়।

পাশের ঘরে মিসেস সাইমন আছেন। তিনি মুখ চুন করে বাইরে বসে থাকেন। আর বন্ধুদের মিথ্যে কথা বলেন, তাঁর ছেলে নাকি প্রায়ই তাঁকে ফোন করে, খবরাখবর নেয়, চিঠি লেখে।

মিসেস সিম্পসন বললেন, "সব মিথ্যে কথা। তিন মাসে বুড়ীর একটা টেলিফোন বা চিঠি আসে কিনা সন্দেহ, অথচ এমন ভাব করে যেন একদিন ছাড়াই ছেলেরা খবরাখবর নিচ্ছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে খুকু বললো, "মামা, এইটাই এদেশে স্বাভাবিক! 'জেনারেশন গ্যাপ' কথাটা শুনেছো নিশ্চয়—এখানে একবয়সী লোকের সঙ্গে অন্য বয়সী লোকদের অনেক দূরত্ব। সবাই এক একটি দ্বীপের মতো। দূরত্ব আমাদের দেশেও আছে, কিন্তু এমন নয়। এখানে ছেলে-ছোকরারা বুড়োদের সঙ্গে মিশতে চায় না—তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়। বুড়োদের সম্বন্ধে তাদের কোনো আগ্রহ নেই!"

"অথচ বৃদ্ধরাই তো এই দেশ গড়ে তরুণদের হাতে তুলে দিয়েছেন", আমি বলি।

"সে কথা কে মনে রাখে? বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে—প্রতি একশ জনের মধ্যে দশ জনের বয়স পঁয়ষট্টির বেশী। সুতরাং দু কোটির মতো বৃদ্ধ এইভাবে আরও বৃদ্ধ হচ্ছেন, আর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

খুকু বললো, "এই বয়সে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের ওপর খুব বেশী নির্ভর করেন। কারণ ভাবের আদান প্রদানের জন্যে আর কেউ তেমন থাকে না—পরিচিত বন্ধুরা দেহ রাখেন বা দূরে চলে যান, অফিসের লোকরা খবরাখবর নেয় না, ছোট নাতি-নাতনী ছাড়া আর কেউ খুব কাছে আসে না। সব থেকেও কিছু থাকে না! আমাদের এখানেই এক জনের কাছে যাবো। মিস্টার পার্কার! ভদ্রলোকের সব থেকেও কিছু নেই। আমাকে বলেছিলেন, আমার বাড়ি আছে কিন্তু পরিষ্কার করতে পারি না; আমার গাড়ি আছে, কিন্তু চালাতে সাহস করি না—চোখে কম দেখি। এমন কি দোকান যেতে গেলেও কারও শরণাপন্ন হতে হয়—এক সঙ্গে বেশী জিনিস আনতে পারি না।"

খুকু বললো, "এ-দেশে বুড়ো বয়সে যে অনেকে আবার বিয়ে করে তার প্রধান কারণ বন্ধুত্বের প্রয়োজন। মিস্টার পার্কার এখানে একা একা থাকতেন। পাশের ঘরেই ছিলেন—মিসেস নোড। এখানেই প্রেম, তারপর কয়েকদিন আগে বিয়ে হয়েছে। আমাদের দেশ হলে হাসাহাসি পড়ে যেতো, কিন্তু এখানে লোকে বলবে, ভালই হয়েছে। এই বয়সে কে ওঁদের দেখবে?"

পার্কার দম্পতির সঙ্গে ওঁদের ঘরের দরজার মুখেই দেখা হয়ে গেল। খুকু ওঁদের অভিবাদন জানালো। নববিবাহিতার সলজ্জ হাসিটুকু মুখে ছড়িয়ে নতুন শ্রীমতী পার্কার স্বামীর হাত ধরেছেন। স্বামীকেও বেশ চকচকে দেখাচ্ছে—বিয়ে উপলক্ষে এঁরা নতুন জামা-কাপড় করিয়েছেন। খুকু জিজ্ঞেস করলো, "হনিমুন থেকে কবে ফিরলেন?"

মিঃ পার্কারের উত্তর থেকে জানা গেল গতকালই ফিরেছেন মধুযামিনী শেষ করে। হনিমুন করতে ওঁরা গিয়েছিলেন ওমাহার কাছে ছোট্ট গ্রাম্য হোটেলে। "ও, অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল," শ্রীমতী জানালেন।

মিস্টার পার্কার বললেন, "আরও আনন্দের হতো যদি না শেষের দিকে আমার হাঁপানিটা চাগিয়ে উঠতো। আমার পুওর ডার্লিংকে বড়ো কষ্ট পেতে হলো! এখন নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে দেখাবার জন্যে।"

মিসেস পার্কার বললেন, "পরে এসো, তোমাকে আমাদের বিয়ের

ছবি দেখাবো। আর দেখাবো নাতি-নাতনীদের চিঠি। আমাদের বিয়ে উপলক্ষে কি মিষ্টি চিঠি লিখেছে ওরা।"

ওঁরা চলে যেতে খুকু বললো, "এদেশের নার্সিং হোম আর আমাদের দেশের নার্সিং হোম এক নয়। আমাদের দেশে নার্সিং হোম মানে প্রাইভেট হাসপাতাল। এখানে হাসপাতালে চিকিৎসার পর, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে নার্সিং হোমে পাঠানো হয়। এখানে নার্স থাকেন, ডাক্তারও আসেন—তবে নার্সিংটা বড়ো কথা। আমাদের এই হোমের সঙ্গে নার্সিং হোম রয়েছে। এতে গবেষণার সুবিধা হয়—এবং যাঁরা থাকেন তাঁদেরও সুবিধে। কারণ শরীর সুস্থ না থাকলে কোনো লোককে ওল্ড হোমে রাখা হয় না, সোজা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে চালান করে দেওয়া হয়। বুড়ো বয়সে শরীর সবসময় সুস্থ থাকবে এ কথা কে বলতে পারে ?"

খুকু বললো, "বুড়ো বয়সের বিয়ে আমার বেশ মজা লাগে। বর বউ-এর জন্যে মায়া হয়। আর ভাবি এদেশের চরিত্রের কথা। এদেশের মানুষ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ থেকে অনেক শক্ত—মনটা সহজে ভেঙে যায় না। বুড়ো বয়স বলে চোখের জল ফেলে না, নিজের সুযোগ অনুযায়ী জীবনের আনন্দ আহরণ করে নেয়।"

"না বাপু, তাজুদি বুড়ো বয়সে বিয়ে পছন্দ করেন না, সেই জন্যেই তো তোমার বিয়ের জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছে না। আমাকে বার-বার বলেছেন একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে।"

আমার উত্তরে খুকুর মুখে হাসি খেলে যায়। "ওমা, তুমি আমাকে বুড়ী বানিয়ে দিচ্ছো—সবে না তেইশ শেষ করেছি! তোমার এবং মার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।"

"তোমার মায়ের একটি ছড়া শুনলেই জজ মামলা ডিসমিস করে দিয়ে তোমাকে মায়ের হুকুম মানতে বাধ্য করবেন। জানো তো মেয়েরা কুড়ি পেরোলেই বুড়ী!"

"উঃ মামা, তুমি উকিল হলে না কেন ? তোমার সঙ্গে তর্ক করে কোনো ফল হবে না। শোনো, হাতে সময় নেই। এখনই পার্টিতে যেতে হবে। তুমি আমার ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ

আরও দু'একটা কাজ সেরে নিই। তারপর আমি তৈরি হয়ে নেবো। এই নাও চাবি—চটপট মামা।"

খুকুর ঘরের সামনে বঙ্গসন্তানের মূর্তি দেখে আমার চমকে ওঠার অবস্থা। সুপুরুষ সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চুলগুলো ঢেউ-খেলানো।

ছোকরা কিন্তু আমাকে দেখে মোটেই অবাক হলো না। কর জোড়ে নমস্কার জানিয়ে বললো, "আপনিই শংকরবাবু? সুচরিতাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—আপনার তো আমার সঙ্গে থাকবার কথা।"

মনে পড়ে গেলো, খুকু বলেছিল, আমার থাকবার ব্যবস্থা কাছাকাছি কোথায় করেছে। এখানে কি এরা বেঙ্গলি কলোনি করবে ঠিক করেছে?

ছোকরা মিষ্টি হেসে বললো, "আপনি আমার ওখানে স্নান সারবেন চলুন। আপনার জিনিসগুলো নিয়ে নিচ্ছি।"

আমি একটু কিন্তু কিন্তু করলাম। ছোকরা হেসে বললো, "আপনি চিন্তা করবেন না, জিনিসপত্তরের হিসেব ঠিক থাকবে। এয়ারপোর্টে আপনার মাল নিয়ে যা গোলমাল হয়েছিল তা আর হবে না।"

বুঝুন অবস্থাটা! আমার দুর্বলতার ব্যাপারটা খুকু তাহলে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। ছোকরা বোধহয় মনের ডাক্তার, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "শিল্পী এবং লেখকরা একটু ভুলো হয়ে থাকেন। সুচরিতাকে নিয়ে আমারই এয়ারপোর্টে যাবার কথা ছিল—কিন্তু ওই দিন ডঃ শিপেন অপারেশনের ডেট ফেললেন, যাওয়া হলো না।"

"না না, রোগী আগে"—আমি বলি। "আশা করি আপনার রোগী ভাল আছেন।"

ছোকরা আমার মালপত্র তুলে নিয়ে বললো, "রোগী আজ থেকে ছোলা খাচ্ছে।"

"অ্যাঁঃ, অপারেশনের পরের দিন থেকে এদেশে ছোলা খেতে দেওয়া

হয় নাকি? তাহলে তো হাসপাতালে যাওয়া চলবে না—ছোলা আমার সহ্য হয় না।"

ছোকরা হেসে বললো, "আমাদের রোগী একটি বাঁদর—নাম সুগ্রীব। সুগ্রীব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, অস্ত্রোপচার করে ডঃ মিস এলিজাবেথ শিপেন তাকে যুবক বানাবার চেষ্টা করছেন।"

ছোকরার পরিচয় পাওয়া গেলো। তপন গাঙ্গুলী, লণ্ডন থেকে এফ আর সি এস পাশ করে, এখানে এসেছে ডঃ শিপেনের গবেষণায় অংশ নিতে। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ—বুড়োদের এরা যৌবন ফিরিয়ে দিতে চায়।

ডঃ তপন গাঙ্গুলীর কোয়ার্টার বাড়ির বাইরে নয়—ওপর তলার এক কোণে। বেশ বড়ো অ্যাপার্টমেন্ট—একখানা বাড়তি শোবার ঘর আছে। ফ্ল্যাটটা ছবির মত সাজানো।

ডঃ গাঙ্গুলী আমার মালপত্র ঘরের মধ্যে তুলে দিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দিলো। বাড়তি চাবি আমার হাতে দিয়ে বললো, "আমি না থাকলেও এই চাবি দিয়ে আপনি ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারবেন। কোনো অসুবিধে হবে না। শুধু আপনার সঙ্গে পেটোর পরিচয় হওয়া দরকার।"

"পেটো! কী অদ্ভুত নাম—সে আবার কে?"

ডঃ তপন গাঙ্গুলী একটু লজ্জায় পড়ে গেলো। বললো, "পেটো আমাদের মতই একজন ভারতীয়।"

"এদেশের কিছু-কিছু লোকের ধারণা, প্রত্যেকটি ভারতীয়ই পেটো—পেটসর্বস্ব। দুনিয়ার সমস্ত গম খেয়ে হজম করে ফেলেছে, তবু খিদে মিটছে না।" আমি উত্তর দিই।

"আমাদের পেটো একটু বেশী খায়, তাই পেটো বলে ডাকি," তপন জবাব দেয়।

"তা আপনি দেশ থেকে চাকর আনিয়ে ভালই করেছেন।"

আমার কথা শুনে তপনের লজ্জা ভাব আরও বেড়ে গেলো। এই জিনিসটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। বললাম, "চাকর রেখেছেন তো কী হয়েছে? আমরা ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ানের মতো থাকবো। রাজনৈতিক উগ্রপন্থীরাও আমাদের দেশে চাকর রেখে থাকে এবং মা কালীর গলায়

জবাফুলের মালা দিতে ভোলে না। রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, থিয়েটার, ফুটবল এবং ঝি-চাকর আমাদের কালচারের গসাগু—হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর, সবার মধ্যে পাবেন।"

তপন গাঙ্গুলী এবার বেল টিপলো এবং যা ঘটলো, তার জন্যে সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলাম না। হাফ প্যান্ট পরে একটি প্রমাণ আকারের বাঁদর যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে তা আমার কল্পনার অতীত।

তপন বললো, "পেটো, ইনিই শংকরবাবু—আমাদের মিস সুচরিতা চ্যাটার্জির মামা!"

পেটো আমার দিকে বেশ সন্দিগ্ধভাবে তাকালো। তপন বললো, "পেটোর দেশ ভারতবর্ষ। দু'বছর আগে আমাদের ল্যাবরেটরিতে আসে। আপনি জানেন—ভারতীয় বাঁদরদের সব চেয়ে বড়ো ক্রেতা হচ্ছে আমেরিকা। ইণ্ডিয়ান বাঁদর না পেলে এখানকার বহু গবেষণা বন্ধ হয়ে যেতো।

বললুম, "শিকাগোতে শুনলাম, নরকঙ্কালের সবেচয়ে বড়ো সাপ্লায়ারও নাকি ভারতবর্ষ। কলকাতার একটা কোম্পানি আমেরিকার বেশীর ভাগ কঙ্কাল জোগায়।"

তপন বললো, "পেটোর শরীর খারাপ হলে আমিই চিকিৎসা করেছিলুম—তারপর কেমন মায়া পড়ে যায়। ওর রকমসকম স্টাডি করবার জন্যে বাড়িতে নিয়ে আসি। সেই থেকেই রয়ে গিয়েছে। আমাদের হোমের বাসিন্দা মিসেস সিম্পসন এক সমিতির সভ্যা যার উদ্দেশ্য হলো গৃহপালিত জন্তুদের লজ্জা নিবারণ করা। উনি নিজের হাতে কয়েকটা হাফপ্যান্ট করে দিয়েছেন পেটোর জন্য।"

পেটো এবার তড়াং করে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হলো। তারপর তাজ্জব ব্যাপার। একটি ট্রে দু'হাতে ধরে সে ঘরের মধ্যে ঢুকলো—তাতে দুটো গেলাশ রয়েছে।

তপন বললো, পেটো আমার ফাইফরমাশ খাটে। আমার সঙ্গে নার্সিংহোমে যায়। আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছে, তাই গেলাশ নিয়ে এলো। এখন কিছু খাবেন নাকি? কোকাকোলা আছে।"

পেটোর কাণ্ডকারখানা দেখে আমার মাথা ঘুরছে। বললাম, "কামড় দেয় না তো ?"

"না না। খুবই বন্ধুভাবাপন্ন বাঁদর। তাছাড়া বেচারা বুড়ো হয়ে এসেছে—এখন আর কারুর পিছনে লাগে না।"

"সুগ্রীব বলে যে বাঁদরের ওপর আমরা অস্ত্রোপচার করছি, তা যদি সফল হয়, তা হলে ভাবছি পেটোকেও আবার যৌবন ফিরিয়ে দেবো।"

তপন বললো, "এই বাবুকে একটু দেখাশোনা করিস পেটো।" পেটো আমার দিকে তাকিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই ঘাড় নেড়ে তার সম্মতি প্রকাশ করলো।

আমি আর সময় নষ্ট না করে স্নানের ঘরে ঢুকে গেলাম।

স্নান থেকে বেরিয়ে শুনলাম সুচরিতা আমার খোঁজে এসেছিল। চাবি নিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়েছে, এখনই ফিরবে। তপনও তৈরি হয়ে নিয়েছে। তপনের দেশ যশোরে। তবে তপনরা অনেকদিন পাইকপাড়ায় বাড়ি করেছে।

"কোথায় পাইকপাড়া আর কোথায় আমেরিকা—দেখুন না ঘুরতে-ঘুরতে কোথায় হাজির হয়েছি।"

"লণ্ডন থেকেই দেশে ফিরবো ভেবেছিলাম। কিন্তু প্যারিসের এক কনফারেন্সে ডঃ এলিজাবেথ শিপেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। অদ্ভুত মহিলা—শুকনো পাটকাঠির মতো চেহারা, কিন্তু কর্ম ক্ষমতার একটি ফার্নেশ বলতে পারেন। বিয়ে করবার সময় পাননি—রিসার্চ নিয়েই ব্যস্ত আছেন। তা ছাড়া ওঁর মাকে নিয়ে সমস্যা! বিয়ে করলে অসুস্থ বিধবা মাকে কে দেখবে সেই চিন্তায় চিরকুমারী থেকে গেলেন। ভারতবর্ষের লোকদের সম্বন্ধে ভদ্রমহিলার খুব বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস ভাঙিয়েই অনেক ভারতীয় এই প্রোজেক্টে কাজ করছেন।

ইতিমধ্যে খুকু ফিরে এলো। পার্টির জন্য খুকু একটা লাল সিল্কের, শাড়ি পরেছে—ওকে মিষ্টি দেখাচ্ছে।

তপন বললো, "আপনার মামাকে বলছি, ডঃ শিপেন ইণ্ডিয়ান ছাত্র এবং বৈজ্ঞানিকদের পছন্দ করেন।"

"সত্যি কথা বলতে কি আমেরিকায় সমস্ত ক্যাম্পাসে ভারতীয়দের সম্মান। ছাত্র হিসেবে ভারতীয়দের বেশ সুনাম। মাস্টার হিসেবেও তাদের খাতির। ইংলণ্ডে যেমন ইণ্ডিয়ান বলতে একটু নাক সিঁটকায়, এখানে ঠিক তার উল্টো", সুচরিতা বললো।

"যতই এখানে তোমাদের আদর হোক, তোমাদের দেশে ফিরে যেতে হবে," আমি সুচরিতাকে স্বদেশের কথা মনে করিয়ে দিই।

তপন বললো, "দেশে ফিরবার কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু ডাক্তার শিপেন নেমন্তন্ন করলেন, আমাদের মেডিক্যাল সেন্টারে চলুন। মানুষের মঙ্গলের জন্যে আমরা একটা বড়ো কাজ করবার চেষ্টা করছি। বার্ধক্যের রহস্যভেদের জন্যে একজন বৃদ্ধ শিল্পপতি তাঁর সমস্ত জীবনের সঞ্চয় আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দিয়ে গিয়েছেন। এই যে গোল্ডেন হোম দেখছেন, এখানেই জীবনের শেষ কয়েকটা বছর কাটিয়ে গিয়েছেন তিনি। আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছি। এই দেশে বৃদ্ধদের দিকে আমি তাকাতে পারি না। সব কিছু থেকেও কোনো কিছু নেই তাদের। আমাদের অজ্ঞাতে আমরা এমন এক সভ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, যেখানে শুধু যৌবনের জয়ধ্বনি, বৃদ্ধদের কোনো স্থান নেই। সবাই ভুলে গিয়েছে যে প্রতিটি যুবক যুবতী একদিন বৃদ্ধ হবে। যাঁরা একদিন আমাদের মানুষ করেছেন, যাঁরা আমাদের এই আশ্চর্য দেশ ও তার সম্পদ উপহার দিয়েছেন, তাঁদের অন্তিম দিনগুলোর জন্যে আমরা কিছু বার্ধক্য-নিবাস তৈরি করে সন্তুষ্ট থাকতে চাই। মার্কিনীরা চায়, তাদের বাবা-মায়ের জন্যে যা-কিছু করার তা গভরমেণ্ট করুক। তিনি প্রথমে বালিকা বান্ধবী এবং পরে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে জীবন উপভোগ করতে ব্যস্ত!"

খুকু ও আমি দু'জনেই ডঃ শিপেনের কথা শুনছিলাম। তপন বললো, "ডঃ শিপেন মৃত্যুকে বিলম্বিত করে মানুষকে দীর্ঘজীবী করতে চান না। ওঁর ধারণা জরাকে জয় করে বিজ্ঞান এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যেখানে সুস্থ শরীরেই মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।"

তপন বললো, "ডঃ শিপেনের গবেষণা কেন্দ্রে না এলে আমার শিক্ষা

অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। আমি কিছুদিন গোল্ডেন নার্সিংহোমের চার্জে রয়েছি—একজন বিদেশী ডাক্তারের পক্ষে এই দায়িত্ব পাওয়া কম সম্মানের নয়। আমরা বার্ধক্যের প্রতিটি দিক পরীক্ষা করে দেখছি এবং মেডিক্যাল সেণ্টারে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। দেশে ফিরে গিয়ে কয়েক বছর পরে যদি দেখেন এলিজাবেথ শিপেন নামে এক মহিলা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাহলে আশ্চর্য হবেন না। আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই তিনি যা কাজ করেছেন তাতেই ওঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া যায়।"

"বার্ধক্যের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কাজ করে আমরা ইতিমধ্যে বয়স সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা ভাঙতে সক্ষম হয়েছি। যেমন—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শেখবার ক্ষমতা থাকে না। আমরা দেখছি ক্ষমতা কমে যায়, কিন্তু পুরোপুরি নষ্ট হয় না—যদি না তার পিছনে বে-ইজ্জত হবার ভয় থাকে। দুশ্চিন্তাবিহীন হয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিছু শিখলে বৃদ্ধরা অনেক কাজ আমাদের থেকে ভালভাবে করতে পারেন।"

তপন বললো, "মানুষের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি চল্লিশ বছর থেকেই কমতে আরম্ভ করে। বার্ধক্যের সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্টি এমন ক্ষীণ হয় যা চশমা নিয়েও ঠিক করা যায় না। বিশেষ করে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ গেলে তাঁদের দৃষ্টি সংহত করতে সময় লাগে। ফলে হঠাৎ অন্ধকার সিনেমা কিংবা থিয়েটার হলে ঢুকলে বৃদ্ধদের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বৃদ্ধদের ঘরে সেইজন্য একটা নাইটল্যাম্প সারারাত জ্বালিয়ে রাখা ভাল।"

তপনের কথাগুলো আমার খুব ভাল লাগছিল। সে হাসতে-হাসতে বললো, "আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে বলে কুড়ি পেরোলেই বুড়ী। কুড়ি না হোক, পঁচিশ বছর বয়সেই পরিপূর্ণ বিকাশের পর প্রত্যেক মানুষের দেহ বার্ধক্যের পথে যাত্রা শুরু করে। দেহ ক্রমশ ছোট হয়—শরীরে জীবকোষের সংখ্যা কমতে থাকে। বয়সের সঙ্গে পেশীর ক্ষয় হয়, নার্ভ সেলের সংখ্যাও কমতে থাকে। আমাদের ব্রেনের আকার এবং ওজনও ক্রমশ কমে যায়। পঁচাত্তর বছর বয়সে অরিজিন্যাল ব্রেনের ওজন শতকরা ৫৬ ভাগ অবশিষ্ট থাকে।"

"বলেন কী?" আমি নিজের মাথায় হাত দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করি।

তপন বললো, "মানুষ দু'ভাবে বৃদ্ধ হয়। প্রাইমারি এজিং (বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে যে বার্ধক্য আসে) এবং সেকেণ্ডারি এজিং (অসুখ-বিসুখের ফলে যে-বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়)। বার্ধক্যকে তিনভাগে ভাগ করেছি আমরা—মানসিক বার্ধক্য, সামাজিক বার্ধক্য এবং বায়োলজিক্যাল বার্ধক্য।"

খুকু মনে করিয়ে দিলো, "পার্টিতে যাবার সময় হয়েছে। হলটা আজ আমরা যেভাবে সাজিয়েছি, ওঁরা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।"

তপন হাসলো। "এই এক ভণ্ডামি, যার কিছু আমি বুঝি না। বৃদ্ধদের বার্ধক্য সহনীয় করে তোলবার জন্যে যা প্রয়োজন তা হলো আপনজনদের নিত্য সান্নিধ্য। তা নয়, নির্বাসনে পাঠিয়ে সেখানে ওদের ফূর্তিতে রাখো। কীভাবে ফুর্তি দাও? না, গাড়ি করে রবিবারে চার্চে নিয়ে যাও, আর প্রত্যেকের জন্মবার্ষিকী পালন করো।"

আমি তপনের মুখের দিকে তাকাই। সে বললো, "পশ্চিমী সভ্যতার এই ভণ্ডামীর অংশটা আমার অসহ্য লাগে। এখানে প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলাটা অসভ্যতা। এখানে কেউ মুখ ফুটে বলতে পারবে না সে দুঃখে রয়েছে। তাকে বলতে হবে সব কিছুই চমৎকার চলেছে—ফাইন, গ্রেট, গ্লোরিয়াস কথাগুলো মুদ্রাদোষের মতো হয়ে গিয়েছে।"

"কিন্তু আপনি কি বলতে চান, এখানকার সব বুড়োই দুঃখী এবং আমাদের দেশের সব বুড়োই সুখে রয়েছে?" খুকু প্রশ্ন তোলে।

"মোটেই না: আমি নিজে জানি, বহু বৃদ্ধ কিছুতেই ছেলে বা মেয়ের বাড়িতে থাকবেন না। তবে চাপা দুঃখ আছে। বার্ধক্যের জন্যে এরা কোনোদিনই তৈরি থাকে না। বার্ধক্যকে এরা ভয় পায়, তাই তার দিকে চোখ বন্ধ করে থাকে। এখানে কেউ বুড়ো হতে চায় না—প্রসাধন কোম্পানিরা তাই এতো টাকা করছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সময়ের ঝড়ে দরজা খুলে যায়—আবিষ্কার করে সে বুড়ো হয়েছে। বুড়ো হওয়াটা যেন অপরাধ, যেন পরাজয়। আর পাশ্চাত্যের ঔদ্ধত্য জানো তো—কেউ হারতে চায় না। যে হারলো, তাকে চোখের সামনে থেকে সবাই সরিয়ে দিতে ব্যস্ত। তাই বুড়োদের প্যাক করে সমুদ্রের ধারে কিংবা নির্জন গ্রামে পাঠিয়ে দাও। টেলিফোন কোম্পানি ছাড়া আর কারুর তাদের সম্বন্ধে

চিন্তা নেই। তারাই শুধু এই সুযোগে দুটো ডলার রোজগারের জন্যে টি-ভিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে : আপনার বাবা-মাকে লংডিসটান্স ফোনে ডাকুন, তাঁরা আপনার কণ্ঠস্বর শুনলে খুশী হবেন। গো-হোম ভায়া দি লংডিসটান্স —টেলিফোনের মাধ্যমে বাড়ি যান।"

"মার্কিনীরা আপনার কথা শুনলে বিরক্ত হবেন।" খুকু বললো।

"আমি জানি সত্যিই তাঁরা বিরক্ত হবেন। কারণ বৃদ্ধদের সঙ্গে তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করেন তা অনেক সময় নিজেরাই জানেন না। যেমন ব্রাহ্মণরা বিরক্ত হয়, যদি বলা হয় তাঁরা বহুদিন ধরে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং গরীব মুসলমানদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছেন। তার মানে এই বলছি না, এদেশে কোনো ছেলে বাবা-মাকে ভালবাসে না, বা বাবা-মার জন্যে অনুভব করে না। কিন্তু সেইটাই তো আমার এবং ডঃ শিপেনের দুঃখ। যে দেশে এতো দয়া এবং দাক্ষিণ্য, যে দেশে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এমন অকৃপণভাবে বর্ষিত হচ্ছে, সেখানে বৃদ্ধরা সমাজের মূল প্রবাহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করবেন কেন?"

খুকু বললো, "মামা, এ বিষয়ে তুমি নিউ ইয়র্কে কিছু কথাবার্তা বলেছিলে না।"

"নিউ ইয়র্কে মিস্টার ও মিসেস ফারপো নামে এক বৃদ্ধ ইতালীয়ান দম্পতির সঙ্গে কিছু কথা হয়েছিল। ইতালীয়ান আমেরিকানরা এখনও ইহুদীদের মতো ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসেন। আর আলাপ হয়েছিল আমার এক তরুণী বান্ধবীর সদ্যবিবাহিত স্বামীর সঙ্গে। স্বামীটি অর্থনীতিতে পণ্ডিত। তিনি একদিন ডিনারে আমাকে যা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার সারমর্ম হলো—পাশ্চাত্য যে এতোখানি এগিয়ে গিয়েছে তার কারণ উৎপাদন দিয়ে তাঁরা মানুষের বিচার করেন। যাদের কাজের ক্ষমতা কমে গিয়েছে অথচ কথা বলার ইচ্ছে বেড়ে গিয়েছে, তাদের ওপর নির্ভর করলে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। যৌবনের উদ্ভাবনী শক্তি ও পেশী শক্তিতেই সমাজ এগিয়ে চলে। বৃদ্ধ-নির্ভরতাই ভারতবর্ষের অনগ্রগতির অন্যতম কারণ। কথাটা নিষ্ঠুর হলেও নাকি সত্যি। ঈশ্বরই যৌবনের ওপর জোর দিয়েছেন—মধ্যগগনের সূর্যই বেশী উত্তাপ দেয়।

"কথাগুলো ইণ্টারেস্টিং", তপন মন্তব্য করলো।

"আর কিছু শুনেছিলে?" খুকু জিজ্ঞেস করে।

"শুনলাম, দরিদ্র দেশেই বৃদ্ধদের সম্মান বেশী। ওসব দেশে শিল্পের প্রগতি তেমন দ্রুত নয় বলে বুড়োরা কাজকর্মের ক্ষেত্রে রাতারাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে না। অথচ পশ্চিমে বিজ্ঞানের এমন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা বয়োজ্যেষ্ঠদের পক্ষে বেশ কষ্টকর ব্যাপার। প্রতিযোগিতার দৌড়ে বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, বৃদ্ধ ইঞ্জিনীয়র, বৃদ্ধ কারিগর সবাইকে পথ ছেড়ে দিতে হয় নতুনকে। তার ফলেই একজন মানুষের জীবনকালে গোরুর গাড়ি থেকে মহাকাশচারী রকেটের বিবর্তন দেখা যাচ্ছে। শিল্প-সভ্যতায় এগিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা এতো কঠিন যে অন্যের দিকে তাকাবার সময় থাকে না। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেপুলে সামলানোই যথেষ্ট শক্তকাজ। তার ওপর বাবা-মা স্কন্ধে চাপলে জীবনে আনন্দ বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং যে যার ঘর সামলাও; তবেই প্রগতির রথ এগিয়ে চলবে। টেকনলজির উন্নতির সঙ্গে এই অবস্থা সব দেশেই নাকি অনিবার্য। আধুনিক জাপানে জনকজননী এখন আর স্বর্গাদপি গরীয়সী নন, আমাদের দেশেও তাই হতে বাধ্য।"

তপন গম্ভীরভাবে বললেন, "ঈশ্বর ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন।"

খুকু বললো, "আমি সামাজিক নৃতত্ত্ব চর্চা করি। আমরা ভালমন্দ বিচার করি না—শুধু ছবিটা চোখের সামনে তুলে ধরি। সুতরাং কোনো মন্তব্য করবো না। শুধু এখন বলতে চাই, একতলার নিচে মিস্টার রাইটের পার্টি এতোক্ষণে আরম্ভ হয়ে গেলো।"

হোমের প্রধান শ্রীমতী টমলিন হলের দরজার সামনে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। উইক এণ্ডের অভিসার অসমাপ্ত রেখেই তিনি ফিরে এসেছেন। কারণ জন্মদিবসের পার্টিতে না-থাকাটা তিনি কল্পনা করতে পারেন না।

মিসেস টমলিন বললেন, "আমাদের হোমের নতুন পলিসি, প্রতিটি সিনিয়র সিটিজানের জন্মদিন আমরা পালন করবো।"

খুকু বললো, "এখানে কেউ বুড়ো কথাটা ব্যবহার করে না। বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক বলা হয় সবাইকে।"

মিসেস টমলিন বললেন, "এইটাই এখানকার নিয়ম। আমরা কাউকে জানতে দিই না যে তিনি বুড়ো হয়েছেন। বুঝতেই তো পারছেন, বুড়ো হলে জীবনের আর কী রইলো।"

ঘরের মধ্যে বেলুন এবং রঙীন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে। একটু পরেই বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকরা তাঁদের সবচেয়ে সুন্দর স্যুট পরে হলঘরে ঢুকতে আরম্ভ করলেন। অনেকে আবার ইভনিং স্যুট চাপিয়েছেন—কালো রঙের কোট থেকে একটুকরো সাদা রুমাল উঁকি মারছে। অনেকে ঠিক দেখতে পাচ্ছেন না—তাঁরা লাঠির ওপর ভর করে কোনোরকমে হাজির হয়েছেন।

তপন বললো, "এঁরা কেউ মিলিটারিতে কর্ণেল ছিলেন, কেউ ইনসিওর কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কেউ রেডিও কোম্পানির স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন। মায় ওই যে কোণে রোগামতো ভদ্রলোককে দেখছেন উনি সাহিত্যিক ছিলেন।"

তপন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, এক সময় লিখতাম। নতুন যুগের মানুষেরা আমার লেখায় কিছু পায় না—আমি ওদের মনের খবর জানি না। আমি বাতিল হয়ে গেছি। কোনো প্রকাশক আমার লেখা ছাপাবার ঝুঁকি নিতে চায় না। বুঝলেন, মিঃ শংকর, আমাদের এখানে সব কিছুই দ্রুত পাল্টে যায়—তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনি যদি ছুটতে না পারেন তাহলে আমার অবস্থা হবে। কেউ খোঁজ রাখবে না। জায়গা নেই বলে অনেক লাইব্রেরি আমাদের বই ফেলে দিচ্ছে। নতুনদের জায়গা দিতে হবে তো।"

মিসেস টমলিন বললেন, "ওই যে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখছেন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছেন—উনি দ্বিতীয় যুদ্ধের খ্যাতনামা বীর। এয়ারফোর্সের নামকরা পাইলট ছিলেন।"

এয়ারফোর্স কমাণ্ডার হ্যারি হপকার্ক আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন—ওঁর হাতটা কাঁপছিল। আমার প্রশস্তি শুনে বললেন, "আমরা পুরনো হয়ে গিয়েছি। আজকালকার নতুন সুপারসোনিক প্লেন দেখলে কিছুই

বুঝতে পারবো না। যেসব প্লেনে আমরা মানব সভ্যতাকে জার্মানদের হাত থেকে রক্ষা করেছি তা দেখলে আজকালকার ছেলেরা খেলনা ভাববে। মিউজিয়ম ছাড়া আর কোথাও তাদের দেখতে পাবেন না। আমাদের কোনো দাম নেই।” হপকার্কের কণ্ঠ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

খুকু বললো, “ওই যে টাকমাথা ছুঁচলো নাকের ভদ্রলোককে দেখছো—উনি সে যুগের বিখ্যাত গাইয়ে। এখন ওঁর গান চলে না। যখন ওঁর দিন ছিল, তখন হাজার হাজার লোক ওঁকে ঘিরে থাকতো। বিয়েও করেছিলেন ব্রডওয়ের নামকরা অভিনেত্রীকে। যেদিন নাম চলে গেলো সেদিন অভিনেত্রীও বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক নিউ ইয়র্কের ড্রাগস্টোরে ডিশ ধুতেন, এখন এখানে এসে উঠেছেন। ওঁকে অর্ধেক খরচে রাখা হয়েছে—ওঁর বিশেষ কিছু নেই।”

মিসেস টমলিন ফিসফিস করে বললেন, “বহু কষ্ট করে ওঁর গানের রেকর্ড যোগাড় করেছি—এদেশে পুরনো আবর্জনা কেউ রাখে না। আজ ওঁকে একটু আনন্দ দেবো। ভদ্রলোকের শরীর ভাল যাচ্ছে না।”

যাঁকে নিয়ে আজ রাত্রের উৎসব তাঁকে এবার দেখা গেলো। মিস্টার টম রাইট বিজয়গর্বে সুসজ্জিত হয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন। মিসেস টমলিন এগিয়ে গিয়ে ওঁর কোটের কোণে একটি ফুল এঁটে দিলেন। দর্শনের অধ্যাপকের বিধবা শ্রীমতী সিম্পসন প্রজাপতির মতো সেজেছেন। তিনি ছুটে এসে মিস্টার রাইটের হাত ধরে মাথায় রঙীন কাগজের টুপি পরিয়ে দিলেন।

খুকু বললো, “ভদ্রলোকের অবস্থা ভাবো! স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ করেছে। তিন ছেলের কেউ ভুলেও খোঁজখবর নেয় না। শুধু বড়দিনের সময় কার্ড পাঠায়, আর নাতিনাতনীর জন্ম হলে খবর দেয়। এক মেয়ে মাঝেমাঝে খবরাখবর নিতো—সে এখন স্বামীর সঙ্গে ফিলিপাইনস-এ চলে গিয়েছে। ভদ্রলোকের টাকাকড়িও কমে এসেছে। এদেশেও ডলারের দাম কমছে, জিনিসপত্রের দাম আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে। শরীর ভাল নয়। চোখে তেমন দেখতে পান না।”

মহিলারা এবার মিস্টার রাইটকে ঘিরে ধরলো। বললো, “এইদিন

বার বার ফিরে আসুক। আপনাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কি বলবো!"

সৌন্দর্যের প্রশস্তিতে মিস্টার রাইট বেশ গর্ববোধ করলেন, গলার টাইটা একটু টেনে টাইট করে নিলেন।

মিসেস টমলিন বললেন, "ও মিস্টার রাইট, আপনি ওইভাবে তাকাবেন না। অমন 'সিডাকটিভ' দৃষ্টি যে-কোনো রমণীর হৃদয়ের বরফ গলিয়ে দেবে।"

মিস্টার রাইট মনে হলো কথাটা বিশ্বাস করলেন।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মিস্টার ডুগান সস্ত্রীক হলঘরে ঢুকলেন। ওঁদের দেখলে কে বলবে কিছুক্ষণ আগেই অমন দাম্পত্য সঙ্কট গিয়েছে। মিসেস ডুগান এবার মিস্টার রাইটকে অভিনন্দন জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন বুঝছেন?"

"ওঃ চমৎকার! মনে হচ্ছে পৃথিবীর মাথায় দাঁড়িয়ে আছি," মিস্টার রাইট উত্তর দিলেন। "এবং আপনাদের কী হৃদয়, আমার জন্মদিনে আপনারা এমন উৎসব করছেন। আমার ছেলেরা শুনলে খুব খুশী হবে।"

"বেচারা!" খুকু ফিস ফিস করে বললো। কেউ ওঁর খবর নেয় না। কয়েকদিন আগে আমি নিজে ওঁর এক ছেলেকে ফোন করি—বলি হাজার হোক আপনার বাবা, মাঝে মাঝে ওঁকে একটু সান্নিধ্য দেবেন। ভদ্রলোক বললেন, আমি জানি আপনাদের ওখানে উনি নিরাপদে আছেন। আমি ওঁকে বোঝালাম, নিরাপত্তাটাই জীবনের সব নয়, এই বয়সে মানুষ একাকীত্বকে ভয় পায়। ভদ্রলোক খুব খুশী হলেন না। উনি সেদিন আবার সপরিবারে হাওয়াইতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছিলেন। ছুটিতে যাবার সময় এইসব অপ্রিয় কথা ভাল লাগে না।"

তপন বললো, "এ তো তবু ভাল। আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোকের কি রাগ—ছুটিতে যাবার সময় খবর এল বাবার শেষ অবস্থা। অসময়ে মারা গিয়ে বাবা নাকি ছুটিটা নষ্ট করে দিলেন! বুড়োদের সত্যি কোনো বিবেচনা-বোধ থাকে না, আমি নিজে শুনেছি।"

ম্যানেজার মিসেস টমলিন বললেন, "আপনি শুনে সুখী হবেন, এই

পার্টির জন্যে আমরা এক পয়সা চার্জ করছি না। গভরমেন্ট তাদের বিশেষ গ্রাণ্ট থেকে আমাদের এই জন্মোৎসবের খরচ দেবে। তাছাড়া স্থানীয় মেয়র এবং চার্চও খুব দরদী। ওঁদের আগে থেকে জানালে ওঁরা টেলিগ্রাম পাঠান,মেয়র নিজে ফুল উপহার দেন। বলুন, এটা সুন্দর কিনা। স্বয়ং মেয়র আপনার জন্মদিনের খবর রাখছেন, আর আপনি কী চাইতে পারেন ?"

হলের মধ্যে এবার বাজনা বেজে উঠলো। রেকর্ডে বাজনার ব্যবস্থা ছিল। তারপর জন্মদিনের গান শুরু হলো—হি ইজ এ জলি গুড ফেলো, হ্যাপি বার্থ-ডে, হ্যাপি বার্থ-ডে।

এবার মিসেস টমলিন ঘোষণা করলেন, "মিস্টার টম রাইটের বন্ধু ও বান্ধবীগণ, আসুন আমরা এই অতীব আকর্ষণীয় পুরুষটির শতায়ু কামনা করি। তাঁর জীবন যেন এখনকার মতই আনন্দে ভরপুর থাকে। শুধু আমরা নয়, স্বয়ং মেয়র মিস্টার রাইটের দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন এবং আমাদের বিশেষ অতিথি ভারতবর্ষের একজন নামকরা লেখকও এসেছেন এই আশী বছরের তরুণকে অভিনন্দন জানাতে।"

এবার হাততালি পড়লো। মিসেস টমলিন এবার মিস্টার রাইটকে বার্থ-ডে কেকের কাছে নিয়ে গেলেন—সেখানে আশিটি মোমবাতি জ্বলছিল। সেগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব নয়—মিসেস টমলিনই ওঁর হাত ধরে কাজটি সমাধা করলেন।

তারপর নৃত্যের সংগীত শুরু হলো। ওঁদের কয়েকজন মদের গেলাশ ধরে নাচবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকের কোমরেই বাত, সুতরাং নাচ জমলো না। নাচবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু শক্তি নেই।

এবার সকলে বুফে ডিনার টেবিলের দিকে অগ্রসর হলেন। এবং রেকর্ডে একটি গান শুরু হলো। তার আগে মিসেস টমলিন বললেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ টনি সুইনি আমাদের হোমেই থাকেন। তাঁর এই গানটি অনেকের অনুরোধে বাজানো হচ্ছে।"

মিস্টার সুইনি আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। পুরনো দিনের হারিয়ে যাওয়া আপন কণ্ঠস্বর শুনে সুইনি কিছুক্ষণের জন্যে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তারপরই ওঁর অভিমানী মনটা বিরক্ত হয়ে উঠলো।

মনে হলো ওঁর মুখে কেউ অপমানের কালি ছড়িয়ে দিয়েছে। টনি স্থইনি অস্থির হয়ে উঠলেন। খুকুকে বললেন, "মিসেস টমলিন কোথায় ?"

খুকু ওঁকে হলের আর এক কোণ থেকে টেনে নিয়ে এলো। এক গাল হেসে মিসেস টমলিন বললেন, "ও, মিস্টার স্থইনি—আপনাকে হিংসে হচ্ছে। কি আপনার গান—দেখুন সকলে কেমন উপভোগ করছেন।"

"ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে আর এইভাবে অপমান করবেন না। আমি জানি—আমার গানের কত কদর। অবহেলা তবু সহ্য হয় মিসেস টমলিন, কিন্তু অভিনয় সহ্য হয় না এই বয়সে। প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না।"

আমাদের চোখের সামনে সেকালের জনপ্রিয় গায়ক টনি স্থইনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখনও তাঁর কণ্ঠস্বর রেকর্ডপ্লেয়ারে বাজছে।

মিসেস টমলিন দক্ষ অভিনেত্রীর মতো অন্য বৃদ্ধদের দৃষ্টি যাতে এদিকে না পড়ে তার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, "আহা কী স্থকণ্ঠ। জাত শিল্পী আমাদের টনি—নিজের কণ্ঠস্বর শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।"

ডিনারের শেষে কোয়ার্টারে ফিরে এসে তপন বললো, শংকরবাবু, হাজার কথার এককথা বলে গেলো বেচারা টনি স্থইনি। দোহাই তোমরা অবহেলা করো, কিন্তু অভিনয় করো না। বয়োবৃদ্ধদের নিয়ে সমস্ত দেশে অভিনয় চলেছে। ছোট ছেলেদের যেমনভাবে ভোলানো হয়, তেমনভাবে অভিনয় করে বৃদ্ধদের ভোলানোর চেষ্টা চলেছে এই বিরাট মহাদেশে।"

বললাম, একটু কফি হলে মন্দ হতো না। তোমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা জমাতে ইচ্ছে করছে।"

তপন গাঙ্গুলী নিজেই কফির যোগাড় করতে যাচ্ছিল। খুকু বললো, "আমিই করি।"

তপন গাঙ্গুলী বললো "মিস চ্যাটার্জি, বাড়িটা আমার, আর আপনারা অতিথি।"

"অতিথিরা কফি তৈরি করবে না, এমন কোনো নিয়ম আছে কি?" স্থচরিতা জিজ্ঞেস করে।

আমি স্থচরিতার পক্ষ সমর্থন করে বলি "এই তো আমার ভাগ্নীর যোগ্য উত্তর। তাছাড়া তপনবাবু আপনিই বলুন আর আপনার সহকারী

পেটোই বলুন, চা-কফি জিনিসটা মেয়েদের হাতে আরও মিষ্টি হয়। ওর মাকে গিয়ে কী বলবো আমি? যে-মেয়ে আগে সব রকম রান্না করতো সে এখন চা পর্যন্ত তৈরি করে না।"

"বুঝুন ডঃ গাঙ্গুলী—মামাকে এত আদর যত্ন করে এই ফল হলো যে, কলকাতায় গিয়ে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেবেন।"

খুকু কফি তৈরি করে নিয়ে এলো। খবর পেয়ে পেটো কোথা থেকে হাজির। তাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো। সে একবার চেয়ারে উঠছে আবার নামছে।

খুকু বললো, "মামা, তোমার ভয় লাগছে না তো?"

"আমার বাঁদরের ভয় নেই, হাজার হোক পূর্বপুরুষ। তুই তো জানিস আমার ভয় আরশোলা আর কুকুরের।"

খুকু বললো, "ডঃ গাঙ্গুলী, শেষ পর্যন্ত একটা বাঁদর পুষলেন, পৃথিবীতে এতো জিনিস থাকতে!"

তপন হেসে বললো, "বাঁদর কিন্তু বাঁদরামি করে না! একটু কফি খাবার ইচ্ছে হয়েছে এই যা। আমি যতবার কফি খাই ওকেও ততবার আধ কাপ দিতে হয়।"

আমাদের কথাবার্তা শুনে পেটো নিজের কাপ ডিস নিয়ে এলো। খুকু তাতে কফি ঢেলে দিলো। ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে পেটো গরম কফিতে ফুঁ দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

আমাদের কথাবার্তা বেশ জমে উঠেছে। তপন বললো, "আমাদের দেশে বৃদ্ধরা কনিষ্ঠদের সম্বন্ধে আজকাল তেমন সন্তুষ্ট নন। শাশুড়ীর নানা অভিযোগ পুত্রবধূ সম্পর্কে। ছোটখাট ঝগড়াও লেগে আছে। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের মানুষ এখনও এতোটা হৃদয়হীন হয়নি। যতোই শিল্পবিপ্লব আসুক আমরা এ-বিষয়ে কোনোদিন সায়েব হয়ে উঠবো না।

"ভয়েরই কথা," আমি বলি। "কারণ আজকাল সমাজের উচ্চস্তরে নানা সায়েবিয়ানা জেঁকে বসছে।"

তপন বললে, "প্রাচ্যের লোকেরা এই অবস্থা দেখে বিচলিত হয়। কোনো একজন আমেরিকান লেখকের লেখায় যেন পড়েছিলাম—বৃদ্ধদের কাছে ভালবাসা কথাটাই মিথ্যা; কারণ বুড়োকে কে ভালবাসতে পারে? সে একটি 'নুইসেন্স'—কোথাও তার স্থান নেই। তার চারদিকে শঠতা—

ছবি দেখাবো। আর দেখাবো নাতি-নাতনীদের চিঠি। আমাদের বিয়ে উপলক্ষে কি মিষ্টি চিঠি লিখেছে ওরা।"

ওঁরা চলে যেতে খুকু বললো, "এদেশের নার্সিং হোম আর আমাদের দেশের নার্সিং হোম এক নয়। আমাদের দেশে নার্সিং হোম মানে প্রাইভেট হাসপাতাল। এখানে হাসপাতালে চিকিৎসার পর, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে নার্সিং হোমে পাঠানো হয়। এখানে নার্স থাকেন, ডাক্তারও আসেন—তবে নার্সিংটা বড়ো কথা। আমাদের এই হোমের সঙ্গে নার্সিং হোম রয়েছে। এতে গবেষণার সুবিধা হয়—এবং যাঁরা থাকেন তাঁদেরও সুবিধে। কারণ শরীর সুস্থ না থাকলে কোনো লোককে ওল্ড হোমে রাখা হয় না, সোজা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে চালান করে দেওয়া হয়। বুড়ো বয়সে শরীর সবসময় সুস্থ থাকবে এ কথা কে বলতে পারে?"

খুকু বললো, "বুড়ো বয়সের বিয়ে আমার বেশ মজা লাগে। বর বউ-এর জন্যে মায়া হয়। আর ভাবি এদেশের চরিত্রের কথা। এদেশের মানুষ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ থেকে অনেক শক্ত—মনটা সহজে ভেঙে যায় না। বুড়ো বয়স বলে চোখের জল ফেলে না, নিজের সুযোগ অনুযায়ী জীবনের আনন্দ আহরণ করে নেয়।"

"না বাপু, তাজুদি বুড়ো বয়সে বিয়ে পছন্দ করেন না, সেই জন্যেই তো তোমার বিয়ের জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছে না। আমাকে বার-বার বলেছেন একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে।"

আমার উত্তরে খুকুর মুখে হাসি খেলে যায়। "ওমা, তুমি আমাকে বুড়ী বানিয়ে দিচ্ছো—সবে না তেইশ শেষ করেছি! তোমার এবং মার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।"

"তোমার মায়ের একটি ছড়া শুনলেই জজ মামলা ডিসমিস করে দিয়ে তোমাকে মায়ের হুকুম মানতে বাধ্য করবেন। জানো তো মেয়েরা কুড়ি পেরোলেই বুড়ী!"

"উঃ মামা, তুমি উকিল হলে না কেন? তোমার সঙ্গে তর্ক করে কোনো ফল হবে না। শোনো, হাতে সময় নেই। এখনই পার্টিতে যেতে হবে। তুমি আমার ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ

কারণ করুণাবশত তাকে সবাই ঠকাচ্ছে, কেউ তাকে সত্যি কথা বলে না। তাকে ছোটছেলের থেকেও অধম মনে করে।"

খুকুর হাই উঠছে। বেচারা সারাদিন অনেক ঘুরেছে। ওকে আমরা ছুটি দিয়ে দিলাম।

আমাদের গল্প কিন্তু বন্ধ হলো না। দেখলাম তপনের চোখে স্বপ্ন। সে বললো, "সব দোষ স্খালন হয়ে যায় এদের কর্মপ্রচেষ্টা দেখলে। কর্মের আগুনে সব অপরাধ এরা শুদ্ধ করে নিচ্ছে। আমাদের গবেষণাগারে যা কাজ হচ্ছে তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় আপনাকে জোর করে বলতে পারি, ডঃ শিপেন এখন ল্যাবের বাঁদরগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছেন। সুগ্রীবের খবরাখবর নিচ্ছেন।"

"পশ্চিমের এই কর্মী মূর্তিই তো বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল। এদের কাছে এইটাই বড়ো শেখার জিনিস।" আমার মতামত জানাই।

"ভাবলে দুঃখ হয়। আগের যুগের মানুষরা এমনিভাবেই পরিশ্রম করেছিলো বলেই তো আমরা আজ সভ্যতার এই সীমায় পৌঁছেছি। অথচ তাঁদের মনে রাখা হবে না, এটা কেমন কথা?"

আমি বললাম, "আপনাদের গবেষণা যদি সফল হয় তাহলে মানব সমাজের রূপ পাল্টে যাবে। শৈশব, কৈশোর, যৌবনের পর বার্ধক্যের দেখা মিলবে না, তখন আমৃত্যু যৌবন।"

তপন বললো, "আপনি আমাকে তুমি বলবেন এবং নাম ধরে ডাকবেন।"

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভাঙলো তখন তপনের দেখা নেই। আমাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে পেটো একটা কাগজের টুকরো নিয়ে এলো। তপন লিখছে, "আমি ল্যাবরেটরীতে কয়েকটা কাজ সারতে যাচ্ছি। ব্রেকফাস্টের সময় ফিরবো। কফির জল গরমের জায়গা পেটো আপনাকে দেখিয়ে দেবে।"

পেটোকে কোনোক্রমেই বাঁদর বলা চলে না। তপন যে কীভাবে ওকে শিক্ষা দিয়েছে ভগবান জানেন। সে আমাকে কিচেনে নিয়ে গেলো। সেখানে জল গরম চাপিয়ে দিলাম। অধৈর্য পেটো এবার নিজের কাপ ডিস হাজির করলো। এই একটি লোভ বেচারা এখনও দমন করতে পারেনি।

গরম জলের কেটলি নামাবার আগেই টেলিফোন বাজলো। তপন কথা বলছে। "শংকরবাবু, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? ব্যাচেলরের ডেরায় যখন উঠেছেন তখন একটু কষ্ট পেতে হবে। নিজের টুথ ব্রাশ খুঁজে পেয়েছেন তো? না হলে বাথরুমের আয়নার পিছনে নতুন ব্রাশ পাবেন। আকস্মিক অতিথিদের জন্যে আমি ব্রাশ কিনে রাখি।"

বললাম, "ব্রাশ আমার প্রায়ই হারায় এ কথা সত্য। কিন্তু আজকে সমস্ত খুঁজে পেয়েছি।"

কফির ব্যাপারে তপন বললো, "পেটো আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।" শুনলাম সুচরিতাও সেই ভোরবেলায় হাসপাতালে বেরিয়েছে। দু'জনে এক সঙ্গে ফিরবো একটু পরে। সুচরিতা মামার নিরাপত্তার জন্য বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পেটোর সৌজন্য সম্পর্কে তার মনে গভীর সন্দেহ। আমি আশ্বাস দিলাম, পেটোর কাছে পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছি। সুতরাং তারা যতক্ষণ ইচ্ছে কাজ করতে পারে।

পেটো ও আমি পূর্বদিকের বারান্দায় এসে বসেছি। দূরে গোল্ডেন হোমের গেট দেখা যাচ্ছে। গিনি সোনার মতো ভোরের রৌদ্র সমস্ত প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে। কয়েকটা নাম-না-জানা পাখি গাছের ওপর কিচিরমিচির করছে। দূরে গোল্ডেন হোমের গেটের কাছে ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা ছেলে নামলো। ছেলেটি কাগজ বিক্রি করে। ঘোড়ায় চড়ে খবরের কাগজ বিলি করবার বুদ্ধিটা বেশ অভিনব। এ-দেশে মোটরের অত্যধিক প্রতিপত্তির জন্যেই আবার ঘোড়ার আদর বাড়ছে। শুনছি, সাইকেলও জনপ্রিয় হচ্ছে।

কেমন একটা কুড়েমি ভোরবেলায় কুয়াশার মতো আমার ওপর ভর করেছে। আমি অনুভব করছি, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, কেবল যদি ওই হতাশার কুয়াশাটুকু কেটে যায়। আস্তে-আস্তে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি—আর ভাবছি এই আশ্চর্য দেশের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের পার্থক্যের কথা। ভারতবর্ষকে এখন অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অশিক্ষার আবরণ ভেদ করে জননী ভারতবর্ষের এই রূপ স্বদেশে কোনোদিন অনুভব করতে পারিনি

এমনভাবে দেশের কথা স্বদেশে কোনোদিন তো মনে আসেনি। কাছের জিনিসকে অনেক সময় কাছ থেকে দেখতে পায় না—তার জন্যে যেতে হয় দূরে, অনেক দূরে। সংসারে ক'জন আছেন যিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতো কন্যাকুমারিকার শেষ ভারতীয় শিলাখণ্ডের ওপর বসে ভারতের প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করবেন ?

হয়তো এও এক ধরনের হ্যাংলামো—সবসময় যা দেখছি তার সঙ্গে নিজের দেশের তুলনা করা এক প্রকারের কমপ্লেক্স। দেশ ছাড়বার আগে মা বলেছিলেন, যখন যেখানে থাকবি, সেখানের সঙ্গে মিশে যাবি ; দেশ দেখবি, মানুষ দেখবি—ঘরের কথা ভেবে মন খারাপ করবি না। কিন্তু পারি কই ? দেশের জন্যে অন্তরে যে এত ভালবাসা আছে তাও তো কখনও অনুভব করিনি। আমরা যে অনগ্রসর, অশিক্ষিত ও ক্ষুধার্ত—আমাদের দেশের বড়লোক ও শিক্ষিত লোকরা যে দেশের জন্যে তেমন কিছু করেন না এসব জানতাম। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক কিছু যে এখনও ভাল রয়েছে ; অনেক কিছু যে পশ্চিমী বেনো জল থেকে রক্ষে করবার আছে, তা কখনও বুঝিনি।

কফির কাপ প্রায় শেষ এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। "কে, শংকরবাবু নাকি ?" ওদিকে চিঁড়ে বৌদির গলা। "কখন ঘুম থেকে উঠলেন ?"

"সবেমাত্র উঠে কফি সেবন করছি পেটোর সঙ্গে।"

চিঁড়ে বৌদি খুব দুঃখ পেলেন। "কেন যে আপনি আইবুড়োর বাড়িতে উঠতে গেলেন ! আমি তখনই জানতাম, ওই পেটোর হাতে পড়তে হবে আপনাকে। খুব সাবধান, পেটো সাংঘাতিক লোভী, আপনার কফি এঁটো করে দিতে পারে। তপনবাবু ওকে শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু হাজার হোক বাঁদর তো।"

বললাম, "জন্তু জগতের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব ছিল না। পুনাতে ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়-এর বাড়িতে চিড়িকদাস নামে এক পোষা কাঠবিড়ালির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—আর তারপরেই এই পেটো।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "কাঠবেড়ালি ! আহা কি মিষ্টি ! আর কি

মিষ্টি নাম, সাহিত্যিক না হলে এমন নাম দিতে পারেন? আমার নিজের কাঠবেড়ালি পুষবার শখ। তা চিড়িকদাস কেমন আছে?"

"গতবারে পুনায় গিয়ে জানলাম, চিড়িকদাস বিবাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছে। কানাঘুষোয় শুনলাম বিবাহঘটিত ব্যাপারে অভিভাবকের সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।"

চিঁড়ে বৌদি টেলিফোন ধরে হাসিতে ফেটে পড়লেন। "যা বলেছেন! আজকাল কারও বিয়ের ব্যাপারে মাথা গলাতে নেই। কিন্তু আমি তো এখানে দিব্যি ঘটকালি করে যাচ্ছি। আমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই, শুধু দেখি আমাদের দেশের ছেলেগুলো যেন মেম-সাহেবের হাতে না পড়ে। শংকরবাবু, এ-বছরে আমি চারটে বিয়ে পাকা করেছি। গত মাসে বিয়ে দিলাম হন্সকুমার খান্না আর সুমতি মেহতার। আমি যতদূর পারি দেশাচার মেনে ঘটকালি করি। এ ক্ষেত্রে পাত্রী গুজরাতী আর পাত্র পাঞ্জাবী! পাত্র বেজায় হ্যাংলা—বিয়ের জন্য আমাকে পাগল করে মারছিল। পাত্রীর ইচ্ছে নেই তা নয়। কিন্তু একেবারে ভেজিটারিয়ান। মাছ-মাংস খাওয়া স্বামীর গায়ে নাকি দুর্গন্ধ বেরুবে। তা সুমতিকে পাবার জন্যে খান্না নিরামিষাশী হয়ে গেল। সেই খবর সুমতির কানে যেতে বেচারা মত দিল। বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু শংকরবাবু, এই জন্যেই বলে ইণ্ডিয়ান ওয়াইফ। এখন সুমতি নিজেই স্বামীকে ডিম সেদ্ধ এবং চিকেন খাওয়াচ্ছে। কেমেষ্ট্রির ছাত্রী তো, ভয় হচ্ছে এতদিন হাইপ্রোটিন খাবার খেয়ে হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যদি শরীরের মেটাবলিজিম পাল্টে যায়?"

চিঁড়ে বৌদির কথা শুনে আমি হেসে ফেলি।

"হাসবেন না শংকরবাবু, হাতের নোয়া এবং সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখবার জন্যে আমাদের দেশের মেয়েরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। সেই জন্যেই তো আমি প্রত্যেকটি ইণ্ডিয়ান ছেলেকে বলি, ওই ভুলটি কোরো না। মুড়ি মিছরি, স্কার্ট শাড়ি একদর কোরো না!"

আমি হেসে বলি, "আমার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক মুজতবা আলী সায়েব কথাটা শুনলে খুশী হতেন।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, যাক, কাজের কথাটা শেষ করি। আপনাকে

আলাদা পাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার প্রায়। তপন গাঙ্গুলীকে কেমন লাগছে ?"

"চমৎকার ছেলে। যেমন দেখতে তেমন ব্যবহার। তেমনি রসবোধ," আমি অন্তর থেকেই উত্তর দিই।

"ওই বাঁদরামিটুকু ছাড়া সত্যি সবই ভাল," চিঁড়ে বৌদি উত্তর দেন।

"পেটো-প্রীতির কথা বলছেন ? আহা পেটোর উপর আমার এখন আর রাগ নেই। তাছাড়া, দেখুন বিদেশে একজন ইণ্ডিয়ান যদি আর একজন ইণ্ডিয়ানকে না দেখে তা হলে চলবে কী করে ? পেটো এসেছে অযোধ্যা থেকে, আর তপন পাইকপাড়া থেকে—এখানে প্রাদেশিকতার কথা উঠতেই পারে না।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "আমার স্বামী তো তপন গাঙ্গুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওঁদের হেড, ডাক্তার এলিজাবেথ শিপেনের চোখের মণি নাকি ওই তপনকুমার। কোথায় এক কনফারেন্সে ভদ্রমহিলা পেপার দিয়েছেন, তার সঙ্গে তপনেরও নাম জুড়ে দিয়েছেন। জানেন তো, এটা কত বড়ো সম্মান! এঁরা খুব নাচানাচি করছেন। কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না। হাজার হোক আইবুড়ো মেমসাহেব। এখনকার ফ্যাশন বুড়োদের কচি মেয়ে বিয়ে করা। কিছু-কিছু বুড়ীও তাই প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে!"

"সেইটাই তো স্বাভাবিক," আমি উত্তর দিই।

"যাক, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। সময় করে আমাদের এখানে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন। বিশেষ দরকার আছে। আর আপনি তপনের ঘরে তো ঢুকেছেন। বিছানার কাছে কোনো মেমসায়েবের ছবি দেখেছেন নাকি ? খুব সুন্দর দেখতে, কম বয়সী মেয়ে রেড হেড।"

"রেড হেড জিনিসটা কী ?"

"উঃ শংকরবাবু, একরকমের চুল। এখানকার প্রত্যেকটি মেয়ের মুখস্থ—ব্লণ্ডদের মাথায় একলক্ষ তিরিশ হাজারের বেশী চুল থাকে, ব্রুনেটদের চুলের সংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজারের ওপর হয়, আর রেড হেডদের সাধারণত নব্বই হাজার।"

বললাম, "তপনবাবুর শোবার ঘরে মাথার কাছে এক প্রৌঢ়া মহিলার ছবি রয়েছে, ডঃ শিপেনের ছবি।"

চিঁড়ে বৌদি টেলিফোন নামিয়ে দিলেন। আমিও কুড়েমি কাটিয়ে দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিলাম।

একটু পরেই তপন ফিরে এলো। সঙ্গে সুচরিতাও আছে। শুনলাম, সুচরিতা ব্রেকফাস্টে আসতে চাইছিল না। মামার কথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত তপনের অনুরোধ রেখেছে।

আমাদের দুজনকে চটপট টেবিলে বসিয়ে দিয়ে তপন সুগৃহিনীর মতো খাবারদাবার জড়ো করে ফেললো। খুকুকে কিছুই করতে দিলো না। খুকু বললো, "বেশ, আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকছি। কিছু ভুল হলে কিন্তু সমালোচনা করবো। আমার মামা যে কিরকম দুর্মুখ তা তো জানেন না।"

ফলের রস ঢালতে-ঢালতে তপন বললো, "এ দেশে কোন্ ছেলে না ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে জানে? সংসারের কাজকর্ম একটু-আধটু না জানলে আজকাল বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে। আমেরিকানদের অধঃপতনের ইতিহাস সম্পর্কে যেদিন অনুসন্ধান হবে, মার্কিন মেয়েদের হেঁসেল-বিমুখতা সম্পর্কে সেদিন অনেক কথা লিখতে হবে!"

কথাগুলো আমার ভাল লাগলো না। ছোকরা কি তাহলে আমেরিকান কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলছে? চিঁড়ে বৌদি ইণ্ডিয়ান ছেলেদের মন ভোলাবার সময় প্রায় এদিকটার ওপর জোর দেন। "সত্যি কথা বলছি ভাই, তোমরা আমেরিকান বউ বিয়ে করলেও রাখতে পারবে না। আমাদের দেশের সব ছেলেই এক একটি নবাববাহাদুর। যারা জীবনে এক গেলাস জল গড়িয়ে খায় না, হেঁসেলের ভেতরে যারা কখনও ঢোকে না, মেমসায়েব বে করলে তাদের কপালে অনন্ত দুর্গতি। একবার যদি বিয়ে ভাঙে, কোনো ইণ্ডিয়ান মেয়ে তোমাদের বিয়ে করবে না, এটা বলে রাখছি।"

ব্রেকফাস্টের পর তপনের সঙ্গে নার্সিং হোমে হাজির হলাম। ইনভ্যালিড চেয়ারে তিন-চারজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ভোরবেলায় রৌদ্র উপভোগ করছেন। এঁদের মধ্যে দুজন এতই শীর্ণ যে চেয়ারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। তপন

বললো, "এঁদের বয়স নব্বুই। দুজনে হরিহর আত্মা ছিলেন। একই ইস্কুলে পড়েছেন, একই জায়গায় বাড়ি করেছিলেন, একই সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। এখানেও এসেছিলেন এক সঙ্গে। এখন ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেন না। দুজনেই আমাদের কাছে দুজনের নামে অভিযোগ করেন। দুজনেই ভয় দেখান, হোম ছেড়ে চলে যাবেন।"

এবার আমরা একটা ছোট হলঘরে ঢুকে পড়লাম। ফিজিওথেরাপি বিভাগটি যেন ছোটখাট একটি কারখানা। একজন ভদ্রলোক কাঠের থাম ধরে আস্তে আস্তে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আবার কম্পিত দেহে অতিসন্তর্পণে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। তপন ওঁর কাছে গিয়ে সুপ্রভাত জানালো। জিজ্ঞেস করলে, "ক'বার চেষ্টা করলেন ?"

ভদ্রলোক বললেন, "দশ বার হলো ডাক্তার।"

"তাহলে আজকের মত বিশ্রাম নিন।"

"আমি আরও কয়েকবার চেষ্টা করতে পারি কি ? আমি যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করছি। "তোমার কি মনে হয়, আমি হাঁটতে পারবো ?"

তপন ওঁকে আশ্বাস দেয়, ""আমরা তাই তো আশা করি—বড়দিনের সময় আপনি পায়ে হেঁটে আমাদের পার্টিতে আসতে পারবেন।" ভদ্রলোকের ম্লান মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, খুঁটি ধরে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন।

তপন আমাকে বললো, "ঈশ্বরের কি খেয়াল! এই ভদ্রলোক যৌবনে চ্যাম্পিয়ান দৌড়বীর ছিলেন, অলিম্পিক থেকে দৌড়ের মেডেল এনেছেন।"

আর এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে-বসে চোখ বুঁজে চরকার মতো চাকা ঘুরিয়ে চলেছেন। কোনোদিকে তাঁর খেয়াল নেই—তপন বললো, "ইনি একসময় সেনেটের প্রখ্যাত সদস্য ছিলেন। এখন একেবারে নিঃসঙ্গ। তার ওপর কানে শুনতে পান না।"

আমাদের দেখেই সেনেটর পকেট থেকে নোটবুক বার করে ফেললেন।

তাতে কি একটা লিখে তপনের হাতে দিলেন। "সুপ্রভাত। ডাক্তার, আজ বেশ সুস্থ বোধ করছি।"

ডাক্তার লিখলো, "ক্রমশঃ আরও সুস্থ বোধ করবেন। জীবনে কত কি দেখবার রয়েছে আপনার।"

সেনেটর লেখা পড়ে হাসলেন। আবার একটু লিখে খাতাটা আমার হাতে দিলেন। "মানুষকে শাস্তি দেবার জন্যে ঈশ্বর বার্ধক্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এই হলটা নরকের কামারশালার মতন দেখাচ্ছে না কি?"

ওঁর লেখাটা পড়ে মন খারাপ হয়ে গেলো। আমি ওঁর খাতার লিখলাম, "একদিন আমরা সবাই বৃদ্ধ হবো।"

সেনেটর আমার লেখাটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। ওঁর মুখে অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি লিখলেন, "সব যুবকই সৌজন্যের খাতিরে ওই কথা বলে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না সে বুড়ো হবে।" সেনেটর আর আমাদের দিকে তাকালেন না, নিজের মনে চাকা ঘোরাতে লাগলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তপন বললো, "বৃদ্ধদের না দেখলে জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় না। এঁরা সবাই জরার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন এবং ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাঁচবার আগ্রহ প্রবল। সুচরিতা একটা কবিতা বলে, আমার খুব ভাল লাগে—*I do not Pity the dead, I Pity the dying...Dying is the best of all the arts that men learn in a dead place.*"

অন্য একটা ঘরে ঢোকা গেলো। কালো চশমা পরে দুই কুব্জ বৃদ্ধ আপন মনে কথা বলে চলেছেন। প্রথম বৃদ্ধ: "ছেলে কালকেও ফোন করেছিল। অনেকক্ষণ কথা হলো। সামনের রবিবার আসতে চাচ্ছিল। আমি বললাম, তুমি এলে আমি বিরক্ত হবো। একটা মাত্র ছুটির দিন, তুমি নিজে আনন্দ করো, শুধু-শুধু আমার জন্য নষ্ট কোরো না।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধ: "আমার ছেলেও কালকে ফোন করেছিল। বৌমা নিজেও সব খবরাখবর নিলেন। আমাকেও ওরা একদিন বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। আমি বললাম, এখন নয়। বড়দিনের সময় চেষ্টা করবো। তাতে ছেলে খুব রাগ করলো।"

"রেগে যাবারই তো কথা", প্রথম বৃদ্ধ সায় দিলেন।

তপন ও আমি পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম। তপন বললো এঁরা দুজনেই প্রায় অন্ধ। এঁদের ছেলেরা কেউ খোঁজখবর নেয় না। মিসেস টমলিন ছেলেদের কাছে ফোনে প্রায়ই অনুরোধ করেন। এঁরা কিন্তু দুজনেই দুজনের কাছে অভিনয় করে যাচ্ছেন। বুড়ো বয়সে আত্মসম্মান বোধ তীব্র হয়ে ওঠে।"

তপন এবার ঘড়ির দিকে তাকালো। কিছুক্ষণের জন্যে তাকে মেডিক্যাল সেণ্টারে যেতে হবে। ডঃ শিপেনের সঙ্গে মিটিং আছে—সুগ্রীবকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে—অপারেশনে কোনো লাভ হয়েছে কিনা আজ বোঝা যাবে।

ওকে হাসপাতালে রওনা করে দিয়ে আমি গোল্ডেন হোমে ফিরছি। পথে খুকুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। "তোমার খোঁজেই যাচ্ছিলাম। মিস্টার রাইটের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনি আমার সঙ্গে একটু বেরোতে চান। ভাবলাম তোমাকে নিয়ে যাওয়া যাক।"

"মিস্টার রাইটের আপত্তি নেই তো ?" আমি জানতে চাই।

"মোটেই না", খুকু আমাকে আশ্বাস দিলো।

হাতে একটা ম্যাপ নিয়ে মিস্টার রাইট হোমের দরজার কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। ওঁকে নিয়ে আমরা খুকুর গাড়িতে এসে বসলাম।

খুকু গাড়ি ছেড়ে দিলো। মিস্টার রাইট বললেন, "আমার মৃত্যুর জন্যে আমি চিন্তা করি না—কারণ মৃত্যুটা ইনসিওর করা আছে।"

"মানে আপনার মৃত্যুর পর আপনার আত্মীয়স্বজন কিছু টাকা পাবেন ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না না, মৃত্যুসংক্রান্ত খরচের কথা বলছি। এদেশে অনেক লোকের মরবার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকে না। মৃত্যুর খরচটা এখানে খুবই বেশী", মিস্টার রাইট জানালেন।

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মিস্টার রাইট বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে রসিকতা করছি না। মৃত্যুর পর এদেশে কেউ মৃতদেহ নিজের বাড়িতে রাখে না। মৃত্যুর কথা ভেবে তো এখানকার বসতবাড়ি তৈরি হয় না—তাই জীবিত লোকের সংসারে মৃতদেহ অচল। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ফিউনারাল হোমের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

এদেশে বেশ একটি ভাল ব্যবসা। এঁদের আলাদা বাড়ি আছে—মরা মানুষদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। খবর পেলেই এঁরা মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যাবেন। আত্মীয়স্বজনদের খবর দেবেন তাঁরা; কাগজে পরের দিনই যাতে মৃত্যুসংবাদের বিজ্ঞাপন বেরোয় তার ব্যবস্থা করবেন। কোথায় ফুল পাঠাতে হবে তাও তাঁরা জানিয়ে দেন সবাইকে। মৃতদেহের 'এমবামিং'-এর ব্যবস্থা করেন তাঁরা! এমবামিং কাজটি নিতান্ত সোজা নয়—শরীর থেকে ইঞ্জেকশনের ছুঁচ দিয়ে রক্ত বার করে নিতে হয় এবং তার বদলে শিরায় কিছু ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে মৃতদেহ অনেকক্ষণ তাজা থাকে। সৎকার কোম্পানি কফিনের ব্যবস্থা করেন—তারপর পার্টির সামর্থ্য অনুযায়ী শোকযাত্রার ব্যবস্থা হয়।"

খুকু বললো, "কবর খোঁড়া, পুরোহিতের বাইবেল পাঠ, সব কিছুর জন্যেই টাকা লাগে। এমনকি কবরের জায়গাও আগাম কিনতে হয়।"

মিস্টার রাইট বললেন, "মৃত্যু ক্রমশই ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছে। তাই অনেকে বীমা নিচ্ছেন। মাস মাস প্রিমিয়ামের বদলে বীমা কোম্পানি মৃত্যুসংক্রান্ত খরচ বহন করবেন। আমাকে একটু বেশী প্রিমিয়াম দিতে হয়, কারণ আমি স্পেশ্যাল কফিন পছন্দ করেছি। ভিতরে ফোম রবারের গদি ও সিল্কের নরম চাদর থাকবে—কফিনটা দেখতেও খুব সুন্দর।"

আমাদের গাড়ি এবার গোরস্থানের কাছে এসে থামলো। দূরে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। মিস্টার রাইট বললেন, "ভদ্রলোক আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন। উনি এ-অঞ্চলের নামকরা সেলসম্যান, কবরের জমির দালালি করেন।"

প্রায় সাত ফুট লম্বা দানবের মতো চেহারা ভদ্রলোকের। নাম কাজিমির। ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো। মিস্টার রাইট বললেন, "মিস্টার কাজিমির কিছুদিন ধরে আমাকে কবরের জমি কেনবার মতলব দিচ্ছেন।"

কাজিমির ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন। "ভাল ভাল পোজিসন সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, মিস্টার রাইট। আপনি শেষে একটা মনোমত জায়গা না পেলে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না।"

নক্সা খুলে দুটো জায়গার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মিস্টার

কাজিমির। ধীরভাবে চারদিকে তাকিয়ে বেচারা মিস্টার রাইট বললেন, "১১৮ নম্বর প্লটটা আমার ভাল লাগছে।"

গভীর দুঃখ প্রকাশ করে কাজিমির জানালেন, ওই জমিটা স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিস্টার হুবার্ট অনেক আগেই কিনে ফেলেছেন। তাছাড়া ওটা ডবল প্লট—ওঁর স্ত্রীকেও পাশে কবর দেবার জায়গা হয়েছে।

১১১ নম্বর প্লটও বেশ ভাল জায়গা, কাজিমির জানালেন এটাও পাওয়া যেত না, মিস্টার বিল বল কিনে রেখেছিলেন তাঁর স্ত্রীর জন্যে। কিন্তু হঠাৎ বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় ১১০ নম্বর নিজের জন্যে রেখে, মিস্টার বল ১১১ নম্বর ছেড়ে দিচ্ছেন। জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখলেন মিস্টার রাইট। খুকুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কেমন মনে হয়?"

"খারাপ কি?" খুকু উত্তর দেয়।

"চমৎকার জায়গা", কাজিমির চিৎকার করে ওঠেন। "তবে আপনাকে সত্যি কথা বলছি, ন্যাড়া জায়গা, রোদটা বড্ড বেশী লাগবে। যদি একশ ডলার বেশী দিতে রাজী থাকেন, তাহলে গাছের ছায়ায় একটা চমৎকার প্লট দেখাতে পারি। শান্ত, শীতল পরিবেশ—বসন্তকালে গাছে প্রচুর ফুল হয়, ফুলগুলো জমির ওপর এসে পড়বে।

নতুন জমিটাও দেখলেন মিস্টার রাইট। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "মিঃ কাজিমির, রোদ আমার মোটেই সহ্য হয় না, আমি গাছের তলার জমিটাই নেবো।"

"চমৎকার। আপনি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাছাড়া পড়শি ভাল পাবেন—মিস্টার ডিকিনসন ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। মিস্টার বল, আপনি তো জানেন, কসাইখানার ম্যানেজার। বাই-দি-বাই মিস্টার ডিকিনসনের সমাধি প্রস্তরও আমরা তৈরি করছি। চমৎকার হয়েছে, চোখ জুড়িয়ে যায়। আমরা সমাধি প্রস্তরের আগাম অর্ডার পাচ্ছি অনেক। আপনি যদি অনুমতি করেন, আপনাকে একদিন ক্যাটালগ দেখিয়ে আসবো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি শতায়ু হোন, কিন্তু জানেনই তো পৃথিবীতে সবই অনিশ্চিত, কখন কি ঘটে কেউ বলতে পারে না। দূরদর্শী লোকেরা তাই সব ব্যবস্থাই আগে থেকে করে রাখেন, যাতে মরবার পরও কারুর উপরে না নির্ভর করতে হয়।"

কাজিমির আরও বললেন, "আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি মিস্টার রাইট। আপনি দেখবেন, দু-তিন বছরের মধ্যে এই প্লটের দাম চড়চড় করে উঠে যাবে।"

"আপনাদের দেশে গোরস্থানের জমির দাম কী রকম পড়ে? মিস্টার রাইট প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "আমরা হিন্দুরা দেহ পুড়িয়ে ফেলি।"

কাজিমির ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন, "আহা বেচারা! ভালই করেন আপনারা। যা গরীব দেশ আপনাদের, জমি কিনে কবর দেবার সামর্থ্য কোথায়?"

খুকু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। আমি ওকে বাধা দিলাম। যার যা খুশী বলুক না!

গাড়িতে উঠে মিস্টার রাইট বললেন, "জমিটা বেশ মনের মতো পাওয়া গিয়েছে, কী বলো?"

"ভারী সুন্দর জায়গা", আমি বললাম।

মিস্টার রাইট বললেন—"আমার বাবা যখন মারা যান, তখন টাকা কড়ি ছিল না। ফলে তাঁকে মিউনিসিপ্যালিটির খরচে কবরস্থ করা হয়। এর থেকে দুঃখের কিছু হয় না। মিউনিসিপ্যাল ফিউনারালের কথা ভাবলেই এখানকার মানুষ আঁতকে ওঠে।"

॥ ৫ ॥

তিনটে দিন কোথা দিয়ে কেটে গেলো। তপন ও সুচরিতার চেষ্টায় এবং গোল্ডেন হোমের মানুষদের অনুগ্রহে জীবনের একটা নতুন দিক আমার সামনে খুলে গেলো। তপন ছেলেটিকে আমার বেশ ভাল লাগে। ওর একটা সাবালক মন আছে, যা সব কিছু বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। আর আমাদের খুকুও এই সামান্য ক'বছরে কেমন মধুর ব্যাক্তিত্বশালিনী হয়ে উঠেছে।

এখন বাড়িতে কেউ নেই। পেট্রো একবার ফল খাইয়ে গিয়েছে। ডাইরী লিখতে বসে বিচিত্র এক অনুভূতিতে মন ভরে উঠছিল। গোরস্থানে মিস্টার রাইটের মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। পৃথিবীর সবচেয়ে

ঐশ্বর্যশালী দেশে এসে আমি এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করছি। এ-দেশে আমার আসা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল নিশ্চয়। বিদেশের আয়নায় প্রতিফলিত আমার দুঃখিনী জন্মভূমি পরম প্রিয় হয়ে উঠছেন। আমি প্রতি মুহূর্তে আরও ভারতীয় হয়ে উঠছি।

সমালোচকের ঔদ্ধত্য নিয়ে এই নবীন ঐশ্বর্যশালী সভ্যতার সামনে আমি এসে দাঁড়াইনি। তীর্থযাত্রীর মতো নতমস্তকে শিখতে এবং শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আর এসেছি মানুষকে আবিষ্কার করতে মানবতার এই নতুন তীর্থে। মানুষের কত রূপ, দেশে দেশে মানুষের মধ্যে কত পার্থক্য। আবার মানুষ কত এক। মানুষকে প্রণাম জানাই, আর কৃতজ্ঞতা জানাই ঈশ্বরকে মানুষকে দেখার এই আশ্চর্য সুযোগ দেবার জন্যে। মানুষকে ভালবেসেই যেন ধন্য হতে পারি।

টেলিফোনের বাজনায় সংবিৎ ফিরে এলো। চিঁড়ে বৌদির গলা। "কী শংকরবাবু, কোনো খবর নেই ? তপন কোথায় ?"

"এখনও ফেরেনি। সুচরিতাও নিজের কাজে বেরিয়েছে।" আমি জবাব দিই।

"আজ না আপনার যাবার দিন ?" চিঁড়ে বৌদি প্রশ্ন করেন।

"আজ্ঞে আপনার ঠিকই মনে আছে !"

"দেখুন এদের কাণ্ডকারখানা। আপনার থেকে কাজ বড়ো হলো। আরে বাপু, কাজ-পাগলা দেশে এসেছো, কাজ তো সবসময়ে থাকবে। তা বলে মামা একলা বসে থাকবে।" চিঁড়ে বৌদি বললেন, তিনি কিছুই শুনতে চান না, এখনই ওঁর বাড়িতে যেতে হবে।"

"ওরা এসে খুঁজবে।"

"খুঁজবে না, পেটোর হাতে চিঠি দিয়ে আসুন। পেটো যদিও একবার আমার চিঠি খেয়ে ফেলেছিল।"

চিঁড়ে বৌদির হুকুম অমান্য করা গেলো না। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে, পেটোর হাতে চিঠি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

চিঁড়ে বৌদি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ডঃ রতন গোস্বামী লাঞ্চ সেরে ল্যাবরেটরিতে ফিরে গিয়েছেন। আজ সবাই কাজে ব্যস্ত।

"ব্যস্ততার মাথামুণ্ড জানি না—এখানে সবাই ব্যস্তভাব দেখায়।

ব্যস্ত না থাকলে চাকরি থাকবে না।" চিঁড়ে বৌদি অভিযোগ করলেন।

চিঁড়ে বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, "একলা কী করছিলেন ?"

"ভাবছিলাম—এই বিচিত্র দেশের বিচিত্র মানুষের কথা। সামান্য কয়েকদিনে যা দেখলাম তাই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

চিঁড়ে বৌদি সন্তুষ্ট হলেন। "আপনি তো দেখছি অফিসের কথা ভাবছেন। এই সব ভাবাই তো আপনার কাজকর্ম।"

"আরও কিছু ভাববার আছে। তাজুদি যে জন্য আমাকে মেয়ের কাছে পাঠালেন তার কিছুই হলো না। মেয়ের যা ব্যক্তিত্ব হয়েছে, তাতে তো আর সেই ছোট্ট ভাগ্নীটির মতো ব্যবহার করতে পারি না। অথচ তাজুদি তিনদিন উপোস করে থেকে অমন জাগ্রত তারকেশ্বরের কবচ পাঠিয়ে দিলেন। শুনেছি হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় ওই কবচে।"

চিঁড়ে বৌদি প্রচণ্ড উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "আপনার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা আছে। কত ফন্দি রয়েছে। তপন ছেলেটিকে আপনার কেমন লাগলো ? আমার তো মনে হয় হীরের টুকরো। বিলেতে এফ-আর-সি-এস পড়বার সময় নার্সদের সঙ্গে কী করেছে জানি না, কিন্তু এখানে কোনো মেয়ের দিকে তাকায় না। কিন্তু ওই বুড়ী ডাক্তার শিপেন সম্বন্ধে আমার ভয় আছে। কিন্তু এও বলে রাখছি, আমি এখানে থাকতে ওসব হতে দিচ্ছি না।"

"আপনি ওর মনের খবর নিয়েছেন ?" আমি জানতে চাই।

"নিইনি আবার ! আমি কি আর নিজের কাজ করে যাচ্ছি না ? খাইয়ে খাইয়ে পেটের কথা বার করে ফেলি। আপনিই না লিখেছেন, খাওয়ার টেবিলে এবং শোয়ার বিছানায় পুরুষ-মানুষের ওয়াটার্লু রচিত হয়।"

আমি চুপচাপ থাকি।

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "ছোকরা বড্ড চাপা—কিছুতেই স্বীকার করবে না। আমার জেরার চোটে সুচরিতা সম্পর্কে মনোভাবটা শেষপর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো !"

"প্রেম নাকি ?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"ওই মেয়ে-ছাড়া-বিয়ে করবো না ভাব! তা সুচরিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, বেচারার মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললো,

আগামীকাল মামা আসছেন, এখন অন্য কিছু ভাববার সময় নেই। মামা এই সব জানলে, ভাববে বিদেশে লেখাপড়া ছেড়ে ওই সবই করছি।"

"তপনের মনের অবস্থাটা খুকু জানে?" আমি প্রশ্ন করি।

"ওটা গোপন আছে, তপনের দিব্যি রয়েছে আমার ওপর। সারা জীবন ফার্স্ট হয়ে-হয়ে অভ্যাস খারাপ করে ফেলেছে, কোনো পরীক্ষায় ফেল হতে চায় না।"

"খুকুর মনের অবস্থাও জানা দরকার। এয়ারপোর্টে একটা দশাসুর ইয়াংকি বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে এসেছিল। তাজুদি আমাদের একটু সেকেলে ধরনের, অমন ছেলেকে মেয়ে হার্ট দিয়েছে শুনলে ওঁর নিজের হার্ট ফেল হয়ে যাবে।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "আপনি কি ধরনের মামা? বিদেশে দু'দিনের জন্যে এসে ভাগ্নীর মঙ্গলের কথা ভাবছেন না, শুধু নিজের গল্পের প্লট যোগাড় করে বেড়াচ্ছেন? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তো এয়ারপোর্টে চলে যাবেন। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।"

চিঁড়ে বৌদি সত্যি করিৎকর্মা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন মাধ্যমে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। বললেন, "এই ঠিক হলো, আপনি সুচরিতার গাড়িতে এয়ারপোর্টে যাবেন। সেই গাড়িতে কেউ থাকবে না। আমি তপনের ঘাড়ে চাপছি। অফিসিয়াল কারণ, আমার গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "আমার একটু দুশ্চিন্তা থেকে যাচ্ছে। তপনের হৃদয়ে *To Let* বোর্ড এখনও ঝুলছে তো? ডঃ শিপেনের যেসব কথা বললেন।"

চিঁড়ে বৌদি বললেন, "গাড়িতে আমি কাজ সেরে রাখবো।"

খুকুর গাড়ি দ্রুতবেগে এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে পরে রইলো গোল্ডেন হোম এবং তার অধিবাসীরা। খুকুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল সেন্টার শেষবারের মতো দেখে নিলাম। মনটা খারাপ লাগছে। এই ক'দিনেই এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। এঁরা আমার মানসচক্ষু খুলে দিয়েছেন—এতদিন শুধু নীতিকথায় পড়েছি, এই প্রথম বুঝতে পারলাম, পয়সা থাকলেই জীবনে সব থাকলো না।

খুকুর এখন বাড়ির কথা মনে পড়ছে। ঘরের লোককে দেখলে ঘরে ফেরার আকর্ষণ বেড়ে যায়। খুকু বললো "মার ব্লাড প্রেসারটা নিয়মিত

চেক করতে বোলো। দাদার ছেলে পল্টুর জন্যে যে বেবি ড্রেসটা দিলাম তা গায়ে হলো কিনা জানিও।”

আমরা প্রায় এয়ারপোর্টে এসে পড়েছি। এবার কথা না তুললে নয়। বললাম, “সবই হলো, কিন্তু তোর সম্বন্ধে তাজুদিকে কি বলবো?”

“দেখেই তো গেলে। বলবে বেশ ভালই আছি। কপাল ভাল থাকলে কয়েক মাসের মধ্যেই ডক্টরেট পাবো।

“কিন্তু তুই তো জানিস, ছেলেদের চাকরি এবং মেয়েদের স্বামী না-হওয়া পর্যন্ত মায়েরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না।”

“মামা, তুমি জ্বালিয়ো না।”

“জ্বালাবো কী? তাজুদির তো আর কোনো দুঃখ নেই। শুধু বলে, ওই মেয়েই আমার গলায় কাঁটা হয়ে আটকে রয়েছে। তা কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে তো।”

খুকু মিটমিট করে হাসতে লাগলো। আমি এবার বলেই ফেললাম, “তপন ছেলেটিকে তোর কেমন লাগে?”

খুকুর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ও-যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি; একমনে ড্রাইভ করে যাচ্ছে।

“হ্যাঁরে, কিছু বল”, আমি তাগাদা দিই।

খুকু এবার মুখ খুললো। “নিশ্চয় চিঁড়ে বৌদির কর্ম—তোমাকে লাগিয়েছে।”

“চিঁড়ে বৌদি কেন? এই ক'দিন তো তপনকে দুবেলা দেখলাম।”

“তোমার কেমন লাগলো ভদ্রলোককে?” খুকু এবার বাঁ হাতে কপালের চুলগুলো সরিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

“বুঝতেই পারছিস, আমার ভাল না লাগলে কথাটাই তুলতাম না, “আমি উত্তর দিই। “ছেলেটার মধ্যে বেশ গাম্ভীর্য আছে, অথচ সহজ-সরল।”

“হ্যাঁ, অন্তত হ্যাংলামো নেই—ক্যামপাসে ছেলে তো কম দেখলাম না,” খুকু গম্ভীরভাবে বললো, যদিও ওর কান দুটো এখনও লাল হয়ে রয়েছে।

“তাছাড়া দু'জনেই একই সাধনায় ব্যস্ত রয়েছিস,” আমি বলি।

খুকু ইচ্ছে করেই বোধহয় উত্তর দিলো না। কিন্তু ওর মনের কথা বুঝে নিতে আমার মোটেই অসুবিধা হলো না।

একটু পরেই চিঁড়ে বৌদি এয়ারপোর্টে হাজির হলেন। প্লেন ছাড়তে বেশী দেরি নেই। চিঁড়ে বৌদি হাঁপাতে হাঁপাতে আসছেন, তপনকে পিছনে ফেলে রেখে।

আমার হাত ধরে বললেন, "হুঁ হুঁ বাবা, সব জেনে নিয়েছি। হৃদয়ে শুধু সুচরিতা আর সুচরিতা! তবে সুচরিতা রাজী না হলে, মনের দুঃখে যদি ডঃ শিপেনকে বিয়ে করে আমি তাহলে দোষ দেবো না"

পাত্রীপক্ষের খবরও দিলাম আমি। চিঁড়ে বৌদি এবার দ্বিগুণ উৎসাহে পাত্র-পাত্রীকে আমার সামনে টেনে হাজির করলেন এবং বীরবিক্রমে ঘোষণা করলেন—"তা হলে, কলকাতায় ফিরে আপনি বাবা-মায়ের মতামত নিয়ে আমাকে জানাচ্ছেন।"

"মতামতের দরকার নেই—সুচরিতার মা আমাকে ব্ল্যাংক চেক দিয়েছেন। এই দেখুন কাল যে চিঠি এসেছে। পাল্টি ঘরের পছন্দসই পাত্র পেলে ফাইন্যাল সিদ্ধান্ত নেবার পাওয়ার-অফ-অ্যাটর্নি আমার রয়েছে।"

চিঁড়ে বৌদি এবার তপনকে বকুনি লাগালেন, "হাঁ করে দেখছো কি? শংকর মামাকে প্রণাম করো।"

তপনের মধ্যে লজ্জা লজ্জা ভাব এসেছে। সে মাথা নিচু করে আমার পায়ে হাত দিলো। তারপর সুচরিতা। আমি ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলাম।

এদিকে এরোপ্লেনে ঢোকবার জন্য মাইকে ঘোষণা হলো।

"আপনি এগোন। খুকুর থীসিস তৈরি হয়ে গেলেই, তিন-চার মাসের মধ্যে দুজনকে দেশে পাঠাচ্ছি। কিন্তু ঘটকী বিদায়ের কথাটা ভুলে যাবেন না।" চিঁড়ে বৌদি এয়ারপোর্টে হুংকার ছাড়লেন।

এরোপ্লেনের জানালা দিয়ে দেখলাম, সুচরিতা আর তপনকে দুধারে নিয়ে চিঁড়ে বৌদি আমাদের প্লেনের দিকে তাকিয়ে আছেন! ওরা সবাই হাত নাড়তে আরম্ভ করলো।

আমেরিকা প্রবাসের স্মরণীয় এক অধ্যায়কে চিরদিনের মতো পিছনে ফেলে রেখে আমাদের বোয়িং প্লেন রানওয়ে ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলো।

জাপানে কয়েকদিন

এই পরিচ্ছেদের নাম হওয়া উচিত ছিল : "জাপানে"—অথবা "পূর্ব পাকিস্থানের জালাল আমেদের সঙ্গে কয়েকদিন।" কিন্তু স্থান সংক্ষেপের জন্যে "জাপানে" এবং "কয়েকদিন" রেখে জালাল আমেদকে পরিত্যাগ করতে হলো।

জালালের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিকাশ বিশ্বাস। আর বিকাশের খবর দিয়েছিলেন "দেশ" পত্রিকার শ্রীসাগরময় ঘোষ। সাগরদা বলেছিলেন, "ইংলণ্ড হয়ে যখন আমেরিকা ভ্রমণে যাচ্ছো তখন ফেরার পথে জাপানে কয়েকটা দিন কাটাতে ভুলো না।"

ভ্রমণের ব্যাপারে আমি যে খুবই কুঁড়ে সাগরদা তা জানতেন। আমার মুখের ভাব দেখে তাঁর বুঝতে দেরি হয়নি যে প্রস্তাবটা আমাকে খুব উৎসাহিত করছে না। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিখুঁত হবার প্রচেষ্টায় প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে সাগরদা খসখস করে একটা ঠিকানা লিখে দিয়ে বলেছিলেন, "এইটা কাছে রাখো, যদি জাপান যাওয়ার মন করো তাহলে বিকাশ তোমার কাজে লাগবে।"

সাগরদা বললেন, "বিকাশের লেখা নিশ্চয় পড়ে থাকো—আমাদের টোকিও প্রতিনিধি, টোকিওর চিঠি লিখে থাকে।"

ওটা তাহলে আসল নাম! বিকাশ এবং বিশ্বাস-এর মিল দেখে আমার ধারণা ছিল এটাও কোনো ছদ্মনাম।

মার্কিন দেশে কয়েকদিন কাটিয়েই অজানা অচেনা দেশ যত্রতত্র ভ্রমণের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলাম। খাঁচার পাখী উড়তে শিখে গেলো। একজন রসিক মার্কিনী বললেন, "জানোই তো, আমাদের বলা হয় 'এ নেশন অন হুইলস'—সমস্ত জাতটাই মোটরগাড়ির চাকার ওপর রয়েছে। দুষ্টু লোকরা বলে—গাড়িতেই আমাদের জন্ম এবং গাড়িতেই মৃত্যু। চিন্তাশীলরা

বলেন—চরৈবেতির দেশ। শুধু চলো, চলো। থেমে যাওয়াটাই মৃত্যুর লক্ষণ।"

এই ভবঘুরে ভাবটা ছোঁয়াচে ব্যাধি। মার্কিন মেজাজে আমিও তাই একখানা এয়ার-লেটার ফর্মে বিকাশবাবুকে চিঠি লিখে দিলাম—টোকিওর কোনো গেরস্ত হোটেলে অথবা কোনো সাবেকী জাপানী সরাইখানায় আমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে।

কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তর এসে গেলো। বিকাশবাবু আমার মোটেই অপরিচিত নন—আমাদের এক কমন বন্ধু কাশুন্দিয়া নিবাসী; এই ভেজালের যুগে ধর্মতলা স্ট্রীটের যে-দোকান থেকে ওষুধ কিনে আমি প্রাণরক্ষা করে থাকি তার পরিচালকও বিকাশের বন্ধু; এবং তার মেশোমশায় একদা আমার সহকর্মী ছিলেন। বিকাশ আশ্বাস দিয়েছেন, "জাপান নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। শুধু প্লেনের তারিখ ও ফ্লাইট নম্বরটা দিয়ে দেবেন। এখন মন দিয়ে মার্কিন দেশ দর্শন করুন।"

খুকুর ওখান থেকে বেরিয়ে ওমাহা, ওহিও, সানফ্রানসিসকো, সিয়াটল ভ্রমণ করে হাওয়াইতে হাজির হয়েছিলাম। এসব জায়গায় কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন হলো যা এই অধ্যায়ে বলতে আরম্ভ করে বইয়ের আকার বাড়াতে চাই না।

হাওয়াই থেকে যথাসময়ে বিকাশবাবুর কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম—সোমবার দুপুরবেলায় প্যান আমেরিকান বিমানে টোকিও রওনা হচ্ছি।

প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে উদিত সূর্যের দেশে পৌঁছতে আজকালকার বোয়িং ৭০৭ জেট বিমানের মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগে। সেই কয়েক ঘণ্টা বই পড়ে কাটিয়ে দিয়ে টোকিও বিমান বন্দরে অবতরণ করা গেলো। স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট ও কাস্টমস-এর বেড়াজাল পেরিয়ে বাইরে আসতেই দেখলাম অদূরে একজন বাদামী রঙের যুবক অপেক্ষা করছেন। তিনি যে বিকাশ বিশ্বাস হবেন সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

ট্যাক্সিতে মালপত্র তুলে বিকাশ বললেন, "বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আপনাকে নিয়ে।"

বললাম, "সে কি! জানেন তো প্যান আমেরিকান নিজেদের পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজ্ঞ বিমান কোম্পানি বলে দাবি করেন! আর আমাদের

বোয়িং ৭০৭ দেরি তো দূরের কথা কয়েক মিনিট আগেই ভূমিস্পর্শ করছে।

বিকাশ বললেন, "দোষটা প্যান আমেরিকানের নয়, আমার ভূগোল-জ্ঞানের। আপনি লিখেছেন সোমবারের দুপুরবেলার প্লেনে চড়ছেন! তাই যথারীতি সোমবারে বিকেলে আমি এয়ারপোর্ট হাজির—মাত্র কয়েক ঘণ্টার ফ্লাইট! প্লেন এলো, যাত্রীরা নামলেন, কিন্তু কোথাও কোনো বঙ্গনন্দনকে দেখতে পেলাম না। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষে ভাবলাম একবার ওদের কাউন্টারে খোঁজ করে যাই। ওখানেই ভুল ভাঙলো। ওঁরা বললেন—আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখার ব্যাপারটা তুমি খেয়াল রাখছো না। পশ্চিম দিক থেকে যেমনি তারিখ-রেখা অতিক্রম করবে অমনি একটা দিন বাড়িয়ে নিতে হবে। সোমবারে তোমার বন্ধু যাত্রা শুরু করলেও আমাদের এখানে হাজির হবেন মঙ্গলবারের বিকেলে!"

হাসতে হাসতে বিকাশ বললেন, "ভূগোলের কারচুপি। ইস্কুলে ব্যাপারটা পড়েছিলাম বটে, কিন্তু খেয়াল থাকে না। তারপর জুল ভার্নের সেই বিখ্যাত বই-এর সিনেমা—এরাউণ্ড দ্য ওয়ার্লড ইন নাইনটি ডেজ। সেখানেও ওই একদিনের গোলমালে নাটকের মধুর পরিসমাপ্তি।"

বললাম, "ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। কোনো লোক ২৬শে নভেম্বর জাপান ত্যাগ করে যদি ২৫শে নভেম্বর হাওয়াই পৌঁছয় সেটা খুবই চিন্তার কারণ। তবে এক্ষেত্রে আপনি এয়ারপোর্টে না এলেও বিশেষ গোলমাল বাধতো না, কারণ বিকাশ বিশ্বাসের ঠিকানাটা আমার জানা আছে। ঠিকানাটা যদিও খুব সহজ সরল নয়, তবু মুখস্থ বলে গেলাম "৪৭, ২-চোমে নিহনবাসি, কাবুতে-চো, চুঁ-কু, টোকিও।"

বিকাশ এবার নিবেদন করলেন, "দাদা, আমাকে 'তুমি' বলুন।"

বললাম, "তথাস্তু!"

বিকাশ বললো, "এই ঠিকানা জিনিসটা টোকিও শহরের অন্যতম রহস্য। যে লোক ঠিকানা দেখে বলতে পারে বাড়িটা কোথায় সে জাপানী রহস্যের অর্ধেক জেনে গেছে।"

বললাম, "ব্রাদার, একটু খুলে বলো। এখানে কয়েকদিন থাকতে হবে—শেষে বাড়ি হারিয়ে ফেললে কেলেংকারি।"

এবার বিভিন্ন প্রশ্ন নিক্ষেপ করে যা জানা গেলো তার সরল অর্থ রাস্তার নাম জানলেই টোকিওতে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। ৬৬ নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিন্যু মানে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে গিয়ে ৬৬ নম্বর বাড়ি খুঁজে বার করলাম, অত সহজ নয়। টোকিওর একই রাস্তায় হয়তো তিনটে বাড়ির একই নম্বর এবং ৬৩ নম্বর খুঁজে পেলে যে ৬৬ নম্বর আর বেশিদূর হতে পারে না, এমন ভরসাও নেই। কারণ ৬৩ নম্বরের পরেই হয়তো ২১। এই নম্বর নির্ভর করে কোনো সময়ে বাড়িটা তৈরি হয়েছে তার ওপর—অর্থাৎ নম্বর থেকে খানিকটা বাড়ির বয়সের আন্দাজ মিলতে পারে। সোজা কথায়, টোকিওতে গৃহ অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে যে জিনিসটির দিকে নজর দিতে হবে সেটি হলো "চো"। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। টোকিওর নাম-করা হোটেল নিকাৎসু হোটেল। ঠিকানা—

১, ১-চোমে,
ইউরাকু-চো
চিওদা কু
টোকিও।

কু মানে, এই হোটেল চিওদা ওয়ার্ডে অবস্থিত। তারপর "চো" সন্ধান করুন। 'চো' পাবার পর কত নম্বর চোমে বা ব্লক এবং অবশেষে বাড়ির নম্বর। এত সন্ধানের পরও দেখবেন একই চোমেতে দু'খানা বাড়িরই একই নম্বর। আরও একটু অসুবিধে আছে। বেশির ভাগ বাড়িতেই বাইরে কোনো নম্বর লেখা নেই। কিছুকাল ধরে টোকিওতে মার্কিন পদ্ধতিতে রাস্তার ও বাড়ির নম্বর দেবার চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার পিছনে সমগ্র বিশ্ববাসীর শুভেচ্ছা ও সমর্থন রইলো!

অত্যন্ত গোঁড়া ও স্বদেশবৎসল জাপানী একজন ভদ্রলোক আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "এইখানে মার্কিন পন্থা অনুসরণ করতে আমাদের আপত্তি নেই।"

এই ভদ্রলোককে বললাম, "তাহলে একটা গল্প শুনুন। আমাদের দেশে তখন প্রবল স্বদেশী আন্দোলন চলেছে। বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং দেশী দ্রব্যের সমাদর করো, এই হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতাদের

আহ্বান। একজন প্রবল ভক্ত বিলিতি কাপড় ছেড়ে মোটা দেশী কাপড় পরেছেন, অন্য সব দিকে স্বদেশী হওয়ার জন্যে এই একদা-শৌখিন ভদ্রলোকের সুকঠিন সংকল্প। কিন্তু মদের ব্যাপারে কী হবে? একদিন সি আর দাশের সামনে হাজির তিনি, মুখে দেশী চোলাই মদের ভয়াবহ দুর্গন্ধ। সামলাতে না পেরে একটু পরে ভদ্রলোক বমি করে ফেললেন। এবং পরম বেদনার সঙ্গে বললেন, দাশ সায়েব, এই জিনিসটা আর দেশী করবেন না।"

বিকাশ বিশ্বাস ও তাঁর সহকর্মী দিলীপ সেনগুপ্ত কোনো কথাই শোনেনি, আমাকে সোজা শিবুয়ায় জিন তাং বিল্ডিং-এর কাছে তাদের বাড়িতে এনে হাজির করেছিল। বিকাশের দুঃখ—আমি কয়েকদিন পরে এলাম না কেন, তাহলে তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর রান্না খাওয়াতে পারতো। শ্রীমতী তখন পাসপোর্ট হাতে জাপানী ভিসার জন্যে কলকাতায় মেশোমশাইয়ের বাড়িতে অপেক্ষা করছে।

বিয়ে করবার জন্যে কিছুদিন আগে বিকাশ কলকাতায় গিয়েছিল। বললাম, "তাহলে জামাই-আদর বেশীদিন ভোগ করবার চান্স পেলে না?"

বিকাশ মুখটিপে হাসছিল, কিন্তু দিলীপ বললো "বিকাশ শুধু বৌকেই দেখেছে; এখনও শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখোমুখি হয়নি।"

"হাঁউ মাউ খাঁউ। রোমান্সের গন্ধ পাঁউ! ব্যাপারটা কী? বিকাশ ব্যাপারটা খুলে বলো।" আমি আবেদন জানাই।

বিকাশ তখনও মিট মিট করে হাসছে। রসিকতা করে বললাম, "তোমাকে দেখে তো খুবই গোবেচারা মনে হয়। তুমিও কি শ্বশুর-শাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে সুভদ্রা-হরণ করলে? তোমার শক্তির প্রশংসা করতে হয়, কারণ কোথায় টৌকিও আর কোথায় টালিগঞ্জ। ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল যখন শান্তিপূর্ণ কাজে লাগানো হবে, তখনই আমরা এই ধরনের সংবাদ আশা করতে পারি।"

বিকাশ একবার মুখ খুললো। "না দাদা, আমার বিয়েটা একেবারেই গেরস্ত ব্যাপার। তবে আমার স্ত্রীর মা ও বাবা পূর্ব-পাকিস্তানে থাকেন, মেয়ের বিয়েতে তাঁদের পক্ষে পশ্চিম বাংলায় আসবার কোনো উপায় ছিল

না। ওঁরা ওখান থেকে দু'একটা চিঠি লিখেছেন—হয়তো কোনোদিনই মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাবেন না। চোখ দিয়ে জল এসে যায়।"

আমরা সবাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলাম। স্পুটনিক ও এক্সপ্লোরার যুগে মানুষ চাঁদে যেতে পারবে; অথচ ঢাকার মানুষ কলকাতায় আসতে পারবে না, কলকাতার লোক ঢাকায় যেতে পারবে না। কিন্তু আমরা দুই দেশই অতি উদার এবং আন্তর্জাতিক! আমাদের এই সিন্ধু-গঙ্গার অববাহিকা মানব-সভ্যতার লীলাক্ষেত্র।

বিকাশ বুঝলো হঠাৎ এইভাবে মুষড়ে পড়া আমাদের উচিত হচ্ছে না! সে বললো, "সুদূর বিদেশে বসে আমি কত অভিজ্ঞতা অর্জন করছি—দেশের মানুষ আপনি কত দেখেছেন, ফিরে গিয়ে আবার দেখবেন। এখন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিন, আমাদের বেরুতে হবে।"

আরও এক ঘণ্টা পরে আমরা টোকিওর রাস্তায়। রাতের টোকিও ও দিনের টোকিওর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। সমস্ত শহরটা যেন কোনো বড়ো ঘরের দুলালী—বিয়ে বাড়ির উৎসবে যাবার জন্যে আলোর জড়োয়া গহনায় সেজেছে।

দিলীপ বললো, "পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। এক কোটির ওপর লোক থাকে। টোকিওর কেন্দ্র থেকে ১০০ কিলোমিটার বৃত্ত টানলে যে অংশ হয় সেখানে দু'কোটি সত্তর লক্ষ মানুষ থাকে। এখানে সমস্ত দুনিয়ার বড়ো বড়ো দেশের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের এই শহরের নাম শুনলেই দুশ্চিন্তায় সারিডন ট্যাবলেট খেতে হয়। রেডিও টেলিভিশন টেপ-রেকর্ডার বলুন, মোটর জাহাজ ঘড়ি বলুন, সব ব্যাপারেই জাপানের জয় জয়কার। বড়ো বড়ো দেশ যারা বহুদিন 'কোয়ালিটির' নাম করে দুনিয়ার ওপর ডাণ্ডাবাজি করেছে আর তিন গুণ দামে মাল বেচেছে, তারা এখন জাপানী প্রতি-যোগিতায় নিজের ঘর সামলাতে পারছে না।"

বিকাশ বললো, "চালিয়ে যাও দিলীপ।"

দিলীপ বললো, "কল্পনা করুন—জাপানী ক্যামেরা হাতে জার্মান যুবক পার্কের গাছের তলায় জাপানী ঘড়ি-পরা সুইস বান্ধবীর ছবি তুলছে। অদূরে মেড-ইন-জাপান মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং-এ একটি হাত রেখে অন্য

হাতে ইংরেজ প্রেমিকাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে মার্কিন তরুণ। ভাবী বধূটির মৃদু সঙ্গীত জাপানী টেপ-রেকর্ডারে চিরকালের জন্য সংগৃহীত হচ্ছে। প্রিয়তমের শার্টও জাপানী।"

বিকাশ বললো, "আরও গভীরে প্রবেশ কোরো না দিলীপ, তাহলে অনেকগুলো একান্ত ব্যক্তিগত এবং অস্বস্তিকর জিনিসের নাম করতে হবে যাতে জাপানী কোম্পানীদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি।"

বললাম, "আমেরিকা ও ইয়োরোপের বাজারে জাপানী জিনিসের কি প্রতিপত্তি তা তো নিজের চোখেই দেখে এলাম। হাওয়াইতে পলিনেশিও অধিবাসীদের শিল্পকর্ম বলে যে-সব কিউরিও বিক্রি হচ্ছে তার বেশীর ভাগেই মেড-ইন জাপান ছাপ। একটা কার্টুন দেখলাম : আমেরিকায় তৈরি জিনিস কিনুন, প্রচার বিভাগের কর্মী তাঁর কর্তাকে বলছেন, 'বায় আমেরিকান' এনামেল সাইনগুলো খুব সস্তায় খুব সুন্দর ভাবে তৈরি করিয়ে এনেছি জাপান থেকে।"

দিলীপ বললো, "বিশ্বের দরবারে এশিয়ার মান-সম্মান একমাত্র জাপানই রক্ষা করেছে—আমরা তো লেকচার দেওয়া ছাড়া কিছুই করলাম না।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি ?" প্রশ্ন করি আমি।

"উচ্ছন্নে।" বিকাশ হাসতে হাসতে উত্তর দিল। তারপর বললো, "আপাততঃ এক বন্ধুর হোস্টেলে। সেখানে অনেক ভারতীয় থাকেন। বন্ধু পরীক্ষায় পাশ করেছেন—তাই আমাদের সঙ্গে আপনারও নেমন্তন্ন। আর ওইখানেই আসবে জালাল আমেদ। জালাল আমেদ রোজ আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কবে আসছেন।"

ছাত্রাবাসটিতে বিকাশের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। এখানে ট্রেনিং-এ এসেছিলেন, কাজকর্ম শেষ, এবার দেশে ফেরার পালা। যাবার আগে কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছেন। একজন জাপানী যুবক এলেন—হাতে রঙিন কাগজে মোড়া উপহারের প্যাকেট। বিকাশ বললো, "এইটাই জাপানী রীতি। নেমন্তন্ন করলে ওরা কখনো খালি হাতে আসবে না। আর এখানে যা-ই কিনুন এমন সুন্দর মোড়ক বেঁধে দেবে যে দেখলেই লোভ লাগবে। এখানে কমলালেবু পর্যন্ত বিক্রি হয়

নাইলনের তৈরি জালের ব্যাগে। ফেলতে মায়া হয়, ভাবি ইণ্ডিয়াতে বৌ ভ্যানিটি ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারতো।"

বিকাশ শুভসন্ধ্যা জানিয়ে যুবককে বললো, "মাকুদাসন কোনবানওয়া।"

এই 'সন' আমাদের 'বাবু' এবং 'দেবী'র মতো। স্ত্রী-পুরুষ সবাইকে সম্মান দিতে গেলে নামের পর 'সন' লাগাতে হয়। সানফ্রানসিসকোতে উলওয়ার্থের দোকানে একখানা জাপানী কথাবার্তার পকেট-বই কিনেছিলাম। সেইটা কাজে লাগিয়ে বললাম, "দো-জো ইয়োরোশিকু।" অর্থাৎ আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রীত হলাম।

মাকুদাসন আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে খাঁটি বাংলায় বললেন, "আপনি ভাল আছেন তো ?"

দিলীপ বললো, "মাকুদা আমাদের বিশেষ বন্ধু। আমরা ওকে একটু আধটু বাংলা শিখিয়ে নিচ্ছি, না হলে আড্ডা মারার অসুবিধে হয়। অতি চমৎকার ছেলে।"

মাকুদার মুখে হাসি লেগেই আছে। অতি অমায়িক ভাল মানুষ। কোনো সদাগরী অফিসে সামান্য কাজ করে। কিন্তু অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। বন্ধুদের বিপদে-আপদে খুব দেখে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই উপহার আনাটা কী আপনাদের সাবেকী রীতি ?"

মাকুদা হেসে বিকাশকে বললেন, "তোমার বাড়িওয়ালার ব্যাপারটা মিস্টার শংকরকে বলোনি ?"

বিকাশ বললো, "জাপানীদের মতো এমন কনসিডারেট জাত কোথাও পাবেন না। ওরা কিরকম বিবেচক শুনুন। আমাদের বাড়িওয়ালী বড়ো রাস্তার সামনের দিকটায় থাকেন। একটা সরু রাস্তা দিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে হয় দেখেছেন। ক'দিন আগে ভদ্রমহিলা বিরাট এক ফলের ব্যাগ নিয়ে দেখা করতে এলেন। ব্যাপার কী ? না, উনি বাড়িটা সারাবেন, তাই দিন-পনেরো রাস্তাটা ইট-কাঠে নোংরা হয়ে থাকবে, আমাদের অসুবিধে হবে। আর তারই ক্ষতিপূরণ হিসেবে উপহারের ঝুড়ি—অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকার ফল আছে।"

"কলকাতা বোম্বাই বা দিল্লীর কোনো বাড়িওয়ালার এমন সৌজন্য-বোধ আপনারা নাটক-নবেলে পর্যন্ত দেখাতে সাহস করবেন না, যদি না

বাড়িওয়ালার মেয়ে ইতিমধ্যে ভাড়াটের বিলেত-ফেরত ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকে।"

মাকুদাসন আমাকে তাঁদের গ্রামে নিমন্ত্রণ জানালেন। মৌখিক নিমন্ত্রণ নয়—ইতিমধ্যে তিনি বাবা-মাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, এক ভারতীয় অতিথি এক দিনের জন্যে ওখানে যেতে পারেন। শুধু একটা অসুবিধে, বাবা মা কেউ ইংরেজী জানেন না।

বিকাশ আবার মাকুদাকে নিয়ে পড়লো। "মাকুদা, তাহলে তোমার বাবাকে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে লিখি?"

মাকুদা সরসভাবে উত্তর দিলেন, "দোহাই তোমাদের, অবশ্যই লেখো।"

দিলীপ বললো, "কী করলে মাকুদা! এতদিন এই টোকিও শহরে থেকে একটা মনের মত মেয়ে নির্বাচন করতে পারলে না?"

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যেই আনন্দের হৈ-চৈ উঠলো—"মঞ্জুলিকা এসেছে, মঞ্জুলিকা এসেছে।"

মঞ্জুলিকা এসেই আমার সঙ্গে কথা বললো। "বড্ড দেরি হয়ে গেলো, যা ভিড় গাড়িতে। আমি কলকাতার মেয়ে, ইনি আমার স্বামী মিস্টার হানাড়ে। আর এই হলেন আমার ননদ, মিস হানাড়ে।"

ভারি সহজ সরল আমোদ উচ্ছল টিপিক্যাল বাঙালী মেয়ে এই মঞ্জুলিকা। তেমনি মিষ্টি ননদটি, কোনো অফিসে কাজ করে। আর মিস্টার হানাড়ে তো অজাতশত্রু, আশুতোষ। ভদ্রলোক এমন মিষ্টি হাসেন, এমন ভাবে মুখের দিকে তাকান, এমন স্নেহশীল আচরণ করেন যে অপরিচিত বলে মনেই হয় না, যেন কতদিনের আলাপ। মঞ্জুলিকার ভারতীয় বন্ধুরা বলেন, "সত্যি, তোমার শিবপুজো সার্থক হয়েছে মঞ্জু।"

স্থানীয় বাঙালী ছেলেছোকরাদের লোক্যাল গার্জেন মঞ্জুলিকাদি। বিপদে-আপদে উপদেশ, আশ্বাস ও বকুনি দিয়ে মঞ্জুলিকা সবাইকে খাড়া করে রেখেছেন। তার বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ির দুই দেশের রান্নায় বেশ হাত পাকিয়েছেন তিনি।

"ইন্দো-জাপান সম্পর্কের চলমান মনুমেণ্ট বলতে পারেন এই মঞ্জুলিকা এবং তার স্বামীকে।" ফিসফিস করে বললেন এক ভদ্রলোক।

আর এদের বিয়ের ব্যাপার, সেও এক গল্প। সে গল্প 'দেশ' না

'আনন্দবাজার' কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলায় না গিয়েও এক বাঙালী বন্ধুর মাধ্যমে জাপানী যুবক হানাড়ে বাঙালীভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর আনন্দবাজারে পাত্র-পাত্রী বিভাগে সেই ক্লাসিক বিজ্ঞাপন : "আমি একজন জাপানী যুবক···একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।"

বক্স নম্বরের এই বিজ্ঞাপনই মঞ্জুলিকার জীবনে নতুন অর্থ এনে দিয়েছিল। তারপর যেমন বাঙালী ঘরের বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। অবশেষে শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।...অতএব মহাশয় উক্ত দিবসে সবান্ধব মদীয় ভবনে আগমনপূর্বক শুভকার্য সম্পন্ন করাইয়া ও নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করিয়া বাধিত করিবেন। ইত্যাদি। বালীগঞ্জের বাঙালী মেয়ে জাপানী গৃহের বধূ হলেন অবলীলাক্রমে। মঞ্জুলিকা এখন তো স্বামীকে ব্যবসায়ে সাহায্য করে, ঘর-সংসার মাথায় করে রেখে ননদ ও দেওরদের প্রীতি উৎপাদন করে শ্বশুর-শাশুড়ীর হৃদয় জয় করে দোর্দাণ্ডপ্রতাপে সে হানাড়ে-সনের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। তবে শাড়ী ত্যাগ করে কিমনো বা স্কার্ট ধরতে পারেননি মঞ্জুলিকা—আর পারেনি বাংলায় আড্ডা মারার লোভ ছাড়তে। টোকিওতে যে সামান্য কয়েকজন বাঙালী মহিলা আছেন (যেমন শ্রীমতী জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়) মঞ্জুলিকার সঙ্গে ফোনে কথা না বললে তাঁদের চলে না।

মঞ্জুলিকার স্বাস্থ্য সম্প্রতি ভাল যাচ্ছে না, বিকাশের কাছে শুনলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে রাজী হলো বিকাশের বাড়িতে এসে একদিন রান্নার দায়িত্ব নিতে। সেদিন ওরা কিছু বন্ধুকে নিমন্ত্রণ জানাতে চায়।

এবার আসরে যাঁর আবির্ভাব হলো তিনিই যে পূর্ব-পাকিস্তানের জালাল আমেদ তা আমাকে না বলে দিলেও বুঝতে পারতাম। খাঁটি বাংলার উজ্জ্বল শ্যাম রঙ জালালের। বয়স বোধহয় তিরিশ-এর বিপজ্জনক রেখা স্পর্শ করতে চলেছে। বড়ো বড়ো দুটি চোখে সেই পদ্মের ইঙ্গিত যা বাঙালীকে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

নমস্কার করবার আগেই জালাল আমেদ দুটো বাংলা খবরের কাগজ এগিয়ে দিলেন। "এই নিন আনন্দবাজার পত্রিকা—বহুদিন নিশ্চয়

দেখেননি। কলকাতার সব খবর পেয়ে যাবেন। আর এইটে আমাদের ঢাকার দৈনিক 'সংবাদ'।"

দেশের কাগজের উপর বুভুক্ষুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম—বিদেশে মাঝে মাঝে স্টেটসম্যান ওভারসিজ উইকলি ছাড়া আর কিছুই হাতে আসেনি। গোগ্রাসে আনন্দবাজারের আটটা পাতা শেষ করে জালালের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা বোধ করছিলাম। জালাল বোধহয় মনের কথা বুঝলেন। বললেন, "শংকরবাবু, এতে বিব্রত হবার কিছু নেই—ঠিক মতো 'আনন্দবাজার' আর 'সংবাদ' না এলে আমার নিজেরও এই অবস্থা হয়। "আপনি আগ্রহী জানলে এক সপ্তাহের পুরনো কাগজ সংগ্রহ করে আনতাম।"

জালাল আমেদের কথার মধ্যে এমন অন্তরঙ্গতা আছে যে ওকে বহুদিনের পরিচিত প্রিয়জন বলে মনে হলো। অন্য সবাই তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মশগুল, সেই সুযোগে আমরা হল-ঘরের কোণে গিয়ে বসলাম। জালালকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললাম, "সারাদিন কাজ করে সোজা এসেছেন মনে হচ্ছে। শুধু শুধু কষ্ট করলেন।"

জালাল হাসলেন। "কাজ তো সারা বছরই থাকবে শংকরবাবু, কিন্তু আপনি তো টৌকিওতে থাকবেন না। আপনার সঙ্গে এমনভাবে দেখা হওয়ার সুযোগ হবে তা তো কল্পনা করিনি।"

জালাল গম্ভীর হবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ইমোশনাল বাঙালীটাকে কিছুতেই চাপা সম্ভব হচ্ছে না। এই ইমোশনটুকুই আমাদের মূলধন, আবার এই ইমোশনই জাত হিসেবে আমাদের দুর্গতির কারণ।

জালাল বললেন, "আপনার সব লেখা পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। তবে এইটুকু জানি আপনার লেখায় প্রায়ই হাওড়ার কথা থাকে। এতে ব্যক্তিগতভাবে আমি গর্ব বোধ করি।"

"মানে?" একটু অবাক হয়েই জালাল আমেদের মুখের দিকে তাকাই।

হাওড়াতেই তো আমার জন্ম। এখনও আমার ভাই-বোন ইণ্ডিয়াতে আছে—ইণ্ডিয়ান নাগরিক। আমরা চলে এসেছিলাম সেই ছোটবেলায়—তারপরও পাসপোর্ট পকেটে করে, ভিসার ছাপ নিয়ে জন্মভূমি-দর্শন করেছি।"

আমি জালালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণদের সঙ্গে আলাপ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মকবুল আমেদ, জিয়া হায়দার, বেনেডিক্ট্ গোমেজ—এদের কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

জাপানে এসেও আবার ভাগ্যের দেবতা কৃপা করলেন। জালাল আমেদের মতো যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো। জালাল বললেন, "শংকরবাবু, কলকাতা সম্বন্ধে যদি কোনো খবর জানতে চান আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি আনন্দবাজার খুঁটিয়ে পড়ি।"

বললাম, "এই দূর বিদেশেও আমার দুঃখিনী কলকাতার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। দুনিয়ার লোক কলকাতাকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছে। আর তাতে সব থেকে আনন্দ পায় তারা যারা কলকাতার নুন খেয়েছে।"

আমি বললাম, "জাত হিসেবে বাঙালী যে অন্যের চেয়ে উপাদেয় তা আমি বিশ্বাস করি না, তবে অনেকের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। আর এই পার্থক্য থেকেই অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। কোনো দূর শতাব্দীতে আমাদের এই পূর্বপ্রান্তে প্রথম রেনেশাঁর সূর্যোদয় হয়েছিল এই কথা ভেবে ডগমগ হয়ে আর কতোদিন চালানো যাবে? আমরা তিলে-তিলে নিজেদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছি, যত রকম অন্যায় অসত্যের সঙ্গে আপস করছি, অথচ আমরা সে-সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নই।"

জালাল বললেন, "আমার লেখাপড়া বিশেষ নেই। তবে কোথায় যেন পড়েছিলাম—বাঙালী একা একশো হতে পারে, কিন্তু একশোজন বাঙালী কখনও এক হতে পারে না। তাই শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতিতে আমরা প্রখ্যাত বাঙালীদের নাম গড় গড় করে বলে যেতে পারি, কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম করতে পারি না যার মধ্যে আমাদের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে।"

আমি জালালের কথায় সায় দিই। বলি, "অথচ এটা একার খেলা দেখাবার যুগ নয়—এখনকার সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির ফুটবলে টিমওয়ার্কের জয়-জয়কার।"

জালাল বললেন, "দেশকে এ-বিষয়ে অভিহিত করার দায়িত্ব তো আপনাদের। দৈনন্দিন নীচতা সংকীর্ণতার উর্দ্ধে থেকে আপনারা মানুষকে পথ দেখান। এক এক সময় হয়তো আপনাদের মনে হবে লেখা দিয়ে এই কুম্ভকর্ণকে জাগানো যাবে না—কিন্তু অন্ধকার পৃথিবীতে ছোট ছোট পাখীর কলতানই প্রভাতের বারতা বয়ে আনে। আপনারা জমি তৈরি করুন—দেখবেন মানুষের অভাব হবে না। বাঙালীদের যত দোষই থাকুক—কোনো ভাল জিনিস এখানে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নষ্ট হয়ে যায় না।"

জালালকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার দেশের খবর বলুন।"

জালাল বললেন, "দেশ-বিভাগের খারাপ দিক যতই থাকুক, এর একটা সুফল—পূর্ব-বাংলার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান আজ অনেক সুখ ও শান্তির অধিকারী হয়েছে।"

বললাম, "এটা অবশ্যই বিশেষ আনন্দের সংবাদ। মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়ালে তবে সে অন্যকে বন্ধু হিসাবে নিতে পারবে, তবে সে অন্যের মঙ্গল মন-প্রাণ দিয়ে চাইবে।"

জালাল বললেন, "সবচেয়ে যেটা ভাল লাগছে, পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীদের দৃষ্টি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে যাচ্ছে। অনেকেই কল-কারখানার কথা ভাবছে। আমারই তো ইচ্ছে দেশে ফিরে গিয়ে একটা কারখানা করবো।"

"যদি করেন আমরা আনন্দিত হবো। কলম-পেশা কেরানীর জাত আমরা—কিন্তু যেভাবে দিন পাল্টাচ্ছে, যেভাবে অটোমেশন আসছে, তাতে কেরানী বলে কোনো পদার্থই আর থাকবে না।"

জালাল বললেন, "কাজের কথাটা প্রথমে সেরে নিই। সময় করে রেডিও জাপানের স্টুডিওতে যেতে হবে আপনাকে। আপনার সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার আমরা বাংলা ভাষায় প্রচার করতে চাই।"

"আপনার সঙ্গে রেডিও জাপানের সম্পর্ক?" আমি প্রশ্ন করি।

"আমি রেডিও জাপানের বাংলা প্রোগ্রামের ভারপ্রাপ্ত। তাছাড়া আমি পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। তবে এ ছাড়াও নিজের আদি কাজ আছে যার জন্যে একদিন পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে

জাপানে হাজির হয়েছিলাম। সে-সব গল্প সময়মতো আপনাকে বলবো একদিন।"

জালালের সঙ্গে তখন আমি যাকে বলে বেশ জমে গিয়েছি। অন্যান্য বন্ধুরা ক্ষমাসুন্দর চক্ষে এতক্ষণ আমাদের মার্জনা করেছিলেন, কিন্তু খাওয়ার সময় এসে গেলো। আমাদের আলোচনায় ইতি টানতে হলো সেদিন।

বিকাশবাবুর বাড়িতেই আবার জালালের সঙ্গে দেখা হলো। জালাল সেদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এক জাপানী ভদ্রমহিলাকে—মিসেস ইয়ামাদা। বিবাহিতা মধ্যবয়সিনী এই মহিলা আমাদের দেশে না এসেও অপূর্ব বাংলা রপ্ত করেছেন। বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র থেকে গড় গড় করে কোটেশন দিলেন। আধুনিক বাংলা লেখার সঙ্গেও তিনি বেশ পরিচিতা।

আমাকে এক কোণে টেনে নিয়ে জালাল বললেন, "রেডিও জাপানে ইনি আমার সহকর্মী! বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনন্ত আগ্রহ—আমার দুঃখ, আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে এঁদের আলাপের সুযোগ করে দিতে পারি না। বাংলা ভাষাকে নিজের জীবন দিয়ে ভালবাসি—কিন্তু আমার বাংলা বিদ্যে আর কতটুকু।"

আমি বললাম, "বাংলা ভাষার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় কাজ আপনি করছেন জালাল ভাই। দেশে বসে দু'চারখানা নাটক নোবেল লেখা থেকে আপনার কাজটাকে ছোট করে দেখবার কোনো যুক্তি নেই।"

"শংকরবাবু, অত স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি না, তবে বাংলা যে আমার মায়ের ভাষা, এর প্রতি আমার যে ঋণ আছে, তা প্রায়ই মনে পড়ে যায়। হায় রে, আপনাদের মতো বাংলা যদি আমার দখলে থাকতো তাহলে কি ভালই না হতো।"

জালাল আমেদের মুখের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। তিনি যে হৃদয়ের আবেগেই কথা বলে যাচ্ছেন তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছিল না। জালাল এবার নিজের কথায় ফিরে এলেন। "রেডিও জাপান থেকে আপনার সাক্ষাৎকারের কথাটা ভুলবেন না যেন! হয় আমি না হয় আমাদের অফিসের কেউ এসে আপনাকে বিকাশবাবুর বাড়ি থেকে নিয়ে যাব।"

তারিখটা ঠিক হয়েছিল আমার জাপান ছেড়ে হংকং-এ যাবার ঠিক আগের দিন। ইতিমধ্যে ঘুরে ফিরে টোকিওর রূপ কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমার প্রিয়বন্ধু সুব্রতর মতে পদযাত্রাই কোনো দেশকে জানার একমাত্র উপায়। সুব্রত চার প্রকার পদযাত্রার প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকে,—প্রাতঃ-ভ্রমণ, মধ্যাহ্ন-ভ্রমণ সান্ধ্য-ভ্রমণ এবং নিশীথ-ভ্রমণ। টোকিওতে সর্বপ্রকার ভ্রমণ কিছুটা করেছি। তা ছাড়া টোকিওতে জাপান ট্যুরিষ্ট বিভাগের আয়োজিত টোকিও দর্শনেও অংশ নিয়েছি। এবং সুযোগ বুঝে 'বুলেট' নামে বিখ্যাত পৃথিবীর দ্রুততম ট্রেনে চড়ে জাপানের সাংস্কৃতিক রাজধানী কিয়টো ঘুরে এসেছি।

সেদিন জাপান লজ্জাবতী বধুর মতো কুয়াশা ও মেঘের ঘোমটা টেনে নিজেকে আমার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখেছিল। এত ঘন কুয়াশা আমি জীবনে কখনও দেখিনি, এক ফুট দূরের জিনিসও দেখা যায় না—মনে হচ্ছিল মেঘের মধ্য দিয়ে দ্রুতগামী জেট বিমান ছুটে চলেছে।

বিকাশের মুখেই শুনেছিলাম, জাপানে বর্তমানে ইংরিজি ভাষার বড়োই কদর। লক্ষপতি হবার সবচেয়ে সহজ উপায়—"ইংরিজী শিখুন" নামে কোনো বই লেখা। আরও শুনেছিলাম, সন্ধ্যেবেলায় বেচারাকে প্রায়ই বিব্রত হতে হয়। কোনো না কোনো স্বল্প-পরিচিত ইংরিজি শিক্ষাভিলাষী জাপানী ভদ্রলোক টেলিফোন করে বসবেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নিজের ইংরিজীটা আর একটু সড়গড় করে নেওয়া। দিলীপ হাসতে হাসতে বলেছিল, "ট্রেনে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না, দেখবেন ইংরিজীতে কথা বলার সুযোগের জন্যে কেউ না কেউ আপনার বন্ধু হয়ে যাবে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। বিদেশীদের সাহায্য করবার জন্যে জাপানীরা সব সময় উদ্‌গ্রীব। তার উপর কপাল গুণে আমার পাশে যাঁর সীট পড়েছিল তিনি ভারতবর্ষের ব্যবসায়িক দিকের কিছুটা খোঁজখবর রাখেন। ভদ্রলোক প্রথম দিকে একটু সাবধানে কথাবার্তা বলছিলেন। আমি তাঁকে বোঝালাম যে আমি ব্যবসা করি না, সরকারী কর্মচারীও নই—সাধারণ একজন লেখক হিসেবে নতুন দেশ দেখতে এবং নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে আমার নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছি। ধরা যাক, ভদ্রলোকের নাম আকুচি।

আকুচি বললেন, "কিছু মনে করো না, তোমাদের দেশ সম্বন্ধে যা পড়ি এবং যা চোখে দেখি তাতে মিল খুঁজে পাই না। আমরা পড়ি বুদ্ধ, গান্ধী, টেগোরের কথা, আর চোখে দেখি সরকারী এবং বেসরকারী ইণ্ডিয়ানদের যারা মাল বেচতে অথবা কিনতে এখানে আসে। ভাবী ক্রেতাদের আদর-আপ্যায়ন করাটা জাপানী ব্যবসায়ের রীতি—কিন্তু ইণ্ডিয়ার ক্ষেত্রে ভাবী বিক্রেতাকে খাওয়াতে হয়। কারণ তাদের পকেটে পয়সা থাকে না, অথচ..." আকুচি এখানে হঠাৎ থেমে গেলেন।

বুঝলাম, ভদ্রলোক সঙ্কোচ বোধ করছেন। বললাম, "আমার দেশের মানুষদের সম্বন্ধে যা জানেন যদি বলেন আমার উপকার হয়। আমি কিছু আপনার নামধাম ফাঁস করে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তোলাচ্ছি না।"

আকুচি বললেন, "যা বলতে চাইছিলাম, পকেটে পয়সা না থাকলেও এঁদের মনে নানা রকম ইচ্ছে থাকে। জাপানে আমরা যারা বিজনেস করি তারা ধরে নিই মানুষের মনে নানা ইচ্ছে থাকে—তার কিছুটা চরিতার্থ করতে পারলে একটু ভাল দাম পাওয়া যায়, বেশী অর্ডার আসে। আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে মুখে এঁরা সাত্ত্বিক, চিঠিতে ততোধিক সাত্ত্বিক, কিন্তু মনের অপ্রকাশিত ইচ্ছে আন্দাজ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী মনোরঞ্জন না করলে কাজ হাসিল হয় না।

আমি এবার বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। ওঁকে আরও একটু আলোকপাত করতে অনুরোধ করলাম। উনি বললেন, "মনে রাখবেন কিন্তু সব ইণ্ডিয়ানই যে এমন তা বলছি না। অনেকেই খুব ঝানু ব্যবসাদার। অন্যদের আমি তিনভাগ করে থাকি। (ক) যাঁরা কাজ-কর্মের মধ্যেই জানিয়ে দেন স্ত্রীকে একছড়া জাপানী মুক্তোর মালা দিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে-কোনো মুক্তোই চলবে—তবে 'মিকিমটো'র দোকান থেকে নিলে চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। অথবা (খ) এখন তো কাজ। সন্ধ্যেবেলায় আমি নিঃসঙ্গ বোধ করি। জাপানী 'হোস্টেস'দের রহস্যটা কী? আচ্ছা 'গীসা'রা কি শুধু নাচ গানই করে? না, ওদের সম্বন্ধে যেসব খবর শোনা যায় তা সত্যি? অথবা (গ) যাঁরা মহিলাও চান আবার যাবার আগে স্ত্রীর জন্যে মুক্তোর মালা নিতেও ভোলেন না।"

সরকারী পর্যায়ে ব্যবসা সম্বন্ধে আকুচির দেখলাম বিষম ভীতি। সামান্য এক-আধ পয়সার জন্যে বছরের পর বছর ধস্তাধস্তি করতে আমাদের সরকার নাকি অদ্বিতীয়। আর সময়জ্ঞান! সামান্য বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেও মাসের পর মাস কেটে যায়। বিশ্ব অলিম্পিকে স্লো-সাইকেল রেস থাকলে আমরা নাকি অনায়াসে প্রথম হবো।

আকুচি বললেন, "কিছু মনে করছেন না তো?"

"মনে করবো কেন? আমাদের সম্বন্ধে আপনারা কি ভাবছেন তা অবশ্যই জানা দরকার।"

আকুচি বললেন, "আমেরিকার কাছ থেকে আমরা একটা জিনিস শিখেছি—প্রোডাকটিভিটি। কতক্ষণ ধরে কত কাজ করছো তাতে কিছু আসে যায় না—মাথাপিছু কত উৎপাদন হলো তাই বলো।"

কিয়োটো ফেরার পথে এক ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। দুই দেশের সরকারী সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি খবরাখবর রাখেন। বললেন, "দেশের কাগজে দেখি, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা নাকি ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর ইমেজ বিদেশে তুলে ধরতে পারেন না। কিন্তু ভিক্ষের থলি নিয়ে যে দেশ সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি করা কোনো উকিলের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন ধরুন—আগ্রা কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রের কথা। জাপানী-দানে ও বৈজ্ঞানিক সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি খুব ভাল কাজ করছে। জাপানের প্রত্যেকটি ইস্কুলের ছেলে নিজেদের টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে কয়েক ইয়েন করে এই পরিকল্পনায় চাঁদা দিয়েছে। খুবই সাধু প্রচেষ্টা। কিন্তু ভাবুন তো এক জেনারেশন জাপানীদের মধ্যে ভারত সম্পর্কে কী ধারণা হয়ে গেল?"

আমাকে তো একটা জাপানী ছেলে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার দেশের লোকরা কুষ্ঠব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছে?"

আমার ভারতীয় সহযাত্রী বললেন, "ব্যাপারটা যেমন সত্য নয়, তেমনি মিথ্যেও নয়। আমাদের দেশের মানুষদের যখন আমরা খাওয়াতে পরাতে চিকিৎসা করাতে পারি না, তখন বাইরের কেউ দয়া করে একটা আধলা দিলে প্রেস্টিজ রক্ষার জন্যে তা প্রত্যাখ্যান করার নৈতিক বল আমি তো খুঁজে পাই না।"

রেডিও জাপানের অফিসে জালাল আমেদের সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো তখন এইসব কথাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল।

জালাল আমেদ বললেন, "কী ভাবছেন শংকরবাবু?"

"কই, কিছুই নয়। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি—কিন্তু যত দেখছি তত দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, জালাল সাহেব। দেশোদ্ধার করবার মতো মুরোদ নেই, অথচ দুদিনের আনন্দ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করছি!"

জালালের মুখে বেদনাময় হাসি ফুটে উঠলো। জালাল বললেন, "ইণ্ডিয়া ও পাকিস্তানের প্রায় এক অবস্থা। অথচ আশ্চর্য, আমরা রোগীর চিকিৎসা না করে তার ভাষা কী, জাত কী, জন্ম কোথায় এই নিয়ে চুলচেরা গবেষণা করছি। নজরুলের কোনো এক কবিতায় পড়েছিলাম, ডুবন্ত যাত্রীকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি হিন্দু না মুসলমান? কবি বলছেন, সন্তান মোরা মার।"

জালাল এবার কাজে মন দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাংলায় খবর লেখা শেষ করতে হবে। খবর লিখে জালাল বললেন, "দেখুন, যদি কোনো ভুলটুল থাকে ঠিক করে দিন। বিদ্যে নেই, কেবল গোঁ-এর জোরে বাংলা ভাষার সেবা করে যাচ্ছি।"

রেকর্ডিং রুমে যাবার সময় জালাল বললেন, "বাংলার একজন সাহিত্যিককে প্রশ্ন করবার সুযোগ পাচ্ছি এটা আমার কম আনন্দের কথা নয়। আমাদের এই প্রোগ্রাম পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার শ্রোতাদের জন্যে।"

সাক্ষাৎকারে বললাম, "ছাত্রজীবনে বিবেকানন্দ ইস্কুল থেকে প্রথম যে বই পুরস্কার পেয়েছিলাম তার নাম "জাপান-যাত্রী,' লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছাত্রাবস্থায় যে বন্ধুর বাড়িতে সবচেয়ে বেশী যেতাম তার বাবা স্বদেশীযুগের অনুপ্রেরণায় জাপানে পালিয়ে এসেছিলেন হাতের কাজ শিখতে। আরও বড়ো হয়ে ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে যে নাম বার বার শুনেছি—তিনি জাপানী শিল্পী ওকাকুরা। জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু বাঙালীর হৃদয়ে কতখানি স্থান জুড়ে আছেন তা মাপবার মতো দীর্ঘ ফিতে এখনও তৈরি হয়নি। সাম্প্রতিক কালে

রাজকাপুরের যে গানের কলিটি 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'কে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল তার প্রথমেই জাপান—মেরে জুতি হায় জাপানী, মেরে পাতলুন ইংলিশস্তানী...ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী,' আর যেদিন দেশ ছাড়লাম, তার আগের দিন আমার বন্ধু অমল সেন জানালেন, তাঁর তিনবছরের মেয়ে সারাক্ষণ গাইছে—জা-পা-ন—লাভ ইন টৌকিও।"

বললাম, "উদিত সূর্যের দেশ এশিয়ার মুখোজ্জ্বল করেছে—কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের মানুষরা জাপানের কাছে আরও অনেক বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারে। ট্রামে বাসে ট্রেনে সর্দি হলে জাপানীরা মুখে একটুকরো কাপড় বেঁধে ঘুরে বেড়ান। কলকাতার সুন্দরী শৌখিন মহিলারা এই ফ্যাশনটি চালু করলে দেশের ও দশের (কয়েকটি ওষুধ কোম্পানি ছাড়া) উপকার করবেন। আরও বললাম, কলকারখানা, কাঁচামাল ও পণ্যদ্রব্যের বিনিময় ছাড়াও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু অধিক লেন-দেন হলে আমরা সবাই উপকৃত ও আনন্দিত হতাম।"

সময় বেশী ছিল না, সাক্ষাৎকার সংক্ষেপেই সারতে হলো। রেডিও জাপানের শক্তিশালী ট্রান্সমিটার শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে আমার সামান্য কথাগুলো দুই বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ বোধ হতে লাগলো।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসার পর যিনি প্রথম অভিনন্দন জানালেন তিনি রেডিও জাপানের এশিয় কার্যসূচীর প্রধান সুমু হিরাই। আমার ইংরাজী কথার উত্তরে শুদ্ধ বাংলায় ভদ্রলোক বললেন, "আপনার 'টক' শুনে আনন্দ পেলাম।"

"অনেকদিন যে কলকাতার বৌবাজারে থাকতেন," জানালেন জালাল আমেদ।

"বারো আনা বাঙালী বলতে পারেন আমাকে", হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন সুমু হিরাই।

বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু জালাল বললেন, "এর মধ্যে কোথায় বাড়ি যাবেন? কাল এমন সময় আপনি তো আর টৌকিওতে থাকবেন না। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমার খুব ইচ্ছে আজকের সন্ধ্যেটা আপনার সঙ্গে কাটাই।"

জালালের কথায় এমন আন্তরিকতা যে মৌখিক ভদ্রতার বেড়া ভেঙে যায়। জালাল যেন আমার প্রবাসী কোনো ভাই।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিনজা এলাকায় হাজির হলাম। কেমন ভাবে গিনজার বর্ণনা দেবো? গোটাপঞ্চাশেক কলকাতার এসপ্ল্যানেডকে এক করলে গিনজার একটা ছোটখাট সংস্করণ হবে। আর রাতের গিনজা—পৃথিবীর সর্বোত্তম আলোকিত শহর। প্রতিটি বাড়ি আলোকিত ফুলের মালা পরে ঝিকমিক করছে।

জালাল বলেন, "পৃথিবীর আর কোনো শহরে এতো ফুর্তির কেন্দ্র নেই। সাতানব্বই হাজারের বেশী রেস্তোঁরা, বার, নাইট ক্লাব এবং বাথ আছে এই শহরে। শুনেছি এতো দামী খাবারের জায়গা প্যারিসেও নেই। জাপানী ব্যবসার প্রধান লেনদেন এইসব রেস্তোরাঁয় হয়ে থাকে। অফিসের নামে অ্যাকাউন্ট থাকে—কোম্পানির খরচে মদ্যপান, ভোজন ও নারী-সঙ্গ উপভোগ করে বিলে সই দিলেই হলো। সপ্তাহের শেষে কোম্পানিতে বিল চলে যাবে।"

জালাল বললেন, "এক-একসময় ভাবি এতো রেস্তোরাঁয় লোক হয় কি করে? কিন্তু অবাক কাণ্ড, কখনও খালি দেখি না।"

আমি চারদিকে তাকিয়ে বললাম, "সব রকমের দোকান দেখছি।"

"রেস্তোরাঁর ইউ-এন-ও বলতে পারেন। সব দেশ সব জাত এখানে প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে। রাশিয়ান খাবার চাই—ওই তো ভোল্গা রয়েছে! জার্মান? কেটেলস্ রেস্তোরাঁ আছে। ব্যাংকক রেস্তোরাঁয় থাইল্যাণ্ডের খাবার, হানানকিতে ফরাসী ডিশ, সুকিয়া এনে কোরিয়ান রান্না এবং নায়ারের দোকানে ইণ্ডিয়ান কারি পাবেন।"

আমি জালালের কথা শুনে যাচ্ছি। জালাল বললেন, "ক্যাবারের জন্যে বিখ্যাত মিকাডো বা মিমাৎসু। আর সবচেয়ে দামী সঙ্গিনীর সান্নিধ্য পাওয়া যায় কুইন বীতে। মধুর স্বভাবের জন্যে গিঞ্জানিসীর মহিলাদের সুনাম। সাধে কি আর ফোডর সায়েব লিখেছেন—পকেটে টাকা এবং ছাতিতে দিল নামক পদার্থ থাকলে কোনো পুরুষের জাপানে নিঃসঙ্গ বোধ করার কারণ নেই। বান্ধবীদের পারিশ্রমিকের হার ঘণ্টায় ২১০ টাকা। এই সব সুন্দরীরা আবার পঞ্চাশ মিনিটে ঘণ্টা হিসেব করেন।"

একটা কফি-বার দেখিয়ে জালাল বললেন, "এখানকার কফির দোকানেও মদ পাওয়া যায়। গেরস্তপোষা মদের দোকান হলো সানটরি বার। সানটরি বিখ্যাত জাপানী হুইস্কির নাম।"

জালাল জানতে চাইলেন আমি কি ধরনের খাবার পছন্দ করবো। বললাম, "এখনও পর্যন্ত যা বুঝেছি, জাপানীরা রান্নায় বিশ্বজয় করতে পারবে না। মহাচীনের এত নিকটে থেকেও এমন অপটু রান্না—প্রদীপের তলায় অন্ধকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবু যস্মিন দেশে যদাচার—জাপানী খাওয়া ট্রাই করা যাক।"

ঘুরে ঘুরে একটা গলির মধ্যে জালাল তাঁর প্রিয় স্থকিয়াকির দোকানে ঢোকালেন আমাকে। টেবিলের উপরেই উনুন। জালাল বললেন, "এদের বিশ্বাস নেই, গোরুর মাংস না দিয়ে দেয়। আপনি বরং ইয়াকিতোরি নিন, সোজা কথায় যা হলো গ্রীল্‌ড মুর্গি।"

জালাল বললেন, "এই খাবারের সঙ্গে জাপানী অনুপান 'সাকে'—দিশী মদ।"

"সাকী সান্নিধ্যে সাকে পান! চমৎকার মতলব," আমি মন্তব্য করি।

আমার দিকে খাবার এগিয়ে দিয়ে জালাল বললেন, "খুব ইচ্ছে ছিল আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাই। কিন্তু ব্যাচেলর মানুষ, একা কোনোরকমে জীবনধারণ করি। বাইরে বাইরে খেয়ে বেড়াই—বাঙালী বন্ধুরা মাঝে মাঝে দয়া করে মাছের ঝোল ভাত খাইয়ে দেয়।"

"মাছের ঝোল ভাত যাতে বাড়িতে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করলেই পারেন!" আমি রসিকতা করি।

"বাড়ি থেকে প্রায়ই আজকাল চাপ আসছে। ওদের ভয় বিয়েশাদি না করে আমি গোল্লায় যাচ্ছি।"

"যা দেশ, তাতে ভয় কি অমূলক?" আমি টিপ্পনি কাটি।

জালাল এবার আমার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "জাপানে আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা কী হলো বলুন?"

বললাম, "আপনি হয়তো হাসবেন, লিখতে-পড়তে না জানার কি যন্ত্রণা তা জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারলাম। দেশের বাইরে প্রথম

ইংলণ্ডে গেলাম, কোনো অসুবিধা হয়নি। তারপর ফ্রান্স—ভাষা জানি না, কিন্তু রোমান অক্ষরগুলো পড়ে অন্ততঃ কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি, জাপানে না বুঝি ভাষা, না পারি অক্ষর পড়তে। আমার চারিদিকে ভাষা ও শব্দ রয়েছে অথচ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কোনো কিছুতেই অংশ গ্রহণ করতে পারছি না, অদ্ভুত এক অবস্থা। কথা বলবার জন্য, কথা শোনবার জন্য, লেখা পড়বার জন্য মুখ, কান, চোখ অস্থির হয়ে উঠছে। আমাদের দেশের নিরক্ষর মানুষরা সারাজীবন কী কষ্ট পায় তা এই প্রথম বুঝতে পারলাম।”

জালাল বললেন, “এই জন্যেই বলে আপনারা শিল্পী। এখানে এসে প্রথমে আমিও কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু কখনও এই কথা আমার মনে হয়নি।”

খাওয়ার পর্ব শেষ করে আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় আলোয় আলো, লোকে লোকারণ্য। যেন মহাষ্টমীর রাত্রে কলকাতার এক পুজো-প্যাণ্ডেল থেকে আর এক প্যাণ্ডেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরবার পর জালাল আমাকে একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। লিফ্‌টে হু-হু করে আমরা উপরে উঠে চলেছি। বহুতলা ওপরে রিভলভিং রেস্তোরাঁ। একটা পাক খেতে এক ঘন্টা সময় লাগে। টেবিল অধিকার করলাম আমরা। জালাল বললেন, “ইংরেজীতে যাকে লুক-ডাউন-আপন বলে তা বাংলা মায়ের লেখকরা করেন না। কিন্তু এই উঁচু থেকে সমস্ত শহরের মোহিনী রূপ দেখতে পাবেন। আপনি শিল্পী লোক, আপনার দেখা উচিত—হয়তো কোনো নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন।”

কফির অর্ডার দিয়ে আমরা নির্বাক হয়ে তুলনাহীনা টোকিওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাজার-প্রাসাদে রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে যেন লক্ষ প্রদীপের সমারোহ!

জালালকে বললাম, ‘রেডিও জাপানে যে বাংলা বিভাগ আছে তা জানতাম না। আপনি এখানে কেমনভাবে জড়িয়ে পড়লেন?”

“সে এক গল্প” জালাল উত্তর দিলেন।

"বলুন না, শুনি।"

"আপনাকে আগেই বলেছি, আমি সাহিত্যের ছাত্র নই। পড়াশোনায় অবশ্য নেহাত খারাপ ছিলাম না। পরীক্ষা দিয়ে স্কলারশিপ পেলাম জাপানে মাইনিং এঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্যে। আসলে আমি এখনও একজন খনিবিদ্যা বিশারদ—আর কিছু নই। জাপানে কিছুদিন থেকে শুনলাম—রেডিও জাপানে পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার হয়।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে জালাল বললেন, "একটা-আধটা নয়, ডজন ডজন ভাষা। অথচ আমাদের বাংলা ভাষার স্থান নেই। আমার ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগতো না। আমাদের বাংলা ভাষা বিশ্বের সেরা ভাষা, কেন স্থান হবে না তার জাপানে? ভাবতে ভাবতে মাথায় গোঁ চেপে গেলো। জানেন শংকরবাবু, মাথায় গোঁ চাপলে আমার আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। রেডিও জাপানকে গিয়ে ধরলাম। ওঁদের কর্তৃপক্ষ বললেন, সরকারী সূত্রে কোনো অনুরোধ এলে আমরা বিবেচনা করে দেখবো। তখন ইণ্ডিয়ার কয়েকজন বাঙালীকে ধরলাম—যদি ইণ্ডিয়ার এমব্যাসি থেকে চিঠি লেখানো যায়। কিন্তু ওঁরা বললেন, বাংলা ভাষার জন্যে কিছু বলাটা প্রাদেশিকতা—প্রভিনসিয়ালিজম।"

"তারপর?" আমি প্রশ্ন করি।

"তারপর খেয়াল হলো বগুড়ার মহম্মদ আলী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছেন। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে ওঁকে একদিন পাকড়াও করলাম। ভদ্রলোক বাংলাভাষাকে সত্যি ভালবাসেন। বললেন, ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি।"

"সেই চিঠি নিয়ে আবার ছুটলুম রেডিও অফিসে। কিছুদিন পরে আবার খবর নিয়ে জানলাম ওঁদের ইচ্ছে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ করার। আবার মহম্মদ আলী সায়েব। টেলিফোনে কথা হলো। বললেন, বাংলায় প্রোগ্রাম করলে জাপান ও পূর্ব-পাকিস্তানের মঙ্গল হবে—দুই দেশের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর হবে। এবার ফল ফললো। এর জন্যে কৃতিত্ব মহম্মদ আলী সায়েবের এবং কিছু বাংলা-প্রেমিক জাপানী পুরুষ ও মহিলার।"

দেখলাম, জালাল আমেদের চোখ দুটো নিজের মাতৃভাষার কথা বলতে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জালাল বলছেন, "ছোট থেকে শুরু হয়। রেডিও জাপানের বাংলা প্রোগাম আরও বাড়ানো হচ্ছে। শুনছি দু' একজন জাপানী পণ্ডিতের আগ্রহে এবছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা ভাষা চর্চা আরম্ভ হবে।"

আমি অবাক হয়ে জালালের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। জালাল বললেন, "আপনারা এমনভাবে লিখুন যাতে এদেশের লোকরা অবাক হয়ে যায়। যেন ওরা বুঝতে পারে আমরা গরীব বটে, কিন্তু মনের ঐশ্বর্য আমাদের কম নয়, পৃথিবীকে আমাদেরও কিছু দেবার আছে।"

এতক্ষণ যেন অন্য কোনো রাজ্যে চলে গিয়েছিলাম, জাপানী শব্দে সংবিৎ ফিরে এলো। ওয়েটার এসে জালালকে বলছে, রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম পরিক্রমা শেষ করে আমাদের ছোট জগৎটি তার কক্ষপথে কখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমাকে কিছুতেই পয়সা দিতে দিলেন না জালাল আমেদ।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমাকে তুলে দিতে এলেন জালাল আমেদ। ট্রেন এসে পড়েছে। বললাম, "আপনার কাছে শুধু নিয়েই চললাম।"

জালাল হাসতে হাসতে বললেন, "ভাবছেন, কখনও আর শোধ তুলতে কলকাতায় যেতে পারবো না!"

"একবার কেন, একশোবার কলকাতায় আসুন। কিন্তু কে জানে কি আছে বিধাতার মনে। যদি আর কখনও দেখা না হয়—তা হলে কেমন করে লাঘব করবো এই দেনার বোঝা?"

"বাংলায় আরও ভাল ভাল বই লিখে", জালালের শেষ কথা শুনতে পেলাম। ইতিমধ্যে ট্রেনের অটোমেটিক দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দেখলাম, জালাল তখনও হাত নাড়ছেন। জাপানী ট্রেনের রূঢ় দ্রুতগতি আমাকে উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জালাল আমেদকে নিষ্করুণভাবে আমার চোখের সামনে থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিল।

ঘরে ফেরার সময় হলো বিহঙ্গের। মাকুদাসন, দিলীপ ও বিকাশ এসেছিল এয়ারপোর্টে আমাকে তুলে দিতে।

বি-ও-এ-সি বিমানের এক প্রান্তে বসে হঠাৎ খেয়াল হলো ঘরে ফেরার সময় আগত। এই তো মাত্র তিন মাস আগে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে একদিন দমদমের টার্মাক দিয়ে হেঁটে প্লেনে চড়ে পশ্চিমমুখো যাত্রা শুরু করেছিলাম। তারপর এই এতোদিন ধরে পিছনে না তাকিয়ে কেবল পশ্চিম মুখেই এগিয়ে গিয়েছি। ভাবছিলাম, ক্রমশঃ নিজের দেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। হঠাৎ এইমাত্র প্লেনের শব্দে খেয়াল হলো কখন আবার কলকাতার কাছে এসে গিয়েছি। কলকাতা আর দূর নয়।

মনের মধ্যে কত বিচিত্র চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে! যে-লোকটা তিন মাস আগে দেশত্যাগ করেছিল আর যে ফিরছে সে বোধ হয় ঠিক এক নয়। বিদেশের অভিজ্ঞতা আমাকে অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে। আমার চোখ এই এতদিন পরে খুলে গিয়েছে। তাই বোধহয় হয়ে থাকে। যুগে যুগে স্বদেশের প্রেম যত সেইমত অবগত বিদেশে অধিবাস যার।

মনে পড়েছিল সানফ্রানসিসকোর এই সামান্য পরিচিত তরুণ বন্ধুর কথা। নাম মিল্টন গেন্স। কাইজার কোম্পানিতে বড়ো চাকরি করে মিলটন। কিন্তু তার আগ্রহ আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে—যে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বকে স্বস্তি দিতে পারে বলে মিলটনের বিশ্বাস! মিলটন আমাকে সানফ্রানসিসকো শহরে প্রশান্ত মহাসাগরতীরে কলম্বসের মর্মর স্মৃতির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দুঃসাহসী নাবিক রহস্যময় অপলক দৃষ্টিতে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন।

মিলটন আমাকে নাম ধরে ডাকে। মিলটন বলেছিল, "শংকর, তোমার বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলো।"

আমি প্রথমে উত্তর না দিয়ে কলম্বসের রহস্যময় মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "অনেকদিন আগে ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে কলম্বস আমেরিকার নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেছিলেন। আর এই এতদিন পরে আমেরিকা সন্ধানে বেরিয়েছিলাম আমি; কিন্তু এখন দেখছি যদি কিছু আবিষ্কার করে থাকি সে ভারতবর্ষ আমার ভারতবর্ষ।"

মিলটন দার্শনিক। আমাকে আর বিব্রত করেনি, আমাকে সে বুঝতে পেরে নিঃশব্দে মহাসমুদ্রের দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল।